খাওয়া ও খোওয়া

সৌরীন্দ্রঘোষ

Govt Training School

Hooghly.

~~6800~~

3/29

খাড়া ও খোড়া

এবং আরো গল্প

—:*:—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

—

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস

২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৯৩২

দুই টাকা

প্রকাশক
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ

প্রিয়বন্ধু

শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস

কর-কমলেষু

ভাই যতীন,

সেই প্রথম যখন লেখা স্বরু করি—সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত আমার লেখা গল্প তুমি পড়তে ভালোবাসো।

তার উপর বহু দেশ ঘুরেচো, বহু নর-নারী দেখেচো,—তাই এ বইখানি তোমার হাতে দিলুম,—দেখো তো, আমার তুলিতে আঁকা এই নর-নারীগুলির মধ্যে কাকেও চেনো কি না।

প্রীতিমুগ্ধ
সৌরীন্দ্র

কলিকাতা,
আষাঢ়, ১৩৩৯

সূচী

খাট্টা ও খোট্টা

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুরন্ত মেয়ে

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। নৈহাটী ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে ক'জন যাত্রী ট্রেণ হইতে নামিল। টিকিট-কালেক্টরকে টিকিট দিয়া বাহিরে আসিয়া এক জন তরুণ-বয়স্ক যাত্রী কহিল,—পার্ব্বতী হালদার মশায়ের বাড়ীটা কোন্ দিকে?

এক জন যাত্রী কহিলেন,—কাঁঠালপাড়ায়। আমার সঙ্গে আসুন, আমার বাড়ী ঐ দিকেই।

কাঁঠালপাড়া শুনিয়া তরুণের মনটা একবার দুলিয়া উঠিল। বাঙ্গালার ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড-অন্-অ্যাভন্ এই কাঁঠালপাড়া! তরুণ যুবা যাত্রীটির সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

যাত্রীটি কহিলেন,—আমাদের জ্ঞাতি হন্। আঃ কি কারবারই ফেঁদেছিলেন—সর্ব্বস্ব গেল! তা, আপনি তাঁর কছে?—

তরুণ কহিল,—আমার বাবার সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব ছেলেবেলা থেকে। আমরা থাকি পাটনায়। আমি সম্প্রতি কলকাতায় এসেছি।

যাত্রীটি কহিলেন,—পাটনা! সেখানকার উকীল সুধানাথ বাবুকে—

তরুণ কহিল,—আমি তাঁর বড় ছেলে শচীনাথ। আমার বাবাকে আপনি জানেন?

যাত্রীটি কহিলেন,—জানি বৈ কি! সুধানাথ বাবুও আমাকে বিলক্ষণ চেনেন। কতবার এখানে এসেছেন। পার্ব্বতী বাবু আমার কাকা হন—জ্ঞাতি-সম্পর্কে—আলাদা থাকলেও আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমার নাম লালবেহারী।

মাথার উপর দীপ্ত সূর্য্য--পথে ধূলাও তেমনি! বড় বড় গাছের ছায়ায় পথ চলিতে তেমন কষ্ট হইল না। খানিক আসিয়া জীর্ণ একটা বাড়ী দেখাইয়া লালবেহারী কহিল,—এই বাড়ী। তা হ'লে আসি। যদি থাকেন তা হ'লে সন্ধ্যাবেলা দেখাও হবে'খন। বলিয়া লালবেহারী বিদায় লইল।

শচীনাথ গিয়া জীর্ণ গৃহের দ্বারে কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে কে বলিল – কে?

শচীনাথ কহিল,—দরজাটা খুলে দাও……

বাড়ীর পাশে খানিকটা পড়ো জমি, সেখানে রীতিমত জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে দুটো পল্লীগাভী তৃণ ভোজন করিতেছে; জামগাছের তলায় দড়ি-বাঁধা একটা ছাগল শুইয়া আছে।

এক বৃদ্ধ বাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিলে শচীনাথ ভিতরে প্রবেশ করিল; কহিল,– পার্ব্বতী বাবু বাড়ী আছেন?

বৃদ্ধ কহিল,—না, তিনি হুগলি গেছেন।

শচীনাথ প্রমাদ গণিল; কহিল,—কখ্ন ফিরবেন?

বৃদ্ধ কহিল,—মা-ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করি। বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

শচীনাথ দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিল। ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাটলে দুটো পায়রা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বুঝি, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের প্রখর তেজ হইতে একটু রক্ষা পাইবার আশায়! বৃদ্ধ তখনই ফিরিয়া

আসিল ; আসিয়া কহিল,—সন্ধ্যার পরে। তা আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

অদূরে জানালার অন্তরালে একটা শাড়ীর পাড় দেখা গেল। দেখিয়া শচীনাথ কি ভাবিল ; পরে কহিল,—আপাততঃ কলকাতা থেকে আসছি—কিন্তু তা বললে তো বুঝতে পারবেন না—বলো গে, আমি পাটনা থেকে আসছি। কলকাতা আমার মামার বাড়ী—সেখানে এসেই উঠেছি। এখন সেখান থেকে—

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক প্রৌঢ়া মহিলা আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইলেন ; কহিলেন,—পাটনা থেকে আসছো বাবা ? তুমি কি হারুল ?

শচীনাথ রোয়াকে উঠিল, এবং মহিলার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিল,—হ্যাঁ।

তার মাথায় করস্পর্শ করিয়া মহিলা কহিলেন,—উনি বলেছিলেন, তোমার বাবা পাটনা থেকে লিখেছেন, তুমি এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করবে। তা, কবে এলে ?···সেই ছেলেবেলায় দেখেছি এতটুকুন্‌টি।

শচীনাথ কহিল,—পাটনা থেকে এসেছি সোমবার। ছোট মামার শরীর খারাপ ছিল ব'লে ক'দিন আসতে পারিনি ! বাবা তাড়া দিয়েছেন। আজই তাঁর চিঠি পেয়েছি। তাই আর দেরী না ক'রে আজই চ'লে এলুম।

মহিলা কহিলেন,—এসো বাবা, ঘরের মধ্যে এসো।

শচীনাথকে সঙ্গে করিয়া মহিলা দোতলায় শয়ন-কক্ষে আসিলেন। সে-ঘরে বুকে ভর দিয়া মাদুরে শুইয়া এক ত্রয়োদশী বালিকা একখানা সচিত্র মাসিক-পত্র পড়িতেছিল। মহিলা কহিলেন,—ওঠ্ দিকিনি খেঁদি, তোর শচীদা এসেছে, ওঁর কাছে শুনছিলি না ?

যাত্রীটি কহিলেন,—জানি বৈ কি! স্থধানাথ বাবুও আমাকে বিলক্ষণ চেনেন। কতবার এখানে এসেছেন। পার্ব্বতী বাবু আমার কাকা হন—জ্ঞাতি-সম্পর্কে—আলাদা থাকলেও আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন। আমার নাম লালবেহারী।

মাথার উপর দীপ্ত সূর্য্য--পথে ধূলাও তেমনি! বড় বড় গাছের ছায়ায় পথ চলিতে তেমন কষ্ট হইল না। খানিক আসিয়া জীর্ণ একটা বাড়ী দেখাইয়া লালবেহারী কহিল,—এই বাড়ী। তা হ'লে আসি। যদি থাকেন তা হ'লে সন্ধ্যাবেলা দেখাও হবে'খন। বলিয়া লালবেহারী বিদায় লইল।

শচীনাথ গিয়া জীর্ণ গৃহের দ্বারে কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে কে বলিল—কে?

শচীনাথ কহিল,—দরজাটা খুলে দাও……

বাড়ীর পাশে খানিকটা পড়ো জমি, সেখানে রীতিমত জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে দুটো পল্লীগাভী তৃণ ভোজন করিতেছে; জামগাছের তলায় দড়ি-বাঁধা একটা ছাগল শুইয়া আছে।

এক বৃদ্ধ বাড়ীর দ্বার খুলিয়া দিলে শচীনাথ ভিতরে প্রবেশ করিল; কহিল,—পার্ব্বতী বাবু বাড়ী আছেন?

বৃদ্ধ কহিল,—না, তিনি হুগলি গেছেন।

শচীনাথ প্রমাদ গণিল; কহিল,—কখন ফিরবেন?

বৃদ্ধ কহিল,—মা-ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করি। বৃদ্ধ চলিয়া গেল।

শচীনাথ দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিল। ভাঙ্গা দেওয়ালের ফাটলে দুটো পায়রা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বুঝি, মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের প্রখর তেজ হইতে একটু রক্ষা পাইবার আশায়! বৃদ্ধ তখনই ফিরিয়া

আসিল; আসিয়া কহিল,—সন্ধ্যার পরে। তা আপনি কোথা থেকে আসছেন?

অদূরে জানালার অন্তরালে একটা শাড়ীর পাড় দেখা গেল। দেখিয়া শচীনাথ কি ভাবিল; পরে কহিল,—আপাততঃ কলকাতা থেকে আসছি—কিন্তু তা বললে তো বুঝতে পারবেন না—বলো গে, আমি পাটনা থেকে আসছি। কলকাতা আমার মামার বাড়ী—সেখানে এসেই উঠেছি। এখন সেখান থেকে—

তার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই এক প্রৌঢ়া মহিলা আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইলেন; কহিলেন,—পাটনা থেকে আসছো বাবা? তুমি কি হাবুল?

শচীনাথ রোয়াকে উঠিল, এবং মহিলার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিল,—হ্যাঁ।

তার মাথায় করস্পর্শ করিয়া মহিলা কহিলেন,—উনি বলেছিলেন, তোমার বাবা পাটনা থেকে লিখেছেন, তুমি এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করবে। তা, কবে এলে?···সেই ছেলেবেলায় দেখেছি এতটুকুন্‌টি।

শচীনাথ কহিল,—পাটনা থেকে এসেছি সোমবার। ছোট মামার শরীর খারাপ ছিল ব'লে কদিন আসতে পারিনি! বাবা তাড়া দিয়েছেন। আজই তাঁর চিঠি পেয়েছি। তাই আর দেরী না ক'রে আজই চ'লে এলুম।

মহিলা কহিলেন,—এসো বাবা, ঘরের মধ্যে এসো।

শচীনাথকে সঙ্গে করিয়া মহিলা দোতলায় শয়ন-কক্ষে আসিলেন। সে-ঘরে বুকে ভর দিয়া মাদুরে শুইয়া এক ত্রয়োদশী বালিকা একখানা সচিত্র মাসিক-পত্র পড়িতেছিল। মহিলা কহিলেন,—ওঠ্ দিকিনি খেঁদি, তোর শচীদা এসেছে, ওঁর কাছে শুনছিলি না?

মেয়ে খেঁদি অত্যন্ত বিরক্তির সহিত উঠিয়া দাড়াইল। মা কহিলেন,— নমস্কার কর্।

খেঁদি শচীনাথের পায়ের কাছে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিল, প্রণামান্তে বইখানা হাতে লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

মা কহিলেন,—বসো বাবা। উনি একটা কি কাযের সন্ধানে হুগলি গেছেন, সন্ধ্যা-নাগাদ ফিরবেন।

শচীনাথ বিছানার উপর বসিল; বসিয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিল। দেওয়ালে বহুবাজার আর্ট ষ্টুডিওর ক'খানা ছবি ঝুলিতেছে—ফ্রেমের সোনালি কাজ চটিয়া গিয়াছে- কতকালের ছবি, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য! ঘরের আসবাব দামী, তবে বহুকালের পুরানো। কাঠের ইস্ত্রি ও পালিশ কবে মুছিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের পেণ্টিং ওঠা, চূণ-বালি খসা, যেন এক সৌখীন ব্যক্তি বহুকাল রোগে ভুগিয়া, কঙ্কাল-সার ম্লান মূর্ত্তিতে আছে!

শচীনাথ সংক্ষেপে কহিল—ব্যবসায় সব গেছে?

আলমারিতে পিঠ ঠাসিয়া গৃহিণী মেঝেয় বসিলেন, কহিলেন,—সর্ব্বস্ব। এইটুকুন্ আছে। আমার শ্বশুর এ ভিটে দেবোত্তর ক'রে গেছলেন, তাই এখানে আশ্রয় মিলেছে। দেনার দায়ে ইনসলভেণ্টো নিইয়ে ছেড়েছে।

শচীনাথ কহিল,—অথচ ওঁর কারবার কি রকম চলছিল! বেনারসী কাপড়ের পত্তন করেছিলেন না?

মহিলা কহিলেন,—করেছিলেন তো। তা, যত চেনাশোনা লোককে ধারে কাপড় বেচলেন—কেউ একটি পয়সা উপুড় হাত করলে না। তার পর কলে আগুন লাগলো—আর এক বোম্বাইওলা পিছনে

লেগে যত পাওনাদারকে ওস্কাতে সুরু করলে।—গৃহিণী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

শচীনাথ কহিল,—আমার সাধ, কাপড়ের ব্যবসা করা। বাবা তাই বললেন, তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করো গে; তা হ'লেই আমি পয়সা দেবো।

গৃহিণী বুঝিলেন, এ প্রস্তাবের মধ্যে বন্ধুর জন্য বন্ধুর কতখানি মমতা, কত দরদ, কি সহানুভূতি! হাতে পয়সা তুলিয়া দিলে স্বামী তাহা লইবেন না। স্বামীর তেজ কতখানি, তাহা তাঁর অজানা নহে। যত বড় আপন-জন হউক, যত দরদী বন্ধুই হউক—পয়সার সাহায্য কাহারো কাছে হইতে নহে, নিজের হাত-পা থাকিতে—খাটিয়া খাইবার সামর্থ্য থাকিতে! তিনি কহিলেন,—বেশ তো, বাবা! উনি আসুন, কথাবার্ত্তা কও, তুমি ছেলে—আমি নয় পেটেই ধরি নি—তা একটু কিছু খাও বাবা!

শচীনাথ কহিল,—না কাকিমা, খেতে পারবো না।

গৃহিণী কহিলেন,—কিছু না হয় তো ডাবের জল? ডাব পাড়ানো আছে। না, তোমরা একালের ছেলে, চা চাই? সে ব্যবস্থাও যে গরীব কাকীর নেই, তা ভেবো না। কথাটা বলিয়া তিনি হাসিলেন।

শচীনাথ কহিল,—একটু চা-ই নয় দেবেন, আমি একটু ঘুরে আসি। কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিম বাবুর বাড়ী। তীর্থস্থান! এলুম যখন সে তীর্থ একবার চোখে দেখে আসি।

গৃহিণী সখেদে কহিলেন,—সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। আমরা তো দেখেছি, রথে কি ঘটা হতো! নতুন বৌ-মানুষ, তখন সবে শ্বশুর-ঘর করতে এসেছি! কতই বয়স? দশ-এগারো বছর।

তা, কি রকম মেলা বসতো—কি জাঁকজমক! এখন এমনি প'ড়ে আছে! দিল্লী, আগ্রা দেখেছো তো? ঠিক তেমনি দশা!

শচীনাথ কহিল,—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরবো-খন। কিন্তু বেশী কিছু খাওয়ার আয়োজন করবেন না, কাকিমা! শুধু এক পেয়ালা চা ব্যস্।

হাসিয়া গৃহিণী কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে।

শচীনাথ চলিয়া গেল। গৃহিণী ডাকিলেন,—খেঁদি!

কোন উত্তর নাই। আবার তিনি ডাকিলেন,—শুন্তে পাচ্ছিস?

তবু কোনো জবাব নাই—যেন কে কাহাকে ডাকিতেছে!

গৃহিণী উঠিলেন, উঠিয়া মেয়ের কাছে গেলেন। মেয়ে তখন মাসিকপত্রের মধ্যে এমন তন্ময় যে, সামনে বাজ পড়িলেও বুঝি তা খেয়ালে আসিবে না!

মা কহিলেন,—সকলি অনাছিষ্টি! নবেল, নবেল, নবেল! চব্বিশঘণ্টা নবেল পড়া! সংসারের কুটোটা নাড়বি নে? এখন কি পোষায়! যখন অবস্থা ভালো ছিল, তখন সব সাজতো! এখন ও নবাবী সাজে না।

মেয়ের তবু ভ্রূক্ষেপ নাই! হাসি-মুখে বইয়ের পাতা উল্টাইল—গল্পের নায়িকা তখন নায়ককে লইয়া ভারী এক মজা বাধাইয়া দিয়াছে! মা উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন,—খেঁদি!

এ আহ্বান খেঁদির কাণে গেল। খেঁদি ঝাঁজিয়া উঠিয়া বলিল,—কি?

মা কহিলেন,—কথা শোনো! যেন মারতে উঠলেন! শোন্, বই রাখ্, রেখে ষ্টোভটা জাল্, জেলে কেটলিতে দু কাপ জল দে। তোর হাবুদা এসেছে—চা খাবে। আমার সেই বাতের ব্যথা

চাগিয়েছে, অমাবস্যার কোটাল পড়েছে, আমি দেখিয়ে দেবো—তুই চা তৈরী করবি।

খেঁদি সঝঙ্কারে কহিল,—আমি পারবো না।—মেয়ের কথা শুনিয়া মা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাঠে-কাঠে

শচীনাথ এক ঘণ্টা পরেই ফিরিল, ফিরিয়া অসঙ্কোচে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কক্ষান্তরে মা ও মেয়েতে তখন তর্ক চলিয়াছে। মা বলিলেন,—অত বড় ধাড়ী মেয়ে, কায করতে বললে যেন মারতে আসে! রকম দ্যাখো না—

মেয়ে সগর্জ্জনে কহিল—কি করতে হবে?

মা কহিলেন—ময়দাটা শুধু মেখে দিবি—আমি লুচি বেলে নেবো—

মেয়ে কহিল—আমি পারবো না। কখনো মেখেছি যে বল্‌ছো?

মা কহিলেন—কখনো মাখোনি ব'লে আজো মাখবে না? কখনো এমন দশা তো ছিল না—থাকলে বলতুম না!

মেয়ে কহিল—গোবরাকে ডাকো না!

মা কহিলেন—গোবরা তো খাইনের চাকর নয় মা—তবু রেয়ৎ—মান্যি করে; তার উপর যা করে, ঢের! খড় কাটছে, গরুর জাব দিচ্চে, বাজার ক'রে আনছে, ওর মেয়ে এসে বাসন মেজে দিয়ে যাচ্ছে—ওর উপর তো ফরমাশ চলে না মা! শেষের দিকটায় মা'র কণ্ঠস্বর কোমল হইয়া আসিল।

মেয়ে কোনো জবাব দিল না। কথাগুলা শুনিয়া শচীনাথ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় ঝুম্‌ঝুম্ শব্দে মেয়ে থেঁদি আসিয়া সাম্‌নে হাজির! তার হাতে একটা বাঁধানো বই। শচীনাথ ভাবিল, সে মাসিক-পত্র পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে, এ আবার এক নূতন পর্ব্ব। তার ইচ্ছা হইল, বইখানা টানিয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করে, আর তীব্র রোষে বলে, মা'র মুখে চোপা করো—এই তোমার বিদ্যা! এই বিদ্যা লইয়া নভেল পড়ো! কিন্তু প্রথম দিন—একেবারে অপরিচিত। তবু রাগে তার গা গশ্ গশ্ করিয়া উঠিল! থেঁদি তার সামনে দিয়া একতলায় নামিয়া গেল, শচীনাথ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

তার পর সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল,—সামনে লুচির সরঞ্জাম—কাকিমা বঁটিতে আলু কুটিতেছেন, একটা ষ্টোভ জ্বলিতেছে। ষ্টোভের উপর কড়ায় তরকারী রান্না হইতেছে। শচীনাথ কহিল,—এ সব কি করছেন্ কাকিমা? বললুম তো—

বাধা দিয়া কাকিমা কহিলেন—বেলা প'ড়ে গেছে বাবা, জলটল খাবার সময়।

শচীনাথ কহিল—কিন্তু আমি জলখাবার খাই না কাকিমা, —কলকাতায় এসে এমন হয়েছে, যে ক্ষিদেই হয় না। ভাত যা খাই, তা শুধু নিয়ম-রক্ষার জন্য!

কাকিমা কহিলেন,—খুব ঘুরে বেড়াচ্ছ বুঝি?

শচীনাথ কহিল—না। সেখানে তো ছোটমামার অসুখ হয়েছিল, বাড়ীতে চুপটি ক'রে ব'সে থাকতুম। তা এখন সেরেছে, কাল পথ্য করেছে। চা হলো?

কাকিমা কহিলেন,—এই যে বাবা, এখনি ক'রে দিচ্ছি। তুমি ছিলে না কি না,—

শচীনাথ কহিল,—আপনি উঠুন। কেটলি কোথায়? আমি ক'রে নিচ্ছি।

কাকিমা হাসিয়া কহিলেন,—পাগল ছেলের কথা শোনো।

শচীনাথ কহিল—না কাকিমা, আমি সব পারি। আমাদের যে প্রায় চড়িভাতি হয় সেখানে। তা আমি রান্নার ভার নি,—মাংস যা রাঁধি কাকিমা, একেবারে ফাষ্ট ক্লাশ! আর আলুর দম, ছোলার ডাল, চাটনি এ সবও রাঁধতে জানি।

কাকিমা হাসিয়া কহিলেন,—আচ্ছা, এক দিন খাইয়ো তখন রেঁধে।

হাসিয়া শচীনাথ কহিল—বেশ, খাওয়াবো!

কাকিমা উঠিয়া গেলেন, শচীনাথ বিছানার উপর বসিল। ভাবিল, কাকিমা নিশ্চয়ই মেয়ের সন্ধানে গিয়াছেন—বুঝাইয়া সুঝাইয়া যদি আনিতে পারেন!

খেঁদি আসিল না, কাকিমা একা ফিরিলেন; তাঁর মুখের ভাব প্রসন্ন নহে! শচীনাথ মর্ম্ম বুঝিল। সে কহিল—তরকারী নামিয়ে দি—হয়ে গেছে। বলিয়া সে কাকিমার কথার প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া কড়ার দুই আংটার মধ্যে খন্তি লাগাইয়া তাহার সাহায্যে কড়া নামাইল। কাকিমা কহিলেন,—পাগল ছেলে কি করে, ছাখো—

পাগল ছেলে কি করিবে, তাহাও দেখাইয়া দিল। ঘরের কোণে জল-ভরা কেটলি ছিল। সেটা লইয়া ষ্টোভে চাপাইয়া দিয়া সে কহিল,—দুধ? এই যে। আচ্ছা, লুচি খেতে হবে? দেখুন কাকিমা, আমি করতে পারি কিনা। বলিয়া সে ময়দা ঢালিয়া তাহাতে ঘী দিল; তার পর ঘীয়ে ময়দাটা নাড়িয়া মিশাইয়া জল ঢালিল; ঢালিয়া ময়দা মাখিতে লাগিল।

কাকিমা অবাক্! তিনি বলিলেন,—তোমার চায়ের জল হয়েছে, বাবা!

—ইস্, তাই তো! বলিয়া শচীনাথ কেটলি নামাইল ও তাহাতে চা ফেলিয়া কেটলিটা চাপা দিল। কাকিমা ততক্ষণে ময়দায় হাত দিয়াছেন। শচীনাথ কহিল আচ্ছা কাকিমা, আপনি মেখে দিন, তার পর আমি লুচি বেলবো, আর আপনি ভাজবেন।

কাকিমা কহিলেন—বেশ বাবা, তাই হবে।

কাকিমার মন বলিতেছিল, এই নির্জ্জন অন্ধকার গৃহে এত দিন ধরিয়া যে দুঃখ-হাহাকারের বেদনা জমাট বাঁধিয়াছিল, আজ এ ছেলেটি কোথা হইতে কি শুভ্র হাসির হাওয়া সেখানে বহিয়া আনিল—এ হাসির হাওয়ার বেদনায় সে গুমটভাব নিমেষে যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে! এবং বহুদিন পরে তাঁর প্রাণ যেন আলো পাইয়া জুড়াইয়া বাঁচিয়াছে! মনে আবার অন্ধকার আসিয়া উদয় হইল,—ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা—এ দশায় পড়িয়া আজও অমন তেজে মট্ মট্ করে কি বলিয়া? ওরে, ভগবান যে ধূলার মধ্যে গুঁজিয়া ধরিয়াছেন—এখনো তেজ! এর পরে কি যে হইবে—তা ভাবিয়া তিনি দিশাহারা হইয়া আছেন!

আহারাদি সারিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আশ্বিনের বেলা—ছোট হইয়া আসিয়াছে। শচীনাথ কহিল,—আজ আসি, কাকিমা। কাকাবাবুকে বলবেন, কাল আবার আস্‌বো। আজ দিদিমাকে ব'লে আসিনি কি না—তাই—

যে হাসি, যে খোলা মন, যে উদার হৃদয়ের পরিচয় কাকিমা এইমাত্র পাইয়াছেন, দুর্দ্দিনের কত বেদনা যে তাহাতে ভুলিয়া থাকা যায়! তাহা ভাবিয়া কাকিমা কহিলেন—দু'দিন কাকিমার কাছে

এসে থাকতে পারো না, বাবা? বলতে ভয় হয়—যে কষ্টে আছি...

শচীনাথ কহিল—আবার ঐ কথা! মা আর কাকী কি ভিন্ন! স্নেহের কাছে পয়সার কি দাম, বলুন তো কাকিমা?

কাকিমা কহিলেন—তা তো ঠিক কথা, বাবা! তবু—

শচীনাথ কহিল—আবার তবু কি! বেশ, কাল আমি আসবো। সকালেই আসবো, আর এসে ছু'বেলা এখানে খাবো। আমার নেমন্তন্ন রইলো কাল—

কাকিমা কহিলেন—এ যে আমার পরম সৌভাগ্য, বাবা!

শচীনাথ কাকিমাকে প্রণাম করিল, তার পর একটু কৌতুকের অভিপ্রায়ে কহিল—কৈ, বৌদি কোথায়?

কাকিমা ডাকিলেন, বৌদি!

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বৌদি যেন এ-মুল্লুকেই নাই। কাকিমা লজ্জায় অপ্রতিভভাবে কহিলেন,—বুঝি ঐ উমাদের বাড়ী গেছে।

শচীনাথ কহিল—না, ওধারকার ঘরে কাকে যেন ঢুকতে দেখলুম একটু আগে,—বলিয়া শচীনাথ সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

ঘরে ঢুকিয়া শচীনাথ কহিল—এই যে বৌদি, তুমি এবারে এম-এ একজামিন দেবে বুঝি, বই নিয়ে ভারি মত্ত, দেখছি।

বৌদি মুখ তুলিয়া চাহিল,—শচীনাথের চোখে বিদ্রুপের রেখা ছুরির ফলার মত ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠিল! বৌদি বক্রদৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। শচীনাথ কহিল—আজ তা হ'লে চললুম, শ্রীমতী বিদ্যাবতী দেবী মশায়। ভালো ক'রে পড়া-শুনা করো—কাল এসে একজামিন করবো, বিদ্যা কেমন হলো।

খেঁদি অবাক্। গায়ে পড়িয়া এ-ভাবে বিদ্রূপ করিতে আসে, এমন অসভ্য লোক! তার মনের মধ্যে রাগের উষ্ণ প্রস্রবণ টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল—চোখ দিয়া তার ঝাঁজও ফুটিয়া বাহির হইল; কিন্তু মুখে সে কিছু বলিতে পারিল না।

শচীনাথ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আগুন

পর দিন চাটগাঁ-মেলে চড়িয়া বেলা আটটার পরই শচীনাথ আসিয়া হাজির। তার হাতে একটা ব্যাগ। ব্যাগে দুখানা কাপড়, গেঞ্জি, তোয়ালে, সাবান, গিলেট-খুরের বাক্স প্রভৃতি। সে আসিয়া দেখে, বাড়ীটায় কোন সাড়া নেই। সে দোতলায় উঠিল, উঠিয়া ডাকিল,—কাকিমা—

ভিতরে কাকিমার স্বর শুনা গেল,—শচী এসেছে,—ওরে অ খেঁদি, ওঠ্ একবার। খেঁদি আসিল না। তখন শচীনাথ নিজেই ঘরে ঢুকিল, ঢুকিয়া যা দেখিল, তাহাতে তাহার সব আনন্দ উড়িয়া গেল। পার্ব্বতী হালদার একটা বালাপোশ মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইয়া আছেন, তাঁর পাশে কাকিমাও অর্দ্ধশায়িত ভাবে বিছানায় বসিয়া। আর খেঁদি খোলা জানলার ধারে বসিয়া একটা মস্ত মাসিকপত্র পড়িতেছে। কাকিমা কহিলেন,—এসো বাবা—

শচীনাথ ব্যাগটা রাখিয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল, কহিল,—ব্যাপার কি কাকিমা?

কাকিমা বলিলেন,—ত্যাখো না গেরো! তোমার কাকাবাবু কাল রাতে জ্বর নিয়ে হুগলি থেকে ফিরেছেন, গায়ে বেদনা, মাথায় খুব যাতনা—ঐ দেখ না, বেঁহুশের মত রয়েছেন।

শচীনাথ উঠিল, উঠিয়া পার্ব্বতী হালদারের কপালে হাত রাখিয়া দেখিল, কপাল পুড়িয়া যাইতেছে। সে কহিল,—কত জ্বর?

কাকিমা কহিলেন,—তা তো জানি না বাবা, ঐ বুড়ো এক রেয়ৎ আছে, মাধব, তাকে পাঠিয়েছি ডাক্তার ডাকতে। কালিদাস। হোমিওপ্যাথি করে। তা এখনো আসেনি।

শচীনাথ কহিল.—গায়ে বেদনা বললেন না? এ ইনফ্লুয়েঞ্জা কলকাতায় খুব হচ্ছে, দেখছি তো এসে।

কাকিমা কহিলেন,—অদেষ্ট! হুগলির সারদা বড়াল এক কাপড়ের দোকান খুলেছে। ওঁকে বলেছিল, সে দোকান দেখতে হবে, মাসে একশো টাকা ক'রে দেবে। পরশু থেকে বেরুবার কথা। আর ইনি তো জ্বর করে বসলেন!

শচীনাথ কহিল—এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার নেই?

কাকিমা কহিলেন, আছে। দূরে আছে। কে ডাকে? তা ছাড়া কালিদাস ঘরের ছেলের মতন, ভিজিট নেয় না।

শচীনাথ কহিল,—আচ্ছা আমি দেখছি। আমি কোথায় এলুম, গঙ্গায় একটু সাঁতার কাটবো, কাকাবাবুর সঙ্গে কত কথা ছিল—

কাকিমা কহিলেন,—তা তো বটে বাবা, তুমি মুখ ফুটে বললে, কত আহ্লাদ হলো, আমার। দু'চারখানা তরকারি করবো। কালই ব'লে পাঠালুম, খিড়কির পুকুরে মাছ ধরবো ব'লে।

শচীনাথ কহিল,—তার জন্য ব্যাস্ত হবেন না, কাকিমা। খাওয়া তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। আমি সন্ধান করে দেখি,

এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার পাই কি না। সে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল!

কাকিমা কহিলেন,—কালিদাস আসছে।

শচীনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—তা বটে! কিন্তু হোমিওপ্যাথি কি আবার একটা জিনিষ? আমার তো হাসি পায়। তবে ভাবনা নেই, দু'তিন দিন ভোগ আছে। ভুগ্‌তে হবে।

শচীনাথ খেঁদির পানে চকিতের জন্য চাহিল। এসব কথা তার কানে যাইতেছে না—যেন ভিন্ন জগতের জীব! নিজের মনে মাসিক-পত্র খুলিয়া তন্ময় হইয়া আছে! শচীনাথের বিরক্তি ধরিল! বাপের এই অসুখ, মাথায় জলপটী দে, তা না, নভেল পড়িতেই মত্ত! ইচ্ছা হইল, বইখানা টানিয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু—

কাকিমা কহিলেন,—আমারো বাবা, এই গ্যাখো না, ডান হাতে বাত এমন চাগিয়েছে।

শচীনাথ কহিল,—আমি আসছি এখনি। বলিয়াই সে চক্ষুর পলকে বাহির হইয়া গেল।

মা ডাকিলেন,—খেঁদি. শুনছিস্?

খেঁদি কহিল, হ্যাঁ। বই হইতে মুখ সে তুলিলও না।

মা কহিলেন,—লোকটা এলো, খাবে বলেছে, এত ক'রে বলছি, তোর পাঁচকাকার বাড়ী যা, সদু পিসীকে ডেকে আন্, বল্‌গে যা, মা তোমাকে একবার ডেকেছে। কে যেন কাহাকে বলিল! মার কথা মেয়ের কানেও গেল না। মেয়ে বইয়ের পাতা উল্টাইল। মা ধমক দিলেন,—শুনতে পাচ্ছিস্ হতভাগা মেয়ে? একটা মান-ইজ্জৎ অবধি থাকবে না তোর জন্যে? ওঠ্ বলছি।

খেঁদি ঝঙ্কার তুলিল,—কি ? বাবা ! বাবা ! একটু বই নিয়ে বসবার যো নেই। লক্ষ ফরমাজ অমনি—

মা বলিলেন,—ওঃ, খেটে খেটে পায়ের পাতা খসে গেল ! বুড়ো মেয়ে ! একটু আক্কেল অবধি নেই।

খেঁদি উঠিল, কহিল—কি বলতে হবে, আজ্ঞা করো—

মা বলিলেন, —বাড়ীতে এই অসুখ, একটা ভাবনা-চিন্তাও নেই !

খেঁদি কহিল, —আমি তো ডাক্তার নই !

মা বলিলেন,—হাতটা নাড়তে পাচ্ছি না, তার উপর এঁকে ফেলে নড়াও যায় না। তাই বলছি, দয়া হবে কি ?

খেঁদি কহিল,—কি ! বলো না, কি করতে হবে ?

মা বলিলেন,—ও বাড়ী থেকে তোর সদু পিসীকে একবার ডেকে আনবি ! তাকে বল্‌বো, সে যদি দুটি রেঁধে দেয় !

খেঁদি উঠিয়া বিরস মুখে সদু পিসীকে ডাকিতে গেল।

মা উঠিলেন, উঠিয়া জানালার দিকে চাহিলেন,—কালিদাস ডাক্তার আসিতেছে ! মা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কহিলেন,—এসো বাবা—ওপরে—

কালিদাস উপরে আসিল, আসিয়া রোগী দেখিল। দেখিয়া কহিল, —ইনফ্লুয়েঞ্জা। রোদ লাগিয়েছিলেন, বুঝি ?

মা কহিলেন—হ্যাঁ। কাল হুগলি গেছলেন। সেখান থেকে জ্বর-গায়ে ফিরেছেন রাত্রে।

কালীদাস বুক পরীক্ষা করিল ; টেম্পারেচার লইল, জ্বর ১০৩। কালিদাস কহিল,—মাধব এলো ? আমার ওষুধের বাক্স নিয়ে আসছে। ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। খাবেন বালি, অল্প দুধ সেই সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন। আজ শুধু এই।

মা কহিলেন.—আলু সেদ্দ-টেদ্দ দিতে পারি ?

কালিদাস কহিল—না। শক্ত জিনিষটা জ্বরের উপর দেবেন না। মাথায় একটা জলপটী দিলে ভালো হয়।

মা কহিলেন,—এই জ্বরে মাথায় জল দেবে ? বুকে সর্দ্দি-টর্দ্দি বসে যদি ?

কালিদাস কহিল,—সে ভয় নেই।

এমন সময় শচীনাথ ফিরিয়া আসিল. তার হাতে অষুধের ছোট বাক্স। শচীনাথ কহিল,—ইনিই ডাক্তারবাবু ?

কাকিমা কহিলেন,—হ্যাঁ বাবা।

শচীনাথ কহিল,—কেমন দেখলেন ?

কালিদাস কহিল,—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। একোনাইট দিয়ে যাচ্ছি, এতেই কাজ হবে।

শচীনাথ পকেট হইতে ছোট একটা শিশি বাহির করিল, বেঙ্গল কেমিক্যালের ও-ড্য-কলোঁ। সে কহিল. মাথায় অডিকলোন দেওয়া চলে না ? মাথায় অমন যাতনা! জ্বর কত দেখলেন ?

কালিদাস কহিল,—Hundred and three. তা অডিকলোনের পটী দিতে পারেন।

শচীনাথ কহিল.—আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করছিলুম। হোমিওপ্যাথি ওষুধ! ভারি নিষ্ঠা কি না! কি জানি, গন্ধে যদি কোন কায না হয়! বলিয়া সে মৃদু হাসিল।

কালিদাস কহিল—ওটা বাজে কথা। আমরা ত ব্যবস্থা দি অডিকলোনের—অষুধ তাতে কোথাও বাধে না।

রোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়া আরো তিন বারের ঔষধ দিয়া ডাক্তার কালিদাস বিদায় লইল।

শচীনাথ গায়ের জামা খুলিয়া আল্‌নায় রাখিয়া কহিল,—কাকিমা, আপনার পুকুরের জল কেমন ?

কাকিমা কহিলেন,—কেন বাবা ?

শচীনাথ কহিলেন,—নাইবো কি না।

কাকিমা কহিলেন কেন, গঙ্গায় ?

শচীনাথ কহিল,—আবার অত দূরে কে যায় !

কাকিমা কহিলেন,—জল ভালো। তবে পুকুরে চান করা অভ্যাস নেই তোমার, শেষে যদি ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া হয় !

শচীনাথ কহিল,—কিছু হবে না। আমরা সেখানে যে ডানপিটেমি ক'রে বেড়াই ! রোগ ? মা বলে, পাটনা সহরটার ফশল লোপ পেয়ে গেল তোর জ্বালায় ! তা যাক্, একটি কথা আছে, কাকিমা।

কাকিমা কহিলেন,—কি কথা বাবা ?

শচীনাথ কহিল,—আপনার তো হাতে ব্যথা দেখছি, অথচ আমাদের ডান হাতগুলি তো চুপচাপ থাকবে না !

কাকিমার মুখে চিন্তার রেখা ফুটিল। শচীনাথ তাহা লক্ষ্য করিল, তাই সে তাড়াতাড়ি বলিল,—আমার হাতের রান্নাটা নয় এক দিন খেলেনই,—ডাল-ঝোল যে রাঁধতে পারি না, এমন ভাববেন না !

কাকিমা চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—ষাট, ষাট ! কি দুঃখে রাঁধবে তুমি, বাবা ? তোমার হাতে খাবো বৈ কি। ম'রে গেলে পিণ্ডি দিয়ো, হাসি-মুখে খাবো,—আমি তো মরিনি, বাবা !

শচীনাথ কহিল—কিন্তু কাকাবাবুকে একলা রেখে আপনার রান্নার কাযে যাওয়া হবে না। তা হ'লে আমি খাবো না কখ্‌খনো—

কাকিমা আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—বেশ, বাবা। রাঁধবার লোক আসছে। তবে বড় আশা করেছিলাম, নিজের হাতে দুটি রেঁধে খাওয়াবো,—তা, ভগবান্ সে সুখটুকুও অদৃষ্টে দিলেন না!

শচীনাথ কহিল,—তাই বুঝি! তবেই আমায় খুব চিনেছেন! আমি এখন ক'দিন এখানে শেকড় গেড়ে থাকি, দেখুন। কাকাবাবু সারুন, পথ্য পান—তার পর আমাদের কথাবার্ত্তা পাকা হোক্—

কাকিমা কহিলেন,—তাই না কি! আমার এমন ভাগ্য হবে, বাবা!

শচীনাথ কহিল—বেশ, রান্না তো হবে। কিন্তু তার যোগাড় তো নেই। কোন্ দিকে কি আছে, আমায় বলুন,—তরকারী-টরকারী—

কাকিমা কহিলেন,—ব্যস্ত-বাগীশ ছেলে! সে কিছু করতে হবে না। খেঁদি আছে, ক'রে দেবে!

শচীনাথ একবার বাহিরের দালানের দিকে চাহিল, খেঁদি আসিতেছিল,—শচীনাথ তাহাকে শুনাইবার অভিপ্রায়েই একটু জোর গলায় কহিল—খেঁদি! আপনার ঐ বিদ্যাবতী মেয়েটি! তবেই হয়েছে! ও যদি রান্নার যোগাড় দেবে তো পড়বে কখন্?

খেঁদি সেই মুহূর্ত্তে ঘরে ঢুকিল। শচীনাথের কথাগুলা তার কাণে বেশ পরিষ্কার প্রবেশ করিয়াছিল, রাগে মুখখানা ঘুরাইয়া সে শচীকে লক্ষ্য করিল; কোনো কথা বলিল না, গুম্ হইয়া বইখানা টানিয়া পুরানো যায়গায়-বসিল। শচীনাথ দেখিল, দেখিয়া হাসিল, তার পর কহিল,—কি বই ওটা? দেখি, বলিয়া দ্বিধামাত্র না করিয়া বইখানা খেঁদির হাত হইতে টানিয়া লইল। খেঁদি অবাক! কাকিমারও চক্ষু পলকহীন। বইখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শচীনাথ কহিল,

—'মাসিক বসুমতী' জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪। এ পুরোনো! তা এ নাম কার গা কাকিমা? শ্রীমতী মাধুরী দেবী? বইয়ের ললাট-পটে মেয়েলি হাতের বাঁকা অক্ষরে নাম লেখা ছিল, শ্রীমতী মাধুরী দেবী।

কাকিমা কহিলেন,—খেঁদির নাম।

শচীনাথ খেঁদির পানে চাহিল, খেঁদি রুক্ষ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিল; শচীনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—ওঃ, ঐ তো মেয়ে, খেঁদিই ওর ঠিক নাম। উনি আবার মাধুরী!—তা এ সব বই মেয়েকে পড়তে দেন কেন? এতে যত সব লক্ষীছাড়া গল্প আর উপন্যাস আছে,—এ-সব বয়সে পড়া ঠিক নয়।

কাকিমা কহিলেন,—বারণ করি, শোনে না! শুধু এই? কতগুলো মাসিক কাগজ নেয়, তা জানো না! এ সব বড়দের কাগজ, তা ছাড়া মৌচাক, যাদুঘর, পাততাড়ী—কিছুই বাদ যায় না! ওঁকে বলি এত! উনি বলেন,—আহা, নিক্, নিক্! যদি খুসী থাকে!

শচীনাথ কহিল—ঐ আদর দিয়েই কাকাবাবু দেখছি মেয়েটার মাথা চিবিয়ে খাচ্ছেন! গুনের নিধি মেয়ে। বাপের এই অসুখ, মেয়ে ব'সে নভেল পড়ছে! ওর হাতে আপনি দেবেন রান্নার জোগাড় দেবার ভার!

কাকিমা একটু দুঃখিত হইলেন। মেয়ে বদ, তা তিনি জানেন; তবু এমন বদ যে, এক জন বাহিরে লোক দু দণ্ড আসিয়াই তাহাকে চিনিয়া ফেলিল! স্বামীর উপর অভিমান হইল। তিনি কি বলিতে কসুর করেন? এর পর বিবাহ হইলে মেয়ের নিন্দা যে তাঁহাকেই শুনিতে হইবে! শচী যেন আপন-জন—ঠিক কথাই বলিয়াছে—ছেলেটি স্পষ্ট কথা কয় বেশ!

খেঁদি নিজের মনে গুমরিতেছিল—যেন হাউয়ের পলিতার ডগায় জলন্ত দিয়াশলাই ছোয়ানো হইয়াছে—একটু ধরিলে হয় ! শোঁ করিয়া অমনি—

দেরী হইল না। শচীনাথ কহিল,—ব'সে কেন ? যাও, রান্নার ছ্যাখো গে। আমি একটা বিদেশী লোক এসেছি, খেতে দিতে হবে —হুঁশ থাকে যেন।

সুযোগ পাইতেই খেঁদি ফোঁশ্ করিয়া উঠিল। সে কহিল, বয়ে গেছে ! পশ্চিমী খোট্টা একটা খেলে না খেলে:আমার তো ভারী ইয়ে—বলিয়া সে শোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মা লজ্জায় কাঠ ! শচীনাথ হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাইজের প্রলোভন

বেলা প্রায় দশটা। শচীনাথ পার্ব্বতী হালদারের টেম্পারেচার লইল, জ্বর কমিয়াছে। সে তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া মাথায় অডিকলোনের পটী দিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। জোর করিয়া কাকিমাকে সে পাঠাইয়াছিল মুখ-হাত ধুইয়া পূজা-আহ্নিক সারিয়া আসিবার জন্য। তিনি ঘরে ফিরিলে, শচীনাথ কহিল, আপনার পূজো আহ্নিক সারা হলো ?

কাকিমা কহিল,—হ্যাঁ, বাবা, হয়েছ।

শচীনাথ কহিল,—জ্বর একটু কমেছে, প্রায় দেড় পয়েন্ট। বলিয়া সে থার্ম্মোমিটারটা দেখাইল।

কাকিমা কহিলেন—জ্বর দেখা কাঠি পেলে কোথায়, বাবা ? শচীনাথ কহিল,—সেই যে বেরিয়েছিলুম, কিনে এনেছি তখন। এটা যত্ন ক'রে রেখে দেবেন। বাড়ীতে একটা থাকা দরকার।

কাকিমা কহিলেন,—সবই ছিল, বাবা! তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

পার্ব্বতী হালদার চোখ মেলিয়া চাহিলেন। এতক্ষণে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, জরটা কমিতে একটু ঘুমাইয়াছিলেন। তিনি ডাকিলেন, —শচীনাথ!—

শচীনাথ কহিল, —এই যে আমি, কাকাবাবু—

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন—তোমার কথা কাল এসেই শুনেছি। তোমার বাবার চিঠিও পেয়েছি—

শচীনাথ কহিল—এখন সে কথা থাক্, আপনি আগে সেরে উঠুন। আমি এবার চান ক'রে আসি।

—তোমায় তেল দিই বাবা। বলিয়া কাকিমা ডাকিলেন, ওরে খেঁদি!

কোনো সাড়া নেই। খেঁদি এ মুল্লুক ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে! শচীনাথ কহিল, তেলের জন্য আর খেঁদিকে ডাকতে হবে না, আমি নীচে থেকে নিচ্ছি, রান্নাঘরে কে আছেন? সদু পিসীমা? আমি যাবো? তিনি কিছু মনে ভাববেন না?

কাকিমা কহিলেন—না, বুড়ো মানুষ—

শচীনাথ চলিয়া গেল। কাকিমা পার্ব্বতী হালদারকে কহিলেন, —মেয়েকে এমনি তৈরী করছো যে, হাবুল দু'দণ্ড এসেই চিনে ফেলেছে—কত নিন্দে করছিল—

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন,—খেঁদিকে ডাকো তো।

গৃহিণী কহিলেন, মেয়েকে এইতো ডাকলুম—গেরায্যিই নেই। বই নিয়ে দিবেরাত্তির প'ড়ে আছে। এখন কি সাজে? তখন সাজতো! ঘরের কুটোটুকু নেড়ে সাহায্য করে না। তা না করুক, এত নবাবী চাল মেয়েমানুষের সাজে না। কোন্ নবাবের ঘরে যাবেন যে, পাঁচটা বাঁদী চামর ঢুলুবে, পাখা নাড়বে, আর উনি কিংখাপের আসনে ব'সে বই পড়বেন! মেয়েকে কায শেখাও গো, অত আদর দিয়ো না।

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন—হুঁ!—বলিয়া পাশ ফিরিলেন।

গৃহিণী রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলেন; গিয়া দেখেন, খেঁদি স্নান করিয়া আসিয়া গামছায় মাথার চুল মুছিতেছে। মা কহিলেন,—নাওয়া হলো?

খেঁদি তার চিরাভ্যস্ত ঝাঁজালো স্বরে কহিল—হ্যাঁ, নাওয়া হলো বৈ কি! নাইতে নেমেছি, সাবানও গায়ে মাখিনি, আর তোমার ঐ খোট্টা নব কার্ত্তিক গিয়ে হাজির। এত-বড় অসভ্য—নাইচি, চলে যা—তা, না, ঝপাং ক'রে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। জ্বালাতন করেছে! নিজের ঘরে মানুষ স্বস্থির হয়ে নাইবে না, খাবে না, বই পড়বে না?

মা শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন—চুপ, চুপ, চুপ কর্, সর্ব্বনাশী! কাকে কি বলিস, তা জানিস না!

খেঁদি কহিল—ওঃ, বয়ে গেছে আমার। উনি রাজ-চক্রবর্ত্তীই হন আর দিল্লীর বাদশাই হন, তাতে আমার কি? আমার যেন ছাতা দিয়ে মাথা রাখবেন—দ্যাখো না!

মেয়ে গজ-গজ করিতে করিতে উপরে চলিয়া গেল—একটু পরেই ঝপ করিয়া ভিজা কাপড়খানা উপর হইতে নীচেকার

উঠানে ফেলিয়া দিল। মা মুহূর্ত্ত কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে রান্না-ঘরে গিয়া কহিলেন,—তোমার কতদূর হলো ভাই, ঠাকুরঝি ?

সদু ঠাকুরঝি কহিলেন—ঝোলটা সাঁৎলাচ্ছি। ডাল হয়ে গেছে, ভাজা হয়ে গেছে, মাছের চচ্চড়িও হয়ে গেছে, ঝোলটা নামলেই ভাত চড়িয়ে দেবো। তা, হ্যাঁ বৌ, একটা কথা বলছিলুম—

গৃহিণী কহিলেন,—কি ?

সদু ঠাকুরঝি কহিলেন—মেয়ে নিয়ে ভাবছো এত! তা এ ছেলেটি তো পার্ব্বতীদার বন্ধুর ছেলে! কত নাম শুনেছি। সেই বন্ধুকে ধরো না, যদি—

বাধা দিয়া গৃহিণী কহিলেন—তেমন বরাতই যদি হবে, তা হ'লে আর তোমার দাদার বুড়ো বয়সে এ দশা হয়!—হুঁ, ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে এ যে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা বোন্—

সদু ঠাকুরঝি কহিলেন—তা বটে! তবু,—হাঁ, চ'লে যাচ্ছো? পার্ব্বতীদার বার্লিটা হয় গেছে, নিয়ে যাও ভাই বৌ, একটু খাইয়ে দাও গে—জ্বরটা কমলো ?

গৃহিণী কহিলেন—কমেছে। বার্লিটা নিয়ে যাচ্ছি, খেঁদির কাপড়-খানা কেচে শুকুতে দিয়ে যাই। তোমরা পাঁচ জনে চোখ তুলে ছাখো বলেই দিন কাটছে, না হলে কি যে হতো—গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন।

গৃহিণী খেঁদির কাপড়খানা লইয়া পুকুরে গেলেন, শচী তখন মাঝ-পুকুরে গা ডুবাইয়া আছে। তাঁহাকে দেখিয়া শচী কহিল,—বেড়ে জল কাকিমা উঠিতে ইচ্ছা করে না—ও আপনি কি করছেন ? খেঁদির কাপড় ?

কাকিমা কহিলেন,—হ্যাঁ, কেচে নিয়ে যাই।—তাঁর বেদনাগ্রস্ত হাতে কষ্ট হইতেছিল।

সাঁতরাইয়া ঘাটের কাছে আসিয়া শচীনাথ কাপড়খানা টানিয়া লইল, কহিল—ওই হাতে!—আপনি এ কি কচ্ছেন, কাকিমা? মেয়ে নিজে এটুকু করতে পারে না? আপনি যান, আমি কেচে দিচ্ছি!

কাকিমা কহিলেন—না রে পাগলা, না—ছি, ছোট বোন্ হয়!—

শচীনাথ কহিল- ছোট বোন্, তাতে কি! আপনাকে ও হাতে আমি কায করতে দেবো না।

শচীনাথ নাছোড়বান্দা। কাকিমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কাপড়টা নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে শচীনাথ কহিল—একটা কথা বল্‌বে, কাকিমা?

কাকিমা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কহিলেন,—কি?

শচীনাথ কহিল,—আপনার মেয়েটিকে আমি দু'দিনে শুধরে দিতে পারি। দেবো?

কাকিমা কহিলেন—তা যদি পারো বাবা—

শচীনাথ কহিল—আপনি রাগ করিবেন না? তাকে বকলে বা শাসনের ছল করলে?

কাকিমা কহিলেন—রাগ করবো! প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করবো তা হ'লে। ও যে কতখানি ব্যথা হয়ে ফুটে আছে আমার বুকে! সে মা আমি নই বাবা যে, মেয়ে দোষ করলে তার ভালোর জন্যে কেউ তাকে বকলে বা শাসন করলে রাগ করবো! আমি মা, ডাইনী মায়া নয় আমার!

শচীনাথ কহিল—আচ্ছা। এই কথা রইলো। আপনি যান তা হ'লে। আমি কি করি, শুধু দেখুন—

কাকিমা চলিয়া গেলেন। শচীনাথ স্নান সারিয়া উঠিয়া নিজের কাপড়খানা কাচিল এবং শুষ্ক কাপড় পরিয়া নিজের ও খেঁদির কাপড়

দু'খানা কাঁধে ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া একবারে দোতলায় উঠিল; উঠিয়া দেখে, খেঁদি ভিজা চুল রৌদ্রে মেলিয়া সেই বই লইয়া জানালায় বসিয়াছে। সে কাছে গিয়া বইখানা টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিল—নবাব সাহেব ব'সে বই পড়বেন! আর আমি ওঁর কাপড় কাচবো!

খেঁদি তীব্র চোখে চাহিল, শচীনাথের কাঁধে তার ভিজা শাড়ী, শচী কহিল—নিন, উঠুন মশাই। এই কাপড় দু'খানা শুকোতে দিন। ওটা আপনার, এটা আমার—বলিয়া কাপড় দুখানা খেঁদির হাতের উপর রাখিল।

কাপড় দু'খানা ছুড়িয়া মেঝেয় ফেলিয়া দিয়া খেঁদি দাঁড়াইল, কহিল,- বয়ে গেছে! আমি বাড়ীর ঝী কি না—

শচীনাথ হাসিল; হাসিয়া বলিল—তুমি ঝীই। বাড়ীর মেয়েকে ঝী বলে। উপস্থিত যখন ঝী বা চাকর নেই, তখন এ কাজ মা'র নয়, তোমার। বাড়ীর যে ঝী, তার। ওঠো তোলো ও কাপড় দুটো মেঝে থেকে।

খেঁদি চোখ রাঙ্গাইয়া চাহিল। শচীনাথ তাহার হাত দুটা সবলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—তোলো। কেচে এনেছি, ধূলো লাগিয়েছো—আবার কেচে আনবে, চলো,- বলিয়া ক্ষিপ্র হস্তে কাপড় দুটা কাঁধে ফেলিয়া খেঁদিকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া কহিল,—তবে রে, মেয়ের তেজ ছাখো! কাপড় কাচতে পারবেন না, তাতে ধূলো মাখাতে পারবেন! ঐ কাপড় তোমায় দিয়ে কাচাবো, তবে আমার নাম শচীনাথ—

খেঁদি হাত-পা ছুড়িতে লাগিল। কিন্তু পারিবে কেন? শচীনাথ রীতিমত জোয়ান, স্যাণ্ডো করে—বাঙ্গালা দেশের 'বাদল-রাতের কাজল

আঁখি'র কবিতা-লেখা ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা রমণী-স্থলভ ক্ষীণ দেহ তো তাহার নহে! খেঁদিকে ঘাটে লইয়া গিয়া সে দাঁড় করাইয়া দিল, কহিল,—কাচো কাপড়। আমি ছাড়বো না। আমার গায়ে বেশ জোর আছে, দেখেছো তো ?

খেঁদি কাঠ! শচী সেই কাঠকে টানিয়া ধরিয়া জলে নামাইল এবং কাপড় জলে ফেলিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে দিয়া কাপড় কাচাইয়া লইল, তার পর নিজে নিংড়াইয়া খেঁদির হাতে কাপড় দু'খানা দিল; দিয়া কহিল,—ভালোয় ভালোয় নিয়ে গিয়ে শুকোতে দেবে ? না, তেমনি পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে যাবো ?

এ কথায় খেঁদি কাপড় লইয়া ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিল। শচীনাথ হাসিয়া মনে মনে কহিল, ঔষধ ধরিয়াছে! হুঁ, তুমি তো একটা একরত্তি মেয়ে—বলে, কত পাজী গুণ্ডাকে—

দুই চোখে আগুন ভরিয়া খেঁদি শচীর পানে চাহিল। ভাগ্যে মানুষের চোখের আগুন গায়ে তাপের সঞ্চার করে না, নহিলে—

শচীনাথ হাসিল ; খেঁদি সবলে কাপড় দুটা টানিয়া লইয়া দোতলার ছোট ছাদে চলিয়া গেল এবং অত্যন্ত কঠিন ভঙ্গীতে কাপড় দুটা মেলিয়া দিল। তার পর দাঁড়াইয়া সে ডান হাতটার পানে লক্ষ্য করিয়া হাতটা চাপিয়া ধরিল। চাপিয়া সেই খানেই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শরতের রৌদ্র তখন নির্ম্মল আকাশে আপনার দোর্দ্দণ্ড তেজ প্রসারিত করিয়া দিতেছে।

শচীনাথ উঁকি মারিয়া দেখিল, দেখিয়া ধীরে পদে আসিয়া খেঁদির পাশে দাঁড়াইল, কহিল,—হাতে কি হলো ? দেখি—

কিছু নয়। বলিয়া খেঁদি কাপড়ে হাত ঢাকিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল।

—দেখি না, লক্ষী মেয়ে তুমি! বলিয়া শচীনাথ ধীরে তার হাতটা টানিয়া দেখিল, হাতে সোনার দু'গাছি চুড়ি—চুড়ির কোলেই হাতে রক্তের দাগ! নখ বসিয়া ছড়িয়া গিয়াছে! তারই জন্য শচীনাথ কহিল,—আমিই ছড়ে দিছি—না?

খেঁদি সরোষে কহিল—না, ভূতে ছড়ে দেছে! কোথাকার পশ্চিমী খোট্টা। আমাদের বাড়ী এসে—

—দারুণ অত্যাচার করছি, না? বলিয়া শচীনাথ হাসিল, অপ্রতিভের হাসি। তার পর কহিল—এসো, ওষুধ দি, সেরে যাবে।

খেঁদি কহিল—থাক, আর দরদে কায নেই। বলিয়া সে দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল। শচীনাথ নীচে নামিয়া গেল। পুকুরের দিকে বাগান। বাগানে প্রচুর ঘাস। দুই চারিটা গাঁদার চারাও মাথা তুলিয়াছে। শচীনাথ গাঁদার পাতা তুলিয়া হাতে পিষিয়া দোতলায় আসিল। খেঁদি তখন বই লইয়া বসিয়াছে, বাপের ঘরে। মা হাতে কেরোসিন তৈল মালিশ করিতেছেন।

শচীনাথ কহিল—ওষুধ দি, এসো খেঁদি—

খেঁদি চোখ তুলিয়া চাহিল, তার পর বইখানাকে উল্টাইয়া রাখিয়া চাকতে সরিয়া গেল।

কাকিমা কহিলেন—কিসের ওষুধ?

শচীনাথ কহিল—খেঁদির হাত ছড়ে গেছে; তাই গাঁদাপাতা—

কাকিমা কহিলেন—ও, তাই বুঝি পালালো। এমন মেয়ে দেখবে না কোথাও, বাবা—

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন—শচীর খাওয়ার কি ব্যবস্থা হলো?

কাকিমা কহিলেন—সে সব হচ্ছে। আমার বরাত—ভেবেছিলুম নিজের হাতে—

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন—বরাত যখন মন্দ হয়, তখন এমনই হয়—তা শচী, আজ আছো তো ?

শচীনাথ কহিল - নিশ্চয়। আপনার অসুখ না সারলে আমি যাবো না। আপনার জ্বর ছাড়ুক না, কুইনিন দেবো। আমার ব্যাগে sugar-coated বড়ি আছে। সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে।

শচীনাথ গিয়া মাসিক পত্রখানা তুলিল। একটা গল্প চোখে পড়িল। এই গল্পটাই খেঁদি পড়িতেছিল না ? ঠিক! তাকে জব্দ করিয়া দিব।

শচীনাথ বাহিরে গেল। দালানে এক জানলায় খেঁদি বসিয়া আছে। যেন কোন দিকে লক্ষ্য নাই ! অথচ—

শচীনাথ পা টিপিয়া আসিয়া তার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, কহিল,—এইবার ! ওষুধ দিয়ে দেবো তো—

খেঁদির রাগ তেমন নাই, তবু ঝাঁজ দেখাইল। কহিল—না – না না -

আর না ! শচীনাথ ছড়া যায়গাটায় গাঁদা-পাতাগুলা চাপিয়া দিল ; দিয়া সেখানটা চাপিয়া ধরিয়া রহিল। খেঁদি চোখ বাঁকাইয়া শচীনাথের পানে চাহিল ; শচীনাথ তার পানেই চাহিয়া ছিল। চোখে চোখ মিলিবামাত্র দু'জনে হাসিয়া ফেলিল। শচীনাথ কহিল,—রাগ পড়েছে ! এবারে ভাব তো ?

খেঁদি কোন কথা কহিল না। শচীনাথ কহিল,—লক্ষ্মী হয়ো, তা হলে ভালো একটা প্রাইজ দেবো।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোট মামীর দৌত্য

বৈকালের দিকে পার্ব্বতী হালদারের জ্বর আবার বাড়িল। শচী কহিল,— এ্যালোপাথি ডাক্তার ডাকি—

কাকিমা কহিলেন,—কিন্তু কালিদাস কি মনে করবে?

শচীনাথ কহিল,—মনে করবার কিচ্ছু নেই। বলবেন, ঐ পশ্চিমী খোট্টাটার কায।

তা বটে! কিন্তু দু'দিন পরে আমি যখন চলিয়া যাইব, তখন অসুখ-বিসুখে ঐ কালিদাসই যে ভরসা—

শচী থামিল। বুঝিয়া কহিল,—পরে যদি দরকার হয় কখনো? তা বোধ হয় হবে না। কাকাবাবু সেরে উঠুন—আপনারা তখন এখানে থাকলে তো চলবে না—আমাদের কারবার হবে কলকাতায়— কাকাবাবু কি এখান থেকে টানা-পোড়েন করবেন?

আনন্দে কাকীমার বুক উথলিয়া উঠিল। ভাগ্যলক্ষ্মী বুঝি সদয় হইলেন! না হইলে ছেলেটি আসা অবধি চারিধারের আঁধারও কেমন ঝরিবার মত দেখাইতেছে—আকাশে রাঙ্গা আলোর আভাসও ঐ দেখা যায়! ছেলেটির এই গায়ে-পড়া ভাব, দুরন্তপনার মধ্যেও মমতার কি প্রাচুর্য্যই না চোখে পড়িতেছে! দুদ্দিন কি মানুষের কাটে না? তিনিই পথ করিয়া দেন, তিনিই দেখেন। সকলই তাঁর ইচ্ছা! বিধাতার করুণার প্রতি তাঁর বিশ্বাসও ফিরিয়া আসিতেছিল।

শচীনাথ ছাড়িবার পাত্র নহে। খুঁজিয়া পাতিয়া এ্যালোপ্যাথি ডাক্তার সে ধরিয়া আনিল। তিনি আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

শচীনাথ নিজে গিয়া ঔষধ আনিল ; আনিয়া রোগীকে এক ডোজ খাওয়াইয়া দিল। কাকিমা কহিলেন,—মাধব কোথায় গেল ?

শচীনাথ কহিল —এসেছিল। বাসন-কোসন মেজে যাবার সময় বল্‌লে, তার গায়ে বেদনা, মাথা ধরেছে।

কাকিমা কহিলেন,—সে-ও তা হলে পড়লো ! নিরাশার অন্ধকার দেখিয়া কাকিমা ভীত হইলেন।

কাকিমা কহিলেন,—তুমি বাবা একটু বসো—আমি রাত্রের খাবারের বন্দোবস্ত করি—

শচীনাথ কহিল,—সছু পিসীমা ?

কাকিমা কহিলেন,—এ বেলায় তার মেয়ের বাড়ী কি কায আছে, সেখানে গেছে। কাল আসবে, ব'লে গেছে।

শচীনাথ কহিল,—বেশ তো, আমরা দেখি—খেঁদি কৈ ?

কাকিমা কহিলেন,—শুয়ে ঘুমুচ্ছে ঐ যে—

শচীনাথ চাহিয়া দেখে, কাকাবাবুর ওধারে বিছানায় মুখ গুঁজিয়া সে ঘুমাইতেছে। শচীনাথ কহিল,—কিছু রান্না-বান্নার দরকার নেই, আমি যোগাড় দেখছি—

বলিয়া সে কাকিমাকে নিষেধ তুলিবার সময়-মাত্র না দিয়া আবার বাহির হইয়া গেল এবং আধ ঘণ্টা পরে একটা বড় চ্যাঙ্গারিতে করিয়া এক রাশ খাবার লইয়া ফিরিল। কলা, মিঠাই, গজা, রসগোল্লা, জিলিপি,—একরাশ মুড়ি আর মুড়কি। শচীনাথ কহিল,—আজ রাত্রে ঐ গোরুর দুধ আছে—এই কলা আর মুড়ি-মুড়কি—খাসা ফলার হবে। বামুনের ছেলে ফলার পেলে আর কিছু চায় কখনো, কাকিমা ?

কাকিমা হাসিয়া কহিলেন,—আচ্ছা ফলারে বামুন কোথাকার! বেশ বাবা, এলে একদিন বেড়াতে, তা এমন কাকিমা যে—কাকিমার কথা শেষ হইল না, চোখে জল আসিল।

শচীনাথ কহিল,—খেঁদিকে তুলুন গায়ে ঠেলা দিয়ে—দুধটা গরম করুক। আপনি ফলার মেখে দিন। আপনিও ঐ খাবেন তো! না খান, মিষ্টি আর ফল আপনার থাক্—

কাকিমা কহিলেন,—আচ্ছা বাবা তুমি একটু জিরোও—আমি দেখছি।

বলিয়া তিনি খেঁদিকে ঠেলিয়া তুলিলেন। খেঁদি চোখ মেলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া দেখে, শচীনাথ উপুড় হইয়া মেঝেয় শুইয়া মাসিক-বসুমতী পড়িতেছে। সে বিছানাতেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পরের দিন। খেঁদির ঘুম ভাঙ্গিতে চোখ চাহিয়া দেখে, শচীনাথ বাপের মাথায় পাখার বাতাস করিতেছে। মা ঘরে নাই।

শচীনাথ কহিল,—তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও—ধুয়ে চা তৈরী করো—

খেঁদি কোনো জবাব না দিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। একটু পরে পার্ব্বতী হালদার চোখ চাহিলেন; শচীনাথ কহিল, কেমন আছেন?

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন,—জরটা বোধ হয় ছাড়ছে—ঘাম হচ্ছে।

শচীনাথ তাঁহার কপালে হাত রাখিল; ঘাম হইতেছে। থার্ম্মোমিটর লইয়া দেখিল, ৯৮।

শচীনাথ কহিল,—দেখলেন, ওষুধের গুণ; এ্যাকোনাইট্ খেয়ে থাকলে আরো তিন দিন সময় লাগতো।

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন,—তুমি সারা রাত ঘুমোও নি?

শচীনাথ কহিল,—ঘুমিয়েছিলুম বৈ কি. তবে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙ্গেছিল।

পার্ব্বতী হালদার কহিলেন,—বড় কষ্ট গেছে বাবা—

শচীনাথ কহিল,—আমার অসুখ হলে আপনিও ঘুমুতে পারতেন না। বাড়ীতে অসুখ থাকলে মানুষ কখনো ঘুমুতে পারে?

তা যে পারে, কথাটা বলিয়া শচীনাথের মনে পড়িল; তার সাক্ষী খেঁদি। কেমন অঘোরে সে ঘুমাইয়াছে!

শচীনাথ দালানে আসিয়া ডাকিল,--কাকিমা—

উত্তর হইল,—যাই বাবা।

কাকিমা আসিলেন। শচীনাথ কহিল,—উনি উঠেছেন, মুখ ধুইয়ে দিন্—তার পর ওষুধ খাবেন। ওষুধের পর ঐ হরলিক্স মিল্ক এনেছি, দেবেন। আমি তৈরী ক'রে দেবো। খেঁদি গেল কোথায়। ষ্টোভটা জালুক না—

খেঁদি তখনি আসিল। শচীনাথ কহিল,—দিব্যি তো ঘুমিয়েছো. এখন তোমার জাগবার পালা।

খেঁদি কোনো কথা কহিল না। শচীনাথ কহিল,—হাতে বই নেই যে! বীণাপুস্তকরঞ্জিত হস্তে ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে—শ্রীবিষ্ণু! বীণা নেই। ওটা বদলে বলতে হবে, মাসিক-বসুমতী সর্ব্বদা হস্তে, খাণ্ডারী-মেজাজিনী খেঁদি নমস্তে—কেমন? বলিয়া সে হাসিল।

খেঁদির চোখে আবার পরিবর্ত্তন দেখা দিল। মুখখানা তীব্র ঘুরাইয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

শচীনাথ কহিল,—দালানে ষ্টোভ আনো. চায়ের সরঞ্জাম আনো—ভুল না হয়—আমি ঘাট থেকে মুখ-চোখ ধুয়েছি আস—

খেঁদি গুম্ হইয়া রহিল। লোকটা কে গো! এদিকে ধমক আছে, আবার দরদ করিতেও ছুটিয়া আসে! হাত ছাড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া ঔষধ লাগায়! ভারী মজার লোক!

শচীনাথ মুখ ধুইয়া আসিয়া দেখে, ষ্টোভ বা চায়ের সরঞ্জাম দালানে নাই। ঘরে ঢুকিয়া দেখে, খেঁদি বিছানার উপর শুইয়া আছে। শচীনাথ ডাকিল,—খেঁদি—

খেঁদি সে ডাকে কোনো সাড়া দিল না। শচীনাথ কহিল,—কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না? ওঠো—

খেঁদি উঠিল না। শচীনাথ ষ্টোভ ও চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া দালানে আসিল; ষ্টোভ জ্বালিয়া জল গরম করিল ও একটা পেয়ালায় হরলিক্স তৈরী করিয়া কাকিমার হাতে দিল; দিয়া কহিল,—খাইয়ে দিন আগে। ওষুধ পরে হবে—তার পর কহিল,—আপনি চা খাবেন, কাকিমা?

কাকিমা কহিলেন,—না বাবা! আমি ও সব খাই না। তোমার যখন শাশুড়ী আসবে, তখন ভালো ক'রে খাইয়ো—

শচীনাথ চলিয়া গেল—চা তৈরী করিল। দুটি বড় পেয়ালায় চা ভরিয়া নিঃশেষ করিল। এবং পেয়ালা প্রভৃতি ধুইয়া ঘরের মধ্যে রাখিয়া কাকাবাবুর পাশে গিয়া বসিল।

খেঁদি উঠিয়া চতুর্দ্দিকে চাহিল, তার পর কহিল,—আমার চা কৈ মা?

শচীনাথ কহিল, নেই। খেতে হয় নিজে তৈরী ক'রে খাও গে। আমি তোমার চাকর নই যে, চা ক'রে খাওয়াবো! অত বড় মেয়ে, বললুম তা শোনা হলো না! আমি অতিথি, আমার কি চা ক'রে খাবার কথা তুমি থাকতে!

বটে ! এমনি করিয়া ! রাগে অভিমানে তার চোখ ফাটিয়া জল গড়াইয়া পড়িবার মত হইল ! আবার কাল বলা হইল, ভাব হয়েছে ! ছোট লোক, পাজী !—খেঁদি শুইয়া পড়িল।

শচীনাথ কহিল—রান্নার কি হবে, কাকিমা ? আপনার মাছ তো আসেনি, যাবো বাজারে ?

কাকিমা কহিলেন—না বাবা। সে সব আমি ঠিক করছি—

শচীনাথ কহিল—আপনার হাত কেমন ? ঐ তো দেখছি, নাড়তে পারছেন না। খেঁদি রাঁধুক—নইলে উপোস দিতে হবে।

খেঁদি কটমট করিয়া তাহার পানে তাকাইল।

কাকিমা কহিলেন,—সত্যি, ওঠ্ খেঁদি। তোর সদু পিসী মেয়ের বাড়ী থেকে ফিরলো কি না, খোঁজ নে—

খেঁদির বহিয়া গিয়াছে ! খেঁদি নড়িল না। পার্ব্বতী হালদার ডাকিলেন,—খেঁদি।

খেঁদি উঠিয়া বসিল। পার্ব্বতী হালদার কহিমেন—ত্যাখ্ তোর সদু পিসীকে—

খেঁদি কহিল,—সে তো তোমাদের মাইনে-করা রাঁধুনী নয় যে, রোজ রোজ রাঁধতে আসবে। নিজে খেতে ঠাঁই পায় না—আবার শঙ্করাকে ডাকে। ওঃ—

বাপ-মা দুজনে এতটুকু হইয়া গেলেন। বেয়াদব মেয়ে !

শচীনাথ কহিল,—শঙ্করা তা ব'লে নড়ছেন না ! এ তেমন শঙ্করা পাওনি ! তোমায় দিয়ে রাঁধিয়ে তবে খাবো। এ শঙ্করা—কাকাবাবু, আপনি ব্যস্ত হবেন না। কাকিমা, আপনিও নড়বেন না। আমি দেখছি—হুঁ, বলে, আমার দাপটে পাটনার করিম গুণ্ডা অবধি জুজুটি হয়ে থাকে, এ তো একটা এক-ফোঁটা মেয়ে—

শচীনাথ কহিল,—ওঠো খেঁদি—

খেঁদি উঠিল না।

শচীনাথ কহিল, তবে রে মেয়ে! কালকের কথা ভুলে গেছ! বলিয়া সে রুখিয়া খেঁদির সামনে দাঁড়াইল।

খেঁদি ভয়ে উঠিয়া পড়িল।

শচীনাথ কহিল,—রান্নাঘরে চলো। দু'জনে যা হয় চেষ্টা ক'রে দেখি গে।

কাকিমা কহিলেন,—তুমি? না, বাবা—ছি।

শচীনাথ কহিল,—লক্ষ্মীটি কাকিমা, আপনি কোন কথা কবেন না—দেখুন না, আমরা চড়িভাতে করি কেমন, এসো খেঁদি—না এলে জানো তো—

খেঁদি বিনা বাক্যব্যয়ে রান্নাঘরে ঢুকিল। শচীনাথও সেই সঙ্গে। শচীনাথ কহিল,—তুমি উনুনে আগুন দিতে জানো?

খেঁদি কহিল—না।

—তবে?

খেঁদি কোন জবাব দিল না।

শচীনাথ কহিল,—আচ্ছা, ছাখো—কয়লা কোথায়? আনো!—আনো!—

খেঁদি কাঠ! শচীনাথ কহিল,—আনো! নইলে খেতে পাবে না,—আমায় চেনো তো—

তা চেনে। খেঁদি কয়লা আনিতে গেল। ছোট ঝুড়ি ভরিয়া কয়লা আনিল।

শচীনাথ কহিল—দেশলাই?

খেঁদি জবাব দিল না। শচীনাথ কহিল,—ওপরে আছে, আনো"; আর কেরোসিনের ডিপে? ঐ আছে।

ঘুঁটে ক'খানায় খেঁদি দেশলাই জ্বালিয়া আগুন ধরাইয়া দিল। কোন মতে উহুন জ্বালিল, খেঁদি ভাতের হাঁড়ি উহুনে চাপাইয়া দিল।

শচীনাথ চাল ধুইয়া আনিল এবং হাঁড়িতে চাল দেওয়া হইলে সে উপরে গেল। যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তার হাতে এক পেয়ালা চা। শচীনাথ কহিল,—চা খাও,—তৈরী ক'রে আনলুম।

খেঁদি সে দিকে চাহিল না। শচীনাথ কহিল,—খাও,—লক্ষ্মীটি। ছি, রাগ করতে আছে কি!

শচীনাথ খেঁদির মুখে চায়ের পেয়ালা ধরিল।

খেঁদি হাসিয়া কহিল,—কেমন! চা যে দেবে না বলেছিলে

শচীনাথ হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তখন যে আড়ি ছিল। এখন তো ভাব হয়েছে—কেন যে অমন করো থেকে-থেকে? এই তো দিব্যি লক্ষ্মী হয়েছো!

খেঁদি চা পান করিল।

শচীনাথ কহিল,—হু'চারটে আলু ছেড়ে দিয়ো। আলু ভাতে ভাত তোফা হবে-খন। তার পর গোরুর হুধ আছে। আর কালকের কলাও গোটাকতক আছে। হুঁঃ, বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালীর আবার খাওয়ার ভাবনা। হতো পাটনা, তো চিচিঙ্গে চিবিয়ে খেতে হতো, নয় তো ডালভাজা ঝালপুরী—রামচন্দ্র!

খেঁদি কহিল,—ডাল হবে না?

শচীনাথ কহিল,—পারবে?

খেঁদি কহিল,—মাকে বলি, মা দাঁড়িয়ে থেকে ব'লে দেব'খন।

শচীনাথ কহিল,—ওঁকে না-ই ডাকলে। আমরাই করি এসো না। প্রাইজের কথা মনে আছে?

খেঁদি কহিল,—কি প্রাইজ? খেঁদির মুখে হাসি ফুটিল। শচীনাথ তাহা লক্ষ্য করিল। হাসিলে খেঁদিকে বেশ মানায় তো!

বাহিরে বাতাস বহিতেছিল। শরৎ-প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাস! ভারী মিঠা!

শচীনাথ কহিল,—কি প্রাইজ নেবে, বলো—

খেঁদি কহিল,—বই? না,—

শচীনাথ কহিল,--বেশ। বই-ই। তুমি ফর্দ্দ দিয়ো—

খেঁদি কহিল,—না, আমি দেবো না। যা খুসী—

শচীনাথ কহিল,—আচ্ছা। কাকাবাবু সারলেই কলকাতায় যাবো, আর যাবার সময়—

খাওয়া-দাওয়া চুকিল। পার্ব্বতী হালদার ভালো আছেন, জ্বর হয় নাই। শচীনাথের সঙ্গে তাঁহার কারবারের কথাও হইল। পাটনা হইতে সুধানাথ বাবুও চিঠি লিখিয়াছেন, কলিকাতায় বড় দোকান খুলিবার জন্য। আপাততঃ দশ হাজার লইয়া; তার পর তাঁর ইচ্ছা আছে, একটা ছোট-খাট মিল খুলিবার। তবে পার্ব্বতীকে সব ভার লইতে হইবে। কারবারের সঙ্গে দুরন্ত ছেলেটাকে বাগাইয়া মানুষ করিবারও—

পার্ব্বতী হালদার গৃহিণীকে বলিতেছিলেন,—কথায় বলে, বন্ধু! তা কি আজকাল মেলে? ভগবান সর্ব্বস্ব নিয়েও এই দয়াটুকু করেছেন —যে, বন্ধুকে বন্ধু রেখেছেন!

সে-কথা কতখানি সত্য, তার পরিচয় গৃহিণীও পাইয়াছেন।

রান্নাঘরের ভার এখন খেঁদির হাতে, শচী তার এ্যাসিষ্টাণ্ট। সেদিন পার্ব্বতী হালদার পথ্য করিবেন,—সদুপিসীকে ডাকিতে হয় নাই,

—খেঁদি রাঁধিবে, মা দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দিবেন। খেঁদির বই এখন উঠিয়াছে শচীর হাতে। আজ শচী বাজার ঘুরিয়া পল্‌তা-পাতা আনিয়াছে, বাটা মাছ, ছোট মাগুর। দেখিয়া কাকিমা হাসিয়া কহিলেন,—ছেলের আমার সব জানা আছে। তিনি উপরে গেলেন, শচীর তাড়ায়—কাকাবাবু একা আছেন।

খেঁদি বাটা মাছ ভাজিতেছিল,—আগুনের আঁচে তার মুখখানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। শচী ডাকিল,—খেঁদি—

খেঁদি মাছ ভাজিতে ভাজিতে কহিল,—কি?

শচী কহিল,—এই গল্পটা পড়েছো? সৌরীন মুখুয্যের 'জয়যাত্রা'?—

খেঁদি কহিল,—হুঁ। সেই তা নীলিমার মামা—

শচী কহিল,—হ্যাঁ।—তা, আমি কি ভাবছিলুম, জানো?

—কি?

শচী কহিল,—আমিও তো ট্রেণে ক'রে কাঁটালপাড়ায় এসেছি। গল্পের নায়ক হিমাদ্রি গেছলো পল্‌তায়।

—হ্যাঁ—খেঁদি ফিরিয়া শচীর দিকে তাকাইল।

শচী কহিল—তা, আমি যদি হিমাদ্রি হতুম? আর তুমি হতে নীলিমা?

এবার খেঁদির রাঙ্গা মুখ আরও রাঙ্গিয়া উঠিল। সে কহিল—যাঃ, অসভ্য কোথাকার—

শচী কহিল,—তা, পশ্চিমী খোট্টা আর সভ্য হয়ে থাকে কবে! বলিয়া সে থামিল। পরক্ষণে কহিল,—আজ কলকাতায় যাবো—গিয়ে যা করবো—দেখো তখন—

খেঁদি কহিল,—কি?

শচী কহিল,—সে আমি বলবো না—তখন দেখো—

খাওয়া-দাওয়ার পর শচী কলিকাতায় গেল। মামার বাড়ী; বলিয়া গেল,—পারি তো ওবেলায় আসবো, নয়, কাল সকালে।—মামার বাড়ীতে আসিয়া সে চুপি চুপি ছোট মামীকে ডাকিল,—ছোট মামী—

ছোট মামীর সঙ্গে শচীর ভারী ভাব। ছোট মামী তাহারই প্রায় সমবয়সী; সম্পর্কে মামী হইলেও বন্ধু। ছোট মামী তাকে নাম ধরিয়া ডাকেন না। এক ভাসুরের নাম শশী, আর এক মামা-শ্বশুর আছেন, তাঁর নাম হাবু। মামারা হাল ফ্যাশনের হইলেও ছোট মামীর বাবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, ভারী আচারনিষ্ঠ। ছোট মামী সেই বাড়ীর মেয়ে, কাযেই শচীকে শচী বলিয়া ডাকিতে পারেন না, শচীর সঙ্গে শশীর মিল আছে! আর হাবুল বলা তো চলেই না,—বাঙ্গালী বউয়ের কাছে মামা-শ্বশুরের মত অস্পৃশ্য ভয়ঙ্কর জীব দুনিয়ায় নাই! ছোট মামী শচীকে ডাকেন, বড়-ভাগনে বলিয়া।

ছোট মামী বলিলেন,—কি ভাই, বড়-ভাগ্নে।

দৃষ্য হইলেও এ ভাই-সম্বোধন চলে। সকলে খুব পরিহাস করে, তবু এই ভাবেই এ ডাক চলিয়া আসিতেছে!

শচী কহিল,—আমার বিয়ের সম্বন্ধ করতে পারো?

ছোট মামী অবাক্! কহিলেন—বিয়ে করবে? তুমি? তা হ'লে সকলে বাঁচে!

বিবাহে শচীর দারুণ অনিচ্ছা ছিল। সেই শচী—নিজের মুখে বলে, বিবাহ করিবে। ছোট মামী ভাবিলেন বিবাহের এ কথা সকলকে জানাইয়া দেন!

শচী কহিল—কিন্তু ভারী কৌশলে, ভারী চুপি-চুপি ব্যবস্থা করতে হবে।

ছোট মামী কহিলেন,—করবো—বলো, কি করতে হবে ?

শচী কহিল,—কাঁঠালপাড়ায়, পার্ব্বতী কাকাবাবুর মেয়ে—আহা, তারা এখন গরিব—মেয়েও ডাগর হয়েছে। তা তুমি এক কায করো—বঙ্কিমবাবুর বাড়ী দেখবে. বলেছিলে না ? চলো আমার সঙ্গে—তার পর মেয়ে দেখবে ঐ ছলে গিয়ে। মেয়ে দেখে পছন্দ ক'রে মাকে চিঠি লিখবে, আর ওদের কাছেও কথাটা ফেলবে। কিন্তু ভারী হুঁশিয়ার! আমি যে কিছু বলেছি, তা যেন প্রকাশ না হয়!—আমি খুব না-না করবো, তুমি জোর দেখাবে—

ছোট মামী হাসিলেন. হাসিয়া কহিলেন,—মেয়ের কি নাম।

—এর মধ্যে নাম নিয়ে কি হবে ?

তবু শুনিই না! তোমার বিয়েতে আমি পদ্য লিখবো কিন্তু—আর তুমি খুব ভালো ক'রে সে পদ্য ছাপিয়ে দেবে।

—মেয়ের নাম মাধুরী।

ছোট মামী কহিলেন,—তাই তুমি ক'দিন সেখানে প'ড়ে ছিলে ? এ্যাঁ—

শচী কহিল,—সে জন্যে নয়। সেখানে গিয়ে দেখি কাকিমার বাত, পার্ব্বতী কাকাবাবুর জ্বর—ইনফ্লুঞ্জা।

ছোট মামী কহিলেন— আর নায়িকা মাধুরী দেবী ?

শচী কহিল,—সত্যি, তা নয়—এ কথাটা আজ মনে হলো প্রথম। সে যখন মাছ ভাজছিল, আমি তখন গল্প পড়ছিলুম। গল্পটা পড়তে পড়তে কেমন মনে হলো—

—গল্প প'ড়ে প্রেম! হাসালে, বড় ভাগনে। ছোট মামী হাসিতে লাগিলেন।

শচী কহিল,—না, সত্যি, হাসি নয়। কালই চলো তুমি বঙ্কিমবাবুর বাড়ী দেখতে। ছোট মামার ক্যামেরাটাও সঙ্গে নেবো—

ছোট মামী কহিলেন,—কার ফটো নেবে? বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর? না মাধুরী দেবীর?

হাসিয়া শচী বলিল,—তা, ছুটি বস্তুই ক্যামেরায় তোলবার যোগ্য! কেমন রাজী?

ছোট মামী কহিলেন,—আচ্ছা। তোমার ছোট মামাকে রাজী করাই। তিনিও যদি যেতে চান—

শচী কহিল,—বয়ে গেছে তাঁর! ও সব সহুরে বাবু—ওঁরা যাবেন পাড়াগাঁয়ে? কখনো না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—

তিন চার দিন পরেই পাটনা হইতে মা'র চিঠি আসিল। মা লিখিয়াছেন,—

তোর ক্ষমতা আছে ছোট বৌ,—আমরা ছেলেকে রাজী করাতে পারিনি—তুই পেরেছিস্। এতে ভারী খুশী হয়েছি। আশীর্ব্বাদ করি, কোলে যেন শীগ্‌গির একটি রাঙ্গা টুক্‌টুকে খোকা দেখি!

উনি বলছিলেন, পূজার বন্ধে আমরা সকলে কলকাতায় যাবো। সেই সময় সব কথা পাকা ক'রে ফেলা যাবে। অঘ্রাণের আগে আর তোমার বড়-ভাগ্‌নের জন্য বিয়ের দিন পাঁজিওলারা লিখছে না। কাযেই তোমার খুশী হওয়ায় একটু দেরী পড়বে।

পার্ব্বতী বাবুর মেয়ের সম্বন্ধ এঁর খুবই মনের মতন হয়েছে। উনি তাঁকে নিজের ভাইয়ের মত দেখেন। আর তা হ'লে ছেলেকেও কারবার করতে স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দেওয়া যায়। মানী লোক, তাঁকে সাহায্য করতে আমাদের খুবই ইচ্ছা। তবে পাছে তিনি কিছু ভাবেন, এ জন্য কিছু বলা যায়নি। উনি বলছিলেন, তাঁর মেয়ের বিয়ের

কথা ওঁর মনে দিবারাত্রি জাগছিল, কিন্তু সাহস ক'রে সে কথা পাড়তে পারতেন না। অর্থাৎ তাঁর মেয়ের বিয়ের সাহায্য করার কথা মুখে আন্‌তে পারতেন না। উনি বললেন, ছোট-বৌ সব দিক দিয়ে আমার উপকার করলেন, তাঁকে খুব ভালো ঘট্‌কালী দেবো—

চিঠি পড়িয়া সকালের ট্রেণই শচী কাঁঠালপাড়ায় ছুটিল। কাকিমা কহিলেন,—তোমার বাবার চিঠি এসেছে—খেঁদির সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা—

শচীনাথ যেন শুনিতে পাইল না! তার ভারী লজ্জা হইতেছিল। তার হাতে ছিল একগাদা বই, সাবান, এসেন্স আর পিছনে কুলীর মাথায় একটা গ্রামাফোন আর একরাশ রেকর্ড। সেগুলা নামাইয়া কুলীকে পয়সা দিয়া সে কহিল,—কাকাবাবু কোথায় ?

কাকিমা কহিলেন—ভাটপাড়ায় গেছেন কোন্ দিনটায় দুজনের নক্ষত্র ভালো—তাই পাঁজি দেখাতে। তোমার বাবা তোমার রাশিচক্র অবধি পাঠিয়ে দেছেন কি না—

কাকিমা চলিয়া গেলেন। পাশের ঘরের দ্বারের ফাঁকে একজোড়া চোখ দেখা গেল—পা টিপিয়া শচী দোরের কাছে গেল ও হাত বাড়াইয়া খেঁদির নাকটা নাড়িয়া দিল, কহিল,—তোমার জিনিষ—সাবান এসেন্স আর ঐ গ্রামাফোন প্রাইজ। আমি পালাই। বিয়ের আগে আর বোধ হয় দেখা হবে না। লজ্জা করছে—

খেঁদির চোখে-মুখে হাসির কি ঝিলিক! সে কোন কথা কহিল না, দ্বারটা ভেজাইয়া দিল। তার পর যখন আবার দ্বার খুলিল, শচী তখন চলিয়া গিয়াছে।

প্রাইজ পড়িয়া রহিল, খেঁদি দ্বারের কবাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া—দৃষ্টি আকাশের দিকে—

ঘর-ছাড়া মেয়ে

১

সতীশ একা। সংসারে তার আপন-জন কেহ নাই। দুনিয়ার বুকে স্বচ্ছ-গতিতে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন দায় নাই, কাজেই চিন্তার সে কোন ধারই ধারে না।

কলিকাতার এক কলেজে সে প্রোফেসরি করে; থাকে এক সৌখীন ভদ্র মেশে; ছেলেদের সকল কাজে সহায় হইয়া তাদের পাশে গিয়া দাঁড়ায়। মনটুকু উদার, সরল। মুখে-চোখে তার সরলতার দীপ্তি ফুটিয়া আছে। বাহিরের লোকের চোখেও সে সারল্য অগোচর থাকে না। সাধিয়া তার সঙ্গে পাঁচ জনে আলাপ করে, এবং আলাপ করিয়া খুসী হয়।

পূজার বন্ধে সতীশ সেবার লম্বা পাড়ি দিয়া কাশ্মীরে ছুটিল। হাউস-বোটে একা থাকিয়া অনর্থক কতকগুলো অপব্যয়ে ফল কি। কাজেই সে গিয়া উঠিল, শ্রীনগরের ফার্ষ্ট ব্রিজের কাছে, বেঙ্গল হোটেলে। হোটেলটি দোতলা।

দেখিতে দেখিতে হোটেলে ভিড় জমিয়া গেল। পাঁচ-সাত জন বাঙালী আরো ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। সকলের প্রাণই স্ফূর্ত্তিতে ভরপূর। বয়স বিবিধ হইলেও আমোদে কারো বীতরাগ নাই।

সকালে চা পান করিয়া সতীশ একটা শিকারা লয় এবং শিকারায় চড়িয়া ঝিলাম বহিয়া লেকে আসিয়া বেড়ায়। পাশাপাশি বহু হাউস-বোটে ইংরাজ-বাঙালী পাঞ্জাবী-ভাটিয়া...বহু জাতী নর-নারীর

আনন্দ-কলরবের পরশ লইয়া সে হোটেলে ফেরে ; ফিরিয়া অনেক কথা ভাবিতে বসে।

এই সবুজ শ্যামল বনানী-কুঞ্জ, ঐ স্বচ্ছ জলের বুকে আনন্দ বিহার ঐ পাহাড়ের কোলে-কোলে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, শালিমার-বাগে আর নিশাৎবাগে ফুলের অফুরান বর্ণ-বৈচিত্র্য প্রাণ তার নিঃসঙ্গতার চাপে হা-হা করিতে থাকে। এমন আবহাওয়া একলা ঘুরিয়া বেড়ানো, শোভা-সৌন্দর্য্যে মশগুল বেপরোয়া হইয়া—সে আনন্দের কথা কাহাকে বলিবে, ভাবিয়া নিশ্বাসের বোঝা তার বুকে একবার ভারী পাথরের মত চাপিয়া বসে! শিকারায় বেড়াইতে গিয়া চোখের সাম্‌নে কাশ্মীরী রূপসীর যৌবনের রঙীন ছবি ফুটিয়া ওঠে···স্বাস্থ্য-পরিপূর্ণ আঙুরের মত নিটোল অবয়ব, পাকা আপেলের রঙ প্রাণে তার এমন স্বপ্নজাল বিছাইয়া দেয় যে তার কেতাবে ঢাকা মন চারিদিকে উতলা হইয়া সন্ধান করে, কোথায় গো, কোথায় আছ আমার চিরপ্রিয়া মানসী বঁধু···?

নিত্যকার মত সেদিনও সকালে সে শিকারায় বাহির হইয়াছিল। ফিরিবার মুখে বর্ব্বরশা মহল্লার নীচে চেনার-নালায় একটা হাউস-বোটে সে এক অপরূপ ছবি দেখিল। ছোট্ট বোট। তার ছাদে বেতের একখানি চেয়ারে বসিয়া এক রূপসী তরুণী একান্ত নিবিষ্ট মনে কি একখানা বই পড়িতেছেন। তরুণী বাঙালী। বোটে আর কোনো বাঙালীর চিহ্নমাত্র নাই। রান্না-বোটে কাশ্মীরী ভৃত্য মশলা পিষিতেছে, আর তার পত্নী একরাশ লঙ্কা ছেচিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতেছে। তরুণীর পরণে একখানি খদ্দরের শাড়ী। শাড়ীর সবুজ পাড়। সেই খদ্দরেই তরুণীর রূপ যা খুলিয়াছে যেন জলের বুকে সদ্য-ফোটা একটি লাল পদ্ম। বোটখানির নাম নিকুঞ্জ।

শিকারা তাকে বহিয়া চেনার-নালা অতিক্রম করিয়া ঝিলামে পড়িল ; নিকুঞ্জ-বোট কোথায় আড়ালে মিশাইল, কিন্তু নিকুঞ্জবাসিনী তরুণীর রূপের ছায়া চোখে তার জাগিয়া রহিল।

দুপুর বেলায় সতীশ বাহির হইয়া পড়িল—একখানা মোটর ভাড়া করিয়া সোজা নিশংবাগে। সহর ছাড়াইয়া, পাহাড়ের কোল দিয়া গাড়ী চলিয়াছে—ঐ অদূরে পাহাড়ের বুকে পরী-মহল। পাহাড়ের গায়ে রঙিন ফুলের রাশি—যেন পরীদের চরণ-পাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঁ দিকে ডল-লেকের স্বচ্ছ জল, জলের বুকে রাশি রাশি পদ্ম! আর যতদূর দৃষ্টি চলে, চক্রাকারে পাহাড়ের শ্রেণী।

নিশতে আসিয়া এক পুষ্প-কুঞ্জে সে বসিয়া পড়িল। নানাবর্ণের রাশি-রাশি ক্রীশানথিমাম্। অদূরে ফোয়ারায় শতধারে জলের খেলা... একজন কাশ্মীরী আসিয়া সামনে ডালি ধরিল ; ডালিতে একরাশ নাশপাতি, আপেল, আখরোট, বাদাম,...

সতীশ কটা ফল লইয়া তাকে একটা টাকা বখশিস দিল। তারপর সবুজ ঘাসের শয্যায় শুইয়া পড়িয়া মনকে ভাসাইয়া দিল, অতীতের কাল-সাগরে তরঙ্গ-রাশির মুখে ..

জাহাঙ্গীর বাদশার উৎসব চলিয়াছে যেন এই নিশতে! ফুলের এই বর্ণ-বৈচিত্র্যের মাঝখানে রূপসী তরুণীদের রূপে বেশে তেমনি বৈচিত্র্য...নাচ চলিয়াছে, গান চলিয়াছে। বাদশার সঙ্গে তরুণীদের কত সে খেল,। সার্থক জন্ম হইয়াছিল। বাদশাহীর চূড়ান্ত... জীবনটাকে চারিদিক্ দিয়া উপভোগ করিয়াছে! মনকে কোনদিকে পিপাসু রাখে নাই। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, কুচক্রীর কত দুরভিসন্ধি, কত ষড়্যন্ত্র—অস্ত্রপাশে সতেজে সে-সব যেমন ছিন্ন করিয়াছে, রূপের উৎসবেও তেমনি একেবারে সমস্ত শরীর-মন ঢালিয়া দিয়াছে!

এখানকার আকাশে-বাতাসে আজো যেন সে উৎসবের রেশ লাগিয়া আছে। সেই মোহ, সেই বিভ্রম।

সতীশ উঠিয়া পড়িল। এ মোহ-বিভ্রমে গা ঢালিয়া কোন লাভ নাই। মাঝে হইতে অতৃপ্তির ঝাঁজে সারা মন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে।

এধার ওধারে ঘুরিয়া সে ফটকের দিকে চলিল। মোটর দাঁড়াইয়া আছে। সতীশ উঠিল। পাশেই আর একখানা মোটর। সতীশের মোটর কিছুতে ষ্টার্ট হয় না ওদিকে সন্ধ্যা নামিতেছে।

সতীশ কহিল—কেয়া হুয়া ?

ড্রাইভার কহিল—আবি চলে গা, শেঠ-সাব।

পাশের মোটরখানা সহসা ষ্টার্ট হইল। সে-শব্দে সতীশ চাহিয়া দেখে, ও মোটরে বসিয়া...সেই তরুণী! একা! পরণে সেই খদ্দরের শাড়ী। সতীশের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে চোখ ফিরাইল। তার পর ভাল করিয়া আবার দেখিবে ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিতেই পাশের গাড়ীখানা নক্ষত্রের বেগে চলিয়া গেল। সতীশের পাঞ্জাবী ড্রাইভার তখনো প্রাণপণে ষ্টার্ট-হ্যাণ্ডেল ঘুরাইতেছে।

২

পরদিন সকালে শিকারায় চড়িয়া আবার সেই চেনার-নালায়। ঐ সে নিকুঞ্জ বোট। আশ্চর্য্য। তরুণী ঠিক সেই বেতের চেয়ারে বসিয়া বই লইয়া তেমনি তন্ময়!...

সতীশ ভবিল, একবার আলাপ করিব না কি ? একট ছোট প্রশ্ন,—ওখানা কি বই ? কথাটা মনে উদয় হইবা মাত্র তার বুক

টিপ্-টিপ্ করিয়া উঠিল। শিকারা সে দিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। সতীশ ভাবিল, আঃ, ভাগ্যে প্রশ্ন করি নাই। কি বেকুবিই হইত! শুধু বেকুবি নয়, স্পর্দ্ধাও! ছি!

কিন্তু এ তরুণী এমন একা কেন? কালও এমনি একা ছিলেন। আজও কৈ, বোটে আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই। নিশতে গিয়াছিলেন, তাও একা! বাঙালী নয়, বোধ হয়। তাই হইবে। বাঙালীর মেয়ে এ-বয়সে একা বাহির হইয়াছেন, এমন তো তার চোখে পড়ে নাই কখনো—কোথাও না!

বাঙালী নন্, এ-চিন্তায় মন কিন্তু হায়-হায় করিল।

সেদিন বৈকালের দিকে পায়ে হাঁটিয়া ঝিলামের তীর ধরিয়া সে আসিল শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে। একবার পাহাড়ের দিকে চাহিল। বহু লোক...নর-নারী, বালক-বালিকা...কেহ পাহাড়ে চড়িতেছে, কেহ-বা নামিতেছে। ইংরাজ, বাঙালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী...নানা দেশের লোক।

সতীশও পাহাড়ে চড়িল। পথ ঘুরিয়া উপরে উঠিয়াছে...জুতা পিছলাইয়া যায়, বুকে হাঁফ্ ধরে! সতীশ জুতা-জোড়া খুলিয়া হাতে লইল; তার পর ওঠা স্বরু করিল। একট বাঁকের মুখে—সেই তরুণী! পরণে আজ কম্‌লা রঙের খদ্দরের শাড়ী—কিন্তু তেমনি একা।

সতীশ থমকিয়া দাঁড়াইল, দু'জনে চোখাচোখি হইল, নিমেষের জন্য! তরুণী চলিয়া গেল, সতীশ পাথরের মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া রহিল।

পাহাড়ে চড়িবার যে-বাসনা মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, চকিতে তা মিলাইয়া গেল। সতীশ ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল, যদি দেখা হয়—একটা প্রশ্ন করিবে।

কি প্রশ্ন? ঠিক! বলিবে,—উপরে কি আছে? কেমন দেখিলেন?

যদি বলেন, নিজে গিয়ে ছাখো না বাপু? তাহা হইলে সতীশ বলিবে, হাঁপাইয়া পড়িয়াছি, উঠিতে পারিলাম না!

পরাজয়? তিনি যা পারিলেন, আমি তা··· ?

তা হোক। ঐ রূপসীর কাছে পরাজয় মানিয়া যদি তাঁহার মনে একটু গৌরব, একটু আনন্দ দিতে পারি···তাছাড়া এ-বয়সে তরুণীর কাছে পরাজয় মানায় কি যে আরাম!

কিন্তু পাহাড়ের নীচে পথে আসিয়া কোথাও তরুণীর আর দেখা মিলিল না। সতীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বড় বড় চেনার গাছগুলা স্তম্ভিত নেত্রে সারি দিয়া পথে দাঁড়াইয়া আছ, দু-চার খানা টাঙ্গা ছুটিয়া চলিয়াছে···তার মধ্যে তরুণী কোথায় লুকাইল?

ধীরে ধীরে সে বেঙ্গল হোটেলের দিকে ফিরিল। উনি বাঙ্গালী না পাঞ্জাবী সে পরিচয়টুকুও মিলিল না!

কিন্তু কেন? যদি বাঙালীই হন্, তাহাতে তার কি? কিছু নয়, তবু—

যৌবনের অন্ধ মায়া! মন কেমন আপনা হইতে তাহারি পাশে একটু ঠাঁই কামনা করিতেছে! দুটো কথা শুধু···একটু আলাপ! তার বেশী? না। সেও এই ভূস্বর্গে একা নিঃসঙ্গ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে... ···উনিও বুঝি তেমনি একা...এই শোভা—সৌন্দর্য্যের মাঝে...

পরের দিন সকালে সতীশ বেড়াইতে বাহির হইতেছে, হঠাৎ হোটেলের দ্বারে সেই তরুণী! আনন্দে উত্তেজনায় সতীশের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তরুণী মৃদু হাসিয়া ইংরাজীতে প্রশ্ন করিলেন—এটা বেঙ্গল হোটেল?

সতীশ কহিল—হাঁ। তারপর অত্যন্ত বিনয়ের ভঙ্গিতে কহিল—আমি যদি কোন সাহায্য—

তরুণী মৃদু হাসিলেন; তারপর সতীশের মুখে সমগ্র দৃষ্টিটুকু ন্যস্ত করিয়া কহিলেন,—আপনার সঙ্গে কাল দেখা হ'ল, না—শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে ?…

তবে লক্ষ্য করিয়াছেন!…আঃ! সতীশ কহিল,—হাঁ আপনি… ?

তরুণী কহিলেন—বাঙালি কি না, জান্‌তে চাইছেন! আমি বাঙালী।

সতীশ কহিল—আমিও বাঙালী।

তরুণী কহিল—তবে বাঙলাতেই কথা হতে পারে তো…আমি আসচি, এ হোটেলে যদি একটা ঘর পাই, তার খোঁজে।

সতীশ কহিল,—আসুন। আমি ম্যানেজারকে ডেকে দি। আপনি আমার ঘরে বসবেন'খন।

সতীশ তরুণীকে সঙ্গে করিয়া নিজের কামরার দ্বার খুলিয়া কামরায় বসাইল। তরুণী কহিলেন—আমি চেনার-নালায় বোটে ছিলুম। দু'দিন উপরি-উপরি চুরি হ'ল। এমন কিছু দামী জিনিষ নয়, অবশ্য! তবু এ-ভাবে আর দু'একদিন চুরি চল্‌লে আমায় এ বিদেশে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়তে হবে। একা জলে বাস করা… বিদেশীদের সঙ্গে ঠিক নয়। তার চেয়ে ডাঙ্গায় বাসা নেওয়া বোধ হয় ভাল।

সতীশের বুকটা ধড়াশ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—তা এ বাড়ীতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন আপনি। ওই তেতালায় একখানি ঘর আছে। আমরাও দেখতে শুনতে পারবো'খন।

তরুণী কহিলেন—তা হলে ম্যানেজারের সঙ্গে একবার দেখা… ঐ তেতলায় ঘরটা যদি পছন্দ হয়… ? মানে, আমি একটু নিরালা থাকতে চাই…

সতীশ ছুটিল ম্যানেজারকে ডাকিতে। তরুণী তার ছোট ঘরখানি দেখিতে লাগিলেন। জান্‌লা দিয়ে ওই দূরে ঝিলামের ওপারে লাল-মুণ্ডি দেখা যাইতেছে। একেবারে পাহাড়ের বুকের উপর। সুইজারল্যাণ্ডের বহু ছবি তিনি দেখিয়াছেন—ঠিক তেমনি! না জানি, সুইজারল্যাণ্ড কেমন দেশ, কখনও চক্ষে দেখা ঘটিবে কি না! তবু সে ছবি দেখিয়াছেন তো! তার পাশে কাশ্মীরের ঐ পর্ব্বত মালা, এই নদী, তুষারাচ্ছন্ন দিক্‌ভূমি…এ যে কোথাও খাটো হইতে পারে, এমন মনে হয় না!

খোলা জানলার মধ্য দিয়া ঐ…ও মেঘ, না,, পাহাড় ? জানলার নীচেই একটা টেবিল। টেবিলের উপর কতকগুলা বই,—ব্রাউনিংয়ের কাব্য, সেক্সপীয়রের নাটক, রোমা রোলার জীন্ ক্রীষ্টোফার চার খণ্ড, একখানা প্যাড। প্যাডটা খোলা। বাংলা ক' ছত্র কি লেখা। তরুণীর কৌতূহল হইল! অন্যায়…তবু কৌতূহলের সীমা নাই! লোকটি ভারী ভদ্র, অমায়িক, বিনয়ী। যদি তাঁর মনের কোন পরিচয়… ? ঝুঁকিয়া তরুণী দেখিলেন, লেখা আছে,—

কাশ্মীরী রূপসীর কাছে বাঙালী রূপসী কেন দাঁড়াতে পারবে না ? এই তো পাশাপাশি দেখলুম। কাশ্মীরী রূপসীর রং ফুলের মত… হয়তো সে রূপে জেল্লা বেশী! কিন্তু বাঙালী রূপসীর রূপ সজীব। কাশ্মীরী রূপসীর ওই রূপই যা! সে রূপে অন্তরের ছায়া পড়ে না! আর ঐ একাকিনী তরুণী ? খদ্দরে কি চমৎকার মানিয়েচে! স্রেফ সাদা মোটা খদ্দর! কালিদাসের কথা ভারি সত্য। কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনম্‌নাকৃতীনাম্। আমি অকুতোভয়ে বল্‌তে পারি, বাঙালী

তরুণীর স্নিগ্ধ রূপ-জ্যোতি কাশ্মীরী রূপকে ম্লান নিষ্প্রভ করে দিতে পারে। কালই শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে গোধূলির আভায় রূপের যে বিকাশ দেখেছি ..

এই অবধি! তরুণী দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া জানালার পানে চাহিলেন—এ কি তাঁকে ইঙ্গিত? হাঁ, তাই। শঙ্করাচার্য্য পাহাড়, গোধূলির আভা—এগুলা হুবহু মিলিয়া যাইতেছে।

তরুণী কম্পিত পায়ে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁর মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। লজ্জার সে ছবি সামনের আয়নায় দেখিয়া তিনি ভারি অপ্রতিভ হইলেন।

সতীশ ফিরিল; সঙ্গে ম্যানেজার। কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। ঘর পছন্দই, বন্দোবস্ত মন্দ নয়, খরচও অল্প। তরুণী কহিলেন—আজই খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি আস্‌চি। তা হলে কত টাকা দেবো আপাততঃ?

ম্যানেজার কহিল—দশ পন্‌র রুপেয়া। আপ্‌কা নাম?

সতীশ উদ্‌গ্রীব চিত্তে তরুণীর পানে চাহিয়া; তরুণী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন,—পি, চ্যাটার্জ্জী।

ম্যানেজার কহিল—মিস্, না··· ?

তরুণী কহিলেন—মিস্।

ম্যানেজার পনেরো টাকা লইয়া রসিদ দিল। তরুণী মৃদু হাসিয়া সতীশের পানে চাহিয়া কহিলেন,—আপনার ভরসাতেই আসচি। আপনাকে হয়তো খুব বিরক্ত করবো।

সতীশ কহিল,—কিছু না, কিছু না। আমি যদি আপনার কোন কাজে লাগতে পারি, তাহলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।

তরুণী হাসিলেন। সে হাসি সতীশের কাছে যেন রাজার সিংহাসন! তরুণী কহিলেন—বেলা দুটো নাগাদ আসবো। আপনি তখন বেরুবেন না কি?

সতীশ কহিল,—না।

তরুণী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন। সতীশ সেইখানেই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৩

সেদিন আর সতীশের বাহিরে বেড়াইতে যাওয়া ঘটিল না। মিস্ চ্যাটার্জ্জী আসিতেছেন।

তরুণী আসিলেন। মোট-ঘাট সামান্য। একটা হোল্ড অল্, একটা ট্রাঙ্ক, আর খুচরো দুটা বেতের বাক্স। সতীশ তাঁর সঙ্গে তেতলার ঘরে গিয়া উঠিল। নেওয়ারের খাট পাতা ছিল। হোল্ড অল্ খুলিয়া একটা তোষক ও দুইটা বালিশ বাহির করিয়া তরুণী খাটে শয্যা বিছাইলেন, তারপর ছোট টেবিলে আয়না, চিরুণী, টয়লেট্-সেট রাখিলেন, এবং একখানা বই।

তরুণী কহিলেন—বসুন···না, বেরুবেন এখনি?

সতীশ কহিল—বেরুবো না এখন।

তরুণী কহিলেন—বিকেলে বেরুবেন বুঝি?

সতীশ কহিল—হাঁ।

তরুণী কহিলেন,—কোথায়? কোন্দিকে যাবেন আজ? কাল শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে উঠেছিলেন?

সতীশ কহিল—না। ওঠা হয় নি। ভারী গড়ানে, পা পিছলে যায়।

হাসিয়া তরুণী কহিলেন – ওঠার ইচ্ছা আছে!

আনন্দে সতীশের অন্তর ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—তা আছে। তবে একা···তেমন আমোদ বোধ হয় না।

তরুণী কহিলেন—ঠিক তাই। আমি কাল উঠেছিলুম, তবে ঐ ওঠাই সার। চরিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম, এমন সুন্দর! ঝিলাম নদী একে-বেঁকে চলেছে যেন শালের পাড়! শুনেছি, ওরই আদর্শে এখানকার শালের পাড় বোনা হয়েছে। ভাল জিনিষ একা দেখে সুখ হয় না তেমন! মানুষের সামাজিকতার এ এক অকাট্য প্রমাণ! তা, যাবেন আজ? চলুন না।

আঃ, তাই! সতীশ কহিল,—বেশ তো।

বৈকালে শঙ্কারাচার্য্য পাহাড়ে ওঠা হইল। কত গল্প হইল··· জল আর ফুল! ফুল আর জল! ফুলের এমন প্রাচুর্য্য আর কোথাও নাই। জলেরও তেমনি অজস্রতা!

তরুণী প্রশ্ন করিলেন—আপনি কলকাতা থেকে আসচেন?

সতীশ কহিল—হাঁ।

তরুণী কহিলেন—এখানে ফুলের রঙের বৈচিত্র্যটুকু লক্ষ্য করেচেন? হরেক রকমের শেড্...তা ছাড়া এত রকমের নতুন নতুন ফুল। তাদের নামও তেমনি।

সেদিন একটি ফুল দেখলুম—যেন একটী কনে বৌ ঘোমটায় মুখ ঢেকে আছে! ফুলের উপর একটা পাপড়ি পড়ে এমন ভাবে তাকে ঢেকে রেখেচে···একটী ফুলেই যে হঠাৎ এমন কাণ্ড ঘটেচে, তা নয়। ও-জাতের সব ফুলগুলিই অমনি! ফুলের নাম জিজ্ঞাসা করিতে শুনলুম স্নুঁষা। বোধ হয় সংস্কৃত স্নুষা থেকে ঐ নাম! তা সংস্কৃত স্নুষার মানে তো পুত্রবধু! আমি হেসে বল্লুম, এ

ফুলের বাঙলা নাম আমি দিলুম, কনে-বৌ। চমৎকার ফুল। এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমায় সে ফুল দেখালেন। ওই রয়েল হর্টিকাল্‌চারাল পার্কে সে ফুল দেখবেন।

ফুল সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। তার পর ফল! তরুণী কহিলেন,—আচ্ছা, নাক্‌গুলো কি, বলুন তো? নাশপাতিকে এরা বলে নাক্। কি চমৎকার! যেমন মিষ্টি, তেমনি রসালো—ক্ষিদে তেষ্টা দুই ঘোচে। এখানকার এ তাজা নাশপাতি খেয়ে ওদিককার নাশপাতি আর মুখেও রুচবে না।···আখরোটগুলো? দুটী আঙুলে টিপুন, ফট্ ক'রে-ভেঙ্গে যাবে। আর শাঁস? কি স্বাদু। তেলা গন্ধ মোটে নেই।

এই সব কথাবার্ত্তায় সতীশ আড়ষ্টভাবে যোগ দিতেছিল। নিজে হইতে তরুণীকে এটুকু জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—কেন তিনি একা এখানে আসিয়াছেন? কোথায় ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন কে আছে? ইত্যাদি। তা কোন প্রশ্নই মুখে ফুটিল না।

পাহাড় হইতে নামিবার সময় তার পা এক জায়গায় পিছলাইয়া গেল। ভাগ্যে তরুণী খপ করিয়া হাতখানা ধরিয়া ফেলিলেন! নহিলে···

হাসিয়া তরুণী কহিলেন,—যে কথা বলেছিলেন, পা পিছলে যায়? দেখবেন, অন্যমনস্ক হয়ে নামবেন না, ভারী হুঁশিয়ার...

ঠিক! সে অন্যমনস্ক হইয়াছিল! এই তরুণীর কথাই তাকে দুনিয়ার আর সব কথা ভুলাইয়া দিয়াছে! সে লজ্জিত হইল।

৪

সকালে সতীশের বেড়ানো এক রকম বন্ধ হইয়া গেল। সকাল বেলাটা তরুণীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একটু আধটু তদ্বির করিতেই কাটে। সতীশ সেজন্য অ-খুসী নয়।

তবে বেঙ্গল হোটেলে আরও যে পাঁচ-ছজন বাঙালী আসিয়া আস্তানা পাতিয়াছিলেন, তাঁদের মধ্যে সহসা একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। নদীর শান্ত জলে ষ্টীমার চলিলে যেমন তরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়া ওঠে, এই বাঙালী গুলির মনে তরুণী ঠিক তেমনি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিলেন! তাঁরা সতীশকে লক্ষ্য করিয়া আত্মগতভাবে বহু আলোচনা করেন, বলেন,—Lucky ছোকরা!...

বেলা এগারোটা-বারোটার সময় তরুণী একটা টঙ্গায় করিয়া কোথায় চলিয়া যান্, তার পর ফিরিয়া আসেন একেবারে বৈকালে পাঁচটায়। নিত্য এমন ঘটে। শুধু রবিবারটায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম।...

প্রায় দশদিন কাটিয়া গেল, সতীশের মন শুধু দোল খাইয়া চলে, অগ্রসর আর হইতে পারে না!

সেদিন একগাদা বাঙ্লা কাগজ-পত্র আসিল হোটেলের প্রমদাচরণ বাবুর নামে। দুপুর বেলায় তিনি একখানা কাগজ পড়িয়া আরো পাঁচজনকে ডাকিয়া দেখাইলেন। সকলে বিস্ফারিত নেত্রে মোটা হরফে ছাপা একটা বিজ্ঞাপনের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কাগজে ছাপা আছে—

আমার কন্যা কুমারী প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়, বয়স কুড়ি বছর, মাথায় সুদীর্ঘ ঘন কালো চুল, গড়ন একহারা ছিপছিপে চাঁপার মত রঙ, আজ একমাস হইল, প্রস্তাবিত বিবাহ-সম্বন্ধ

অমনোনীত হওয়ায়, কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। খদ্দর পরিতে ভাল বাসেন···রঙীন খদ্দরই তাঁর প্রিয়। দেশের দুঃখে দরদ তাঁর অত্যধিক, বহু সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিয়াছেন। পায়ে নীল রঙের নাগরাই ব্যবহার করেন। মহিলা-স্বাক্ষরে বহু বাঙ্‌লা মাসিকে দেশের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে তাঁর লেখা কয়েকটী প্রবন্ধও ছাপা হইয়াছে। যদি কেহ সন্ধান দিতে পারেন, কিংবা তাঁহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দেন, তাহা হইলে সেই সহৃদয় সুহৃৎকে প্রচুর পুরস্কারে আপ্যায়িত করিব। ইতি ৩রা আশ্বিন ১৩২৮

এন্, কে, চ্যাটার্জী, এ্যাড্‌ভোকেট,

৩৭ নং বীহাইভ্ রোড, এলাহাবাদ।

পুনশ্চ···মা প্রতিমা, তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় কোনো ব্যাঘাত ঘটিবে না। তুমি তোমার মনোমত পাত্রে আত্মদান করিয়ো। খদ্দর-পরা ত্যাগী দেশ-ব্রতী পাত্রকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

বাবা।

সংবাদটুকু পড়িয়া প্রমদাচরণ কহিলেন—এই মেয়েটিই প্রতিমা চ্যাটর্জী, নিশ্চয়। হোটেলের খাতায় মিস্ পি, চ্যাটার্জী।

কুলদা কহিল,—একহারা, ছিপছিপে গড়ন, ঘন কালো কোঁকড়া চুল, চাঁপার মত রঙ—হুবহু মিলে যাচ্ছে,...

হর্ষ কহিল,—আমি তো খদ্দর পরি, ক ছারিতে প্রাকটিশ ছেড়েচি নন্-কো-অপারেশনে ; অতএব...

প্রমদাচরণ কহিলেন—থামো, অত সুবিধের নয়। এরা তো মেয়ে নয়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ! রাগ করে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো অমনি একলাই। বলিহারি সাহস!

কুলদা কহিল—এ মেয়ের স্বামী যিনি হবেন, তাঁর বুকটা হবে লোহার ডাম্বেলের মত...কিছুতে মচ্ কাবে না, দমবে না! বাপ...

দক্ষিণা কহিল—খদ্দর সংগ্রহ করতে কতক্ষণ ?...

দক্ষিণা কহিল—তবে, দুষ্টু ঘোড়া চালানোতেই সওয়ারের আনন্দ...

যাদবেশ্বর কহিল—তোমার খদ্দরের সঙ্গে বিবাদ...কোনো আশা রেখো না।

প্রমদাচরণ কহিলেন—মেয়েটি কিন্তু হেঁয়ালি! আমাদের সঙ্গে মেশেন না ..

কুলদা কহিল,—শুধু মেশা! চোখের সামনে গিয়ে পড়ি যদি তো পাশ কাটিয়ে সরে যান্...

দক্ষিণা কহিল—যেন জানোয়ারেরও অধম আমরা...হর্ষ কহিল অথচ ঐ কলকাতার প্রোফেসর ছোকরা ..

প্রমদাচরণ কহিলেন—গ্যাখো, কাশ্মীর থেকে বুঝি...

হর্ষ কহিল,—প্রোফেসর কিন্তু খদ্দর পরে না। প্রতিমা চাটার্জী খদ্দর ভাল বাসেন। দেশব্রতী, ত্যাগী, খদ্দর-পরা পাত্র...শেষের লাইনটা দেখেচো ?

সকলে যুগপৎ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল—যেন সেখানে ঝড় বহিয়া গেল। নিশ্বাসের সে-ঝড়ে দু'খানা পোষ্ট কার্ডে লেখা চিঠি উড়িয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল।

হর্ষ কহিল, দেশই আমার স্বপ্ন, দেশই আমার ধর্ম্ম! আর এই খদ্দর?...আহা, কবে মলয়জ-শীতলা মা আমার খদ্দরে অঙ্গ ঢেকে আবার সুহাসিনী, সুভাষিণী হয়ে জাগবেন। হর্ষ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দক্ষিণা কহিল—অর্থাৎ বিবাহ করতে হলে একটু বেশী বয়সেই করা উচিত। আমরা কি জঘন্য ভাবেই না সংসার সুরু করি! সব চুকে-বুকেও গেল তাই! সইলো না।

কুলদা কহিল—বহু-বিবাহ পুরুষের পক্ষে দোষের নয়। পুরুষ মানুষের ছাতি কতখানি দরাজ! তাতে সারা দুনিয়াটাকে ঠাঁই দেওয়া যেতে পারে। দুজন স্ত্রী...সে আর এমন কি ভার?

প্রমদাচরণ কহিলেন তোমরা কি ঠাউরেচো, এই এ্যাডভোকেটের তরুণী কন্যাটি...

সকলে কোরাশে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। খবরের কাগজের সেই বিজ্ঞাপন চোখের সামনে জ্বল্-জ্বল্ করিয়া উঠিল। সকলের মনেই অভিসন্ধির মস্ত সূচনা···সঙ্গে সঙ্গে...!

এ-ধারে যখন এমনি কাণ্ড, ও-ধারে তখন নিজের ঘরে বসিয়া সতীশ খোলা জানালার মধ্য দিয়া আকাশ দেখিতেছিল। সূর্য্য আজ মেঘের আড়ালে ডুবিয়া গিয়াছে, অদূরে পাহাড়ের গায়ে ঝরা-নুনের মত তুষারের শুভ্র আবরণ। কন্‌কনে হাওয়া বহিতেছে। ওই পাহাড়ের আড়ালে কি আছে? ফলে-ফুলে ভরা শ্যামল উপত্যকা? না, কর্কশ বন্ধুর পাহাড়ের শ্রেণী? কিছুই বুঝা যায় না। সতীশের বুক ভারি হইয়া উঠিল, তার ভবিষ্যৎও অমনি। শুধুই পাহাড়ের পর পাহাড় উঠিয়াছে, তার মধ্য দিয়া পথ করিয়া যাওয়া বড় কঠিন!

৫

পরের দিন। বেলা ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। হোটেলের অপর জীবগুলি তাদের নিত্যকার কাজে বাহির হইয়াছে, অর্থাৎ কাশ্মীরী সৌন্দর্য্য নানা দিক্ দিয়া উপভোগ করিতে।

সতীশ একখানা বই খুলিয়া অলসভাবে বিছানায় পড়িয়াছিল। বইয়ের পাতাই চোখের সামনে খোলাই ছিল—মন সে-পথ ছাড়িয়া আকাশে প্রাসাদ রচনা করিতেছিল। হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিল, ডাকিল,—বেয়ারা ..

কাশ্মীরী বেয়ারা আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। সতীশ কহিল—গরম পানি···

ঠাণ্ডা দেশ। জল যেন বরফ। গরম জল ছাড়া পান চলে না, তা স্নান! বেয়ারা গরম জলের ব্যবস্থা করিতে গেল, সতীশ তেলের শিশি পাড়িল।

দোতলার সিঁড়ি ধরিয়া একতলায় নামিতে সামনেই স্নানের ঘর। সতীশ তেল মাখিয়া সিড়িতে আসিয়া দেখে, সে ঘরের দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। কে স্নান করিতে গিয়াছে। সিঁড়ির মুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

দু-চার মিনিট মাত্র। তার পরই কল-ঘরের দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন···দীর্ঘ কালো কেশ পিঠে ঝুলানো, কাঁধে তোয়ালে, সদ্য-স্নানসিক্ত-বসনা সেই তরুণী · যেন রূপের স্বচ্ছ হিল্লোল।

সে-মূর্ত্তির পানে চাহিয়া সতীশের চমক লাগিল। মনটা দেশ-কাল ছাড়িয়া নিমেষে পুরাণের যুগ বহিয়া একেবারে বিশ্বসৃষ্টির সেই প্রথম আদিম প্রভাতে গিয়া উপস্থিত হইল। সমুদ্র-মন্থনে যেন দেবী লক্ষ্মীর এ প্রথম উদয়! কিংবা, আঁধার বিশ্বে জ্যোতির্ম্ময়ী উষার প্রথম

আবির্ভাব! তার মনে হইল, সে যদি কবি কিংবা চিত্রকর হইত, তাহা হইলে এ ছবি কাগজে আঁকিয়া সারা দুনিয়াকে মাতাইয়া দিতে পারিত!

তরুণী মৃদু হাস্যে অভিবাদন জানাইলেন, কহিলেন,—এত তাড়াতাড়ি আজ স্নান করতে চলেছেন?

সতীশ কহিল—চুপ করে কেমন ভাল লাগছিল না।

তরুণী কহিলেন,—আজ আমারো কোন কাজ নেই...শালিমারে যাবেন, বেড়াতে? বেশ মেঘলা দিনও আছে।

সতীশের চিত্ত দুলিয়া উঠিল, কহিল,—যাবো।

তরুণী চলিয়া গেলেন, তারি পাশ দিয়া। তাঁর কেশের স্নিগ্ধ সুরভি, অঙ্গে সদ্য-মাখা সাবানের গন্ধ ..এক সুমধুর আবেশে সতীশের মন ভরিয়া উঠিল।

কলঘরে ঢুকিয়া সে দেখে, আধ-টব গরম জল রহিয়াছে, তরুণীর স্নানাবশিষ্ট। সে-জলে তাঁর মাথার দীর্ঘ দু গাছি কেশও ভাসিতেছে। সতীশ চোরের মত চারি ধারে চাহিল, তারপর সেই কেশ দু'গাছি তুলিয়া আনলায় ঝুলাইয়া দিল। এইটুকু স্মৃতি, সুরভি-স্নিগ্ধ...তার প্রাণের সহস্র কামনার প্রদীপে যেন এ আগুনের শিখা! আঃ!

বেয়ারা গরম জল আনিল। সতীশ কহিল,—এ পানি ফেলো না। এই পানির সঙ্গেই মিশিয়ে দাও।

বেয়ারা তাই করিয়া চলিয়া গেল। সতীশ দাঁড়াইয়া রহিল, স্তব্ধ নিস্পন্দ!

তার পর স্নান সারিয়া নিজের ঘরে আসিয়া সেই দু'গাছি কেশ সযত্নে সে একটা ফুলে জড়াইয়া জামার বুক-পকেটে রাখিল। তারপর দোতলার বারান্দায় আসিয়া বেতের চেয়ারে বসিল...মন একেবারে

শূন্য দৃষ্টি পথের পানে। টঙ্গায় চড়িয়া, মোটরে চড়িয়া কত লোক চলিয়াছে···তাছাড়া হাঁটিয়াও। পথে নর-নারীর কি ভিড়!

তেতলার ছাদে তরুণী চেয়ারে বসিয়া রৌদ্রে কেশের রাশি ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁর হাতে বই। রবিবাবুর গীতাঞ্জলি। বইখানি সতীশের; তিনি পড়িতে আনিয়াছেন। কতবার পড়া হইয়াছে; তবু গীতাঞ্জলির এমন মোহ...এ আর পুরানো হইবার নয়!

হর্ষ আসিয়া অত্যন্ত সবিনয়ে নমস্কার করিল।

তরুণী হাসিয়া কহিলেন, আসুন।

হর্ষ কহিল—এলাহাবাদের চেয়ে শ্রীনগর কি আপনার ঢের ভাল লাগচে না?

তরুণী সবিস্ময়ে কহিলেন,—এলাহাবাদ!

মুখে ম্লান হাসি ফুটাইয়া হর্ষ কহিল,—হ্যাঁ, এলাহাবাদ। আপনি তো এলাহাবাদ থেকেই আসচেন!

তরুণী কহিলেন কে বল্‌লে এ কথা?

হর্ষ কহিল—কারো বলবার দরকার নেই। আমি জানি। মানে, আপনার পরিচয় আমার অবিদিত নয়। বাঙলা মায়ের কোন্ মেয়ে এ-বয়সে দেশের জন্য আপনার মত এমন অকাতরে সুখৈশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিতে পেরেচেন?

তরুণী অত্যন্ত বিস্ময়ের দৃষ্টিতে হর্ষর পানে চাহিলেন। হর্ষর চোখে আনন্দ; এবং একটা সুগভীর অভিসন্ধিও না?

চোখের ভাষায় তরুণী এই বয়সেই কতকটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—ও সব কথা থাক্! কি প্রয়োজনে আপনি এসেচেন, জান্‌তে পারি?

হর্ষ হর্ষোৎফুল্ল ভাবে কহিল, তাই বলবো। দেখুন, খদ্দরেই যে একমাত্র দেশের মুক্তি, এ সত্য আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেচি। তবে দেশের লোকের চেতনা যে এ দিকে এখনো...

তরুণী কহিলেন—এ-সব কথা রোজই তো খপরের কাগজে, আর মাসিক-পত্রে পড়চি। তা...

হর্ষ বাধা দিয়া বলিল,—তা, আমার সঙ্কল্প ছিল, সংসারে আসক্ত না হয়ে ব্রহ্মচারীর নিষ্ঠা নিয়ে দেশের কাজে প্রাণ-মন ঢেলে দেবো। কিন্তু সম্প্রতি এক মস্ত সমস্যা দেখা যাচ্ছে এই যে, সকলেই যদি এমনি সঙ্কল্প করি, তাহলে দেশ উঠবে, মানি; কিন্তু আমাদের মৃত্যু হলে বংশে কেউ তো থাকবে না, অর্থাৎ সন্তান-সন্ততির অভাবে জাতিটাই লোপ পাবে যে! দেশের নর-নারী সকলেই যদি অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হন, তা হলে খদ্দরের শক্তিতে জাগ্রত সেই দেশে বাস করতে যে কেউ থাকবে না!

তরুণী কহিলেন—আমার কাছে এ সমস্যার কথা কেন তুলচেন! দেশের যাঁরা নেতা—

হর্ষ কহিল, মানে, আপনিও ব্রহ্মচারিণী, খদ্দর-ব্রত-ধারিণী কি না—তাই। অর্থাৎ আমাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে যদি দেশের কাজে —অর্থাৎ আমি স্থির করেচি, দেশ-সেবা যখন আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম সস্ত্রীক আচরণ করতে হবে, শাস্ত্রের এই অনুশাসন, তখন বিবাহ করাই উচিত। আমার তাই ইচ্ছা, আপনি যদি—

তরুণী ইঙ্গিতে অর্থ বুঝিলেন, বিরক্তভাবে কহিলেন,—আপনার ব্রহ্মচর্য্য তো খাশা! আমায় এ ভাবে অপমান করার সাহসও অদ্ভুত!

বেত্রাহতের মত হর্ষ নিমেষে মুষড়াইয়া গেল; অত্যন্ত করুণ নেত্রে সে তরুণীর পানে চাহিল।

তরুণী অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে দ্বারের দিকে দেখাইয়া কহিলেন—যান্, আর কখনো বিরক্ত করতে আসবেন না।

ভড়কাইয়া হর্ষ বিমর্ষ চিত্তে বিদায় লইল।

তরুণী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন; তারপর আবার গীতাঞ্জলির পাতায় মনঃসংযোগ করিলেন। হঠাৎ পাশেই কার কণ্ঠস্বর—নমস্কার!

চোখ তুলিয়া তরুণী চাহিয়া দেখেন, মোটা-সোটা এক ভদ্র লোক মাথায় টাক, পরণে খদ্দর, সামনে দাঁড়াইয়া। তরুণী কহিলেন,—কি চান?

ভদ্রলোক কহিলেন, আমার নাম দক্ষিণা। 'মনের মুক্তি' সাপ্তাহিক কাগজের আমি এডিটার।

তরুণী কহিলেন, আমায় তার গ্রাহক হতে হবে? কিন্তু ও-কাগজ আমি কখনো পড়িনি, নামও শুনিনি।

দক্ষিণা কহিল আমার কাছে আছে; পাঠিয়ে দেবো। পড়বেন। এ কাগজে আমি একটা কথা বোঝাবার চেষ্টা করচি···প্রবন্ধ লিখে, গল্প লিখে, কবিতা লিখে। স্বামী আর স্ত্রী···দুজনে মনের মিল না থাকলে দুনিয়া অচল হয়ে যাবে, এবং এই মিল ঘটাতে হলে স্বামীর আর স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান...মানে, সেই সঙ্গে প্রত্যেক স্বামীর দেখা উচিত, যাতে শিক্ষিতা বয়স্কা স্ত্রী তিনি লাভ করতে পারেন। প্রথম যৌবনে আমার বিবাহ হয়েছিল—সে স্ত্রী মারা গেছেন। ছেলে-মেয়ে নেই, সাহিত্যই আমার ব্রত। দেশের উন্নতির জন্য খদ্দরের যেমন প্রয়োজন, সাহিত্যেরও তেমনি। কিন্তু আমি একা...মন কেমন ঔদাস্যে ভরে ওঠে, অবসাদে আচ্ছন্ন হয়! তাই মনে করেচি, বিবাহ করবো। এ জীবন সংগ্রাম···একা যোঝার শক্তি কোথায় পাবো? স্ত্রীই শক্তি।

তা, আপনিও যখন দেশের কাজে অনূঢ়া, ব্রহ্মচারিণী ; এবং যেহেতু বিবাহ ব্যতিরেকে মন সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে না, আমার একান্ত মিনতি, আপনি যদি আমার পার্শ্বে সহধর্ম্মিণী হয়ে সেই শক্তি

তরুণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সরোষে কহিলেন—আপনার মনের মুক্তি আপনার থাক। একখানি দুঃসাহস নিয়ে এক অপরিচিতা মহিলার সামনে আসতে যার লজ্জা হয় না, তেমনি এডিটরকে—তা তিনি দেশের যত বড় ব্যক্তিই হোন,—আমি ঘৃণা করি।

স্বরে যেমন দৃঢ়তা, কথাগুলাও তেমনি স্পষ্ট। মনের মুক্তির সত্ত্বাধিকারীর কাছে বহু ভৎর্সনাই দক্ষিণা লাভ হইয়াছে, কিন্তু এ-ভৎর্সনার কাছে—

সে মাথায় হাত দিয়া সরিয়া পড়িল।

তরুণী হাসিলেন; হাসিয়া আবার চেয়ারে বসিয়া বই খুলিলেন।

অদূরে আবার জুতার আওয়াজ। তরুণী চাহিয়া দেখেন, এক তরুণ যুবা...বর্ণ গৌর, দাড়ি-গোঁফ চাছা, গালে ছুলির দাগ, যেন আর্শুলায়-চাটা বাঁধানো বইয়ের একখানি জলুষ মলাট!

তরুণী কহিলেন—আপনারও কি দেশের কাজে সাহায্য দরকার?

কুলদা একটু হাসিয়া কহিল—আজ্ঞে, আমি বাঁশী বাজাই। অর্থাৎ কবিতা লিখি...প্রেমের কবিতা। আমাদের দেশ—এ কীর্ত্তনের দেশ, সুরে-পাগল দেশ। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-লীলারসে মাতোয়ারা দেশ! আমিও তাই প্রণয়ের গান গাই।

তরুণী কহিলেন,—সে গান শোনায় আমার সময়ের অভাব সম্প্রতি!

কুলদা কহিল, রবিবাবুর কবিতা পড়চেন তো? চমৎকার কবিতা। অমন কবি যে-কোনো দেশের গৌরব। রবিবাবুই লিখে

গেছেন,—মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে! ভারী খাঁটি কথা! বাঁচতে আমরা সকলেই চাই। কিন্তু বাঁচার মত বাঁচতে হবে। দীর্ঘ-নিশ্বাস আর ক্ষোভ, বিরহ...এতে শক্তি ক্ষয় হয়। মনকে পিপাসু রাখার মানে তাকে মরণের পথে ঠেলে দেওয়া। জাতির শক্তি সবল করতে হবে! খদ্দর ভালো, মানি; কিন্তু তাকেই সর্ব্বস্ব করা উচিত নয়। কাজের সঙ্গে চাই আরাম--সে আরাম দিতে পারে শুধু কবিতা আর গান!—রবিবাবু গেয়েচেন—আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো! তা ছাড়া গেয়েচেন, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!—তা আমিও ফাঁদে পড়েচি। আপনার ওই কাজল-কালো চোখের তারা...

তরুণী ঝাঁজালো স্বরে কহিলেন,—এত বড় অভদ্র ইতর আপনি! নারীকে শুধু ভোগের বস্তু বলে জেনেচেন! আর সেই কথা এমন অসঙ্কোচে···! আপনি কবি? ছি!

কবি-কুলদা চিত্তে রূঢ় আঘাত পাইয়া সরিয়া গিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

তরুণী বই খুলিলেন। পড়ায় মন লাগে না। দুনিয়ার সর্ব্বত্র এই! নারীকে কাছে দেখিলে জঘন্য লোলুপতায়···

বেয়ারা আসিয়া কহিল,—খানা, বাইজি?

তরুণী কহিলেন,—দাও।

বেয়ারা চলিয়া গেল।

তরুণী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; তার পর সতীশের ঘরে চলিলেন, গীতাঞ্জলি বইখানি ফেরত দিতে!

ঘর খোলা। সতীশ ঘরে নাই। কোথায়? ওই যে বারান্দায়...

তরুণী আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন, কহিলেন,—কি করচেন?

সতীশ বুকের পটে ছবি আঁকিতেছিল নানা রঙের। চমকিয়া উঠিয়া বসিল, কহিল,—আপনার অন্য বই চাই ?

তরুণী কহিলেন,—দিন আর একখানা...

সতীশ আর একখানা বই আনিয়া দিল, রবিবাবুর পলাতকা।

তরুণী কহিলেন,—যাচ্ছেন তো শালিমারে ?

৬

পিছনে পাহাড়ের গা। সেই পাহাড়ের কোলে প্রকাণ্ড বাগান। ফলে-ফুলে ছাওয়া—অপূর্ব্ব কারিগরি। নীচে, বহু নীচে, বিস্তীর্ণ ডল হ্রদ—স্বচ্ছ জল টল্‌টল্ করিতেছে,...যেন প্রকাণ্ড নীলা পাথরখানি !

তরুণী কহিলেন,—ভূ-স্বর্গই বটে ! একটু বসি।

সবুজ ঘাসে ছাওয়া ভূমি। তরুণী বসিলেন ; বসিয়া চোখের দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত করিয়া দিলেন। সতীশ স্তব্ধ প্রকৃতির এই শোভা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই সে বাক্যহীন, না...?

তরুণী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন,—আমাদের দেশে নারীর অবস্থা কি শোচনীয়--ভাবলে জ্ঞান থাকে না...

সতীশ কহিল,—ও কথা কেন বল্‌চেন ? আপনার অভিজ্ঞতা...

মৃদু হাসিয়া তরুণী কহিলেন,—নিজের সেই অল্প অভিজ্ঞতা থেকেই বল্‌চি। শুনবেন ?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সতীশ তরুণীর পানে চাহিল।

তরুণী কহিলেন,--আমরা দুই বোন। দুজনেই লেখা-পড়া কিছু শিখেচি। ভেবেছিলুম, নিজেরা নিজেদের পায়ে ভর করে দাঁড়াবো, কাজ করবো নিজেরা। স্বামী বলে অপর কোন জীবের গলগ্রহ হবো না। আমার ছোট বোন্...দেড় বছরের ছোট সে আমার চেয়ে,—সে

পারলে না, বিয়ে করে সংসারী হয়েচে। লেখাপড়া ছাই হয়ে যাবে! আমি প্রথমে বাঙলা দেশে এক মেয়ে-স্কুলে হেড মিষ্ট্রেস হয়ে গেলুম। স্কুল-কমিটি স্কুলের উন্নতির জন্য ভারী চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ঘন ঘন তাঁরা স্কুলে আস্‌তে লাগলেন। প্রতি হপ্তায় মিটিং। শেষে সেক্রেটারী —তিনি কখনো স্কুলে আসবার সময় পেতেন না...মস্ত উকিল, পাব্লিক প্রসিকিউটর, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান···বয়সও হয়েচে। তিনি রবিবারটা স্কুলেই কাটাতে লাগলেন। মেয়েদের স্পোর্ট্‌স্, মিউজিক এ-সব শেখাতে হবে। ক্লাশ স্বরু হলো। একদিন একটা হিসেব-নিকেশের কাজে কমিটি-মিটিংয়ের পর তিনি স্কুলে রয়ে গেলেন। সন্ধ্যা হয়-হয়, হিসেব দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার পানে চেয়ে বল্‌লেন,—কেন এ কষ্ট করচো? এই বয়সে? এ তো তোমার সাজে না। তুমি রাজ্যেশ্বরী হতে পারো যে। একটিবার বলো, হাঁ। আমি কোনো কথা বললুম না। তাঁর পানে চেয়ে রইলুম। তিনি আমার একখানি হাত চেপে ধর্‌লেন। আমি গর্জ্জে উঠলুম, হাত ছাড়ুন। তিনি বল্‌লেন, কেন রাগ করচো। এখন সমস্ত বয়স পড়ে আছে—কোন্ হতভাগার হাতে পড়ে শেষে...তার চেয়ে...মূর্খ স্ত্রী নিয়ে জীবন আমি ভোগ কর্‌তে পারি নি, শুধু পয়সাই রোজগার করেচি। তা একলক্ষ টাকার কাগজ করে দিচ্ছি তোমার নামে। এই কথা বলে—আবার হাত চেপে ধরলেন। আমি তাঁর হাতে সেফ্‌টীপিন্ ফুটিয়ে দিলুম। উঃ, বলে লাফিয়ে উঠলেন···

সতীশ শিহরিয়া উঠিল। গল্পের সঙ্গে তরুণীর মুখেও কি পরিবর্ত্তন!

তরুণী কহিলেন,—চাকরি গেল, আর কিছু হলো না...সেক্রেটারীর অত বড় নাম! চলে এলুম।...কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এক কুমার-বাহাদুরের তরুণী স্ত্রীর সঙ্গিনী আর শিক্ষয়িত্রী হয়ে গেলুম। সেও বাঙলা

দেশে। একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গতে দেখি, কুমার-বাহাদুর আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েচেন! আমার রূপের সে কি স্তুতি! জমিদারী আমার পায়ে লুটিয়ে দিতে চাইলেন। চলে যেতে বল্‌লুম— যাবেন না—এসে হাত চেপে ধরলেন। তাঁর গ্রাস ছিনিয়ে সরে এলুম। তিনি আবার হাত বাড়ালেন। খাটিয়ার ছৎরী ভেঙ্গে গেছলো...এক কোণে সেটা পড়ে ছিল। সেইটে দিয়ে তাঁর মাথায় দিলুম এক ঘা— বাহাদুর টলে পড়ে গেলেন। পুলিশ এসেছিল ; কিন্তু ব্যাপার ঐখানেই থামলো ; এর বেশী গড়ালে কি হতো, কে জানে ? আমিও চলে এলুম।

সতীশ কহিল,—বলেন কি ? এমন বিপদে বার-বার ?

তরুণী কহিলেন,—আরও দু'বার। একবার বেহারে ডুমরাওয়ের এক স্কুলে, আর একবার দিল্লীতে! পুরুষ কি সর্ব্বত্র অত্যাচারী হবে ? শেষে এই কাশ্মীরে এসেচি! এখানে গার্লস্কুল আছে, তার হেড-মিষ্ট্রেস হয়ে। তা কোন উপদ্রব নেই ওখানে। তবে দেশের জন্য মনটা উতলা হয়। কাশ্মীর ভূস্বর্গ, মানি। কিন্তু আমার শ্যামল বাঙলাদেশ, তার সেই জলা, মাঠ, সেই ডোবা, পচা পুকুর, বাঁশবন, ম্যালেরিয়া...সবের জন্যই মনটা এমন আকুল হয়...।

সতীশ চুপ করিয়া রহিল ; দৃষ্টি আকাশের পানে। সূর্য্য পাহাড়ের কোলে হেলিয়া পড়িতেছিল। সন্ধ্যা হইতে দেরী আছে··· তবু আঁধারে-আলোয়-ঘেরা এ যেন এক স্বপ্নরাজ্য।

তরুণী কহিলেন,—আজই সকালে ঐ বেঙ্গল হোটেলের ছাদে... আমি বসে বই পড়ছিলুম, তিন জন বাঙালী এসে হৃদয়-বেদনা জানিয়েচেন আমায়। আমার সঙ্গে কোনো দিন আলাপ হয়নি—অথচ! তাঁরা দেশের কাজে নেমেচেন, শক্তি পাবেন প্রচুর, আমি যদি সহধর্ম্মিণী হয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়াই...

কথাটা বলিয়া তরুণী হাসিলেন।

সতীশ রাগিয়া আগুন। এমন বর্ব্বর, এমন ইতর! সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল—তার মনেও যে এমনি কামনা...লজ্জায় সে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল!

তরুণী কহিলেন,—মোটে ভাল লাগছিল না। একা, বড় নিঃসঙ্গ—কাশ্মীরীদের সঙ্গে আলাপ করতুম। কিন্তু ক'টা চুরি হতে ভয় করতে লাগলো। নিজেকে নিয়ে নয়, সম্পত্তি নিয়ে, এই দুর্ভাবনাতেই নারী গেল। আরো হোটেল ছিল, তার দিকে না ছুটে বেঙ্গল হোটেলে এলুম—শুধু ঐ নামটার মোহে। বেঙ্গল হোটেল। আমার বাঙলা দেশ, সোনার বাঙলা! কবি বলেচেন, আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি!...

সতীশের মুখে অন্য কোন কথা ফুটিল না। সারা দুনিয়া তখন তার চোখের সাম্‌নে লাটুর মত ঘুরপাক খাইতেছিল।

৭

চার-পাঁচদিন পরের কথা।

সতীশ বিছানায় পড়িয়াছিল। বেলা তিনটা বাজিয়াছে। বেড়ানোর সখ তার আর নাই। কাশ্মীর হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। শুইয়া গড়াইয়াই সে দিন কাটাইয়া দেয়!

হঠাৎ তরুণী আসিয়া বাহির হইতে কহিলেন,—ঘরে আসবো?

সতীশ উঠিয়া বসিল; কহিল,—আসুন।

তরুণী কহিলেন,—আজ ছুটি হয়ে গেল। ইন্‌স্পেক্টর এসেছিল, তাই। বেড়াতে যাবেন, ছাতাবলে? একটা মেলা আছে।

না বলিবার শক্তি সতীশের ছিল না। সে কহিল,—চলুন।

তরুণী কহিলেন,—তৈরী হয়ে নিন্। পনেরো মিনিট—কেমন ?

—আচ্ছা!

শিকারায় চড়িয়া দু'জনে বাহির হইলেন। ঝিলামের বুকে শিকারার শ্রেণী চলিয়াছে। হাউস-বোটগুলা চুপ-চাপ দাঁড়াইয়া। ছ'টা পুল পার হইয়া সপ্তম পুলের কাছে ছাতাবল। ঝিলামের গা বহিয়া কাঠের বড় বড় বাড়ী উঠিয়াছে। খুব ছোট ছোট জানলা, সেগুলা খোলা। তীরে অজস্র আঙুরের গাছ...এদেশের লাউ-কুমড়ার লতার মতই যেখানে সেখানে গজাইয়া উঠিয়াছে।

তরুণী কহিলেন,—ঐ পাহাড়ে চারিদিক্ ঘেরা দেখে প্রাণ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। এ পাহাড়ের আড়াল ফুঁড়ে আর কি দেশে ফেরা যাবে?

তারপর আরো কথা হইল। আজ সতীশকে পরিচয় দিতে হইল—তরুণী ছাড়িলেন না। সে বলিল, নিঃসঙ্গ জীবনে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে, তারি কাহিনী। এ সংগ্রামের প্রয়োজন নাই। তবু মানুষ হইয়া যখন জন্মিয়াছে,—

শুনিয়া তরুণী স্থিরদৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিলেন। সতীশ ফিরিয়া চাহিলেন—দুজনে দৃষ্টি মিলিল। ও-দৃষ্টিতে কি ও? মমতা? সমবেদনা? বুঝি, তাই। সতীশের অন্তর পুলকে ভরিয়া উঠিল।...

ফিরিতে সন্ধ্যা হইল।

দ্বারের কাছেই প্রমদাচরণ ডাকিলেন,—আসুন নিবৃত্তি বাবু--

নিবৃত্তিকুমার ওরফে এলাহাবাদের এ্যাডভোকেট্ এন, কে, চাটার্জী হাজির হইলেন। প্রমদাচরণ হুঁশিয়ার লোক, ওকালতী তাঁর পেশা...ভূত-ভবিষ্যৎ বুঝিয়া চাল্ দেন।

প্রমদাচরণ কহিলেন,—মিস্ প্রতিমা চাটার্জী, এঁকে আপনি চিনতে পারেন কি না দেখুন তো?

তরুণী চাহিয়া দেখেন, প্রমদাচরণের পাশে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সাহেবী পোষাক-পরা।

এন, কে, চ্যাটার্জী বলিলেন,—ইনি নন তো!

প্রমদাচরণ বিস্মিত হইলেন। কহিলেন,—ইনি নন? এখানে নাম দিয়েচেন, মিস্ পি, চ্যাটার্জী। খদ্দর পরেন, ছিপছিপে গড়ন, সুন্দরী, কুমারী...আপনার বিজ্ঞাপনের সঙ্গে এমন মিল!

চ্যাটার্জী কহিলেন,—না। ইনি আমার মেয়ে প্রতিমা নন্।

তরুণীর বিস্ময় ভাঙ্গিলেন এ্যাডভোকেট্ চ্যাটার্জী, খবরের কাগজে ছাপা সেই বিজ্ঞাপনের কাহিনী বলিয়া।

প্রমদাচরণ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন,—তাই তো, ভারী ভুল হয়ে গেছে। আমি নিঃশব্দে আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলুম—কাকেও বলিনি। জানতে পারলে উনি পাছে সরে যান, তাই। তা ইনি তাহলে আপনার কন্যা নন?

চ্যাটার্জী কহিলেন,—না।

—এঃ! বলিয়া প্রমদাচরণ হতাশ দৃষ্টিতে চাহিলেন।

পরের দিন সকালে সতীশ জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিয়া গেল। আর কাশ্মীরে নয়! মিথ্যা এক স্বপ্নের মোহ প্রাণের ভিতরটাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে! আর তাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়! অনর্থক দুঃখ কিনিয়া ফল কি! সে যেমন আছে, এমনি থাকিবে! শুধু একটা স্মৃতি। তাই তার পরম লাভ।

তরুণী ছুটিয়া আসিলেন, কহিলেন,—আমায় বাঁচান সতীশবাবু।

ব্যাপার কি?

প্রমদাচরণ তাঁর পিছনে আসিলেন, কহিলেন,—ব্যাপার এমন কিছু

নয়। আমি ক্যালকাটা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। নন্-কো-অপারেশনের হুজুগেও প্রাক্‌টিশ ছাড়িনি। মানে, দেশের কাজে যোগ দেবার সময় তখনো আসিনি। সুযোগ খুঁজছিলুম দেশমাতার ছোট্ট ডাকটুকুর। আজ সে ডাক এসেচে। That call! তাই এঁকে বলছিলুম, আমার বয়সের অভিজ্ঞতা, আর ওঁর তরুণ বয়সের প্রদীপ্ত অনুরাগ একত্র করে আসুন, দু'জনে মিলে-মিশে সে-ডাকে সাড়া দি—দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করি!

সতীশ কি বলিবে? সে হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তরুণী তার জিনিষপত্র বাঁধা হইতেছে দেখিয়া কহিলেন,—এ কি?

সতীশ কহিল,—বাড়ী যাচ্ছি।

—আজই?

—আজই।

—বাঃ! তা হবে না। দু'দিন সবুর করুন। আমি আজ ঐ স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে আসি। তারপর আপনার সঙ্গে...

—আমার সঙ্গে? আপনি আমার সঙ্গে কোথায় যাবেন?

—কেন, আপনার বাড়ীতে! একটু স্থান হবে না আমার?

সতীশের সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। শীতের দেশে গাও ঘামিল। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তরুণীর পানে চাহিয়া রহিল।

তরুণী কহিলেন,—নিয়ে যেতে পারবেন না? ফেলেই বা যাবেন কি ব'লে—ঐ দুঃখের কাহিনী শুনেও? কোথাও যে আমি নিরাপদ বুঝচি না। ঘরের বাহিরে নারীর এত শত্রুও জিভ্ মেলে আছে! আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। নিয়ে চলুন আমায়, দয়া করে—

সতীশ কহিল,—যাবেন? তার মুখ-চোখ এক সুমধুর সম্ভাবনায় উজ্জ্বল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

আখের

বৃন্দাবনের সঙ্গে বাণীনাথের কোথায় এবং কি করিয়া মনের গোল বাধিল, তা নির্ণয় করা শক্ত। ছেলেবেলা হইতে একপাড়ায় বাস, স্কুলে এক ক্লাশেই দুজনে পড়িয়াছে, এবং আজ দুজনের ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স হইলেও সেই খিটিমিটি বাধিয়াই আছে।

দুজনে কি-একটা সম্পর্কও আছে। সে সম্পর্ক বুঝিতে অনেকখানি মাথা খাটাইতে হয়।

দুজনেই গৃহস্থ; অফিসে চাকরি করে। কেরাণী চাকরি। কায়-ক্লেশে দিন কোনোমতে চলিয়া যায়।

দারিদ্র্যের মধ্যেও বৃন্দাবন কথা কয় বেশ বড় বড়। কোনো বড়মানুষীর গল্প উঠিলে বৃন্দাবন তাচ্ছল্যভরে বলিয়া ওঠে, হ্যাঁ, ও-সব থাক্ হে, ঢের দেখেচি। আমার ছোট-ঠাকুর-দা মশায়…তিনি গোলাপ-জল না হলে তামাক খান্ না—লক্ষৌ থেকে তাঁর তামাক আসে আজো—

মধু কহিল,—তুমি দেখেচো?

বৃন্দাবন কহিল,—সেবারে কাশী গেছলুম না? তাঁর সঙ্গে দশাশ্বমেধের সামনে একদিন দেখা। প্রণাম করতেই ধরে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন,—ছাড়বেন না। পোলাও তৈরী…খেয়ে তবে ফিরি। সেখানে দেখেচি কিনা…

ভূতনাথ বলিল,—তাঁর তো ছেলেমেয়ে নেই…

বৃন্দাবন কহিল,—বিবাহ করেন নি তো!

ভূতনাথ কহিল,—সম্পত্তি পাবে কে ?

মৃদু হাসিয়া বৃন্দাবন কহিল,—আমারি তো পাবার কথা। মার কাছে শুনেও এসেচি বরাবর। মাকে খুব স্নেহ করতেন, দেশে তো আর ফিরলেন না। গোয়ালিয়রে পাথরের কাজ ছিল—এখন শেষ বয়সে কাশীবাস করচেন। সৌখীন খুব—

মন্মথ কহিল,—বাণীর সঙ্গেও সম্পর্ক আছে, না ?

বৃন্দাবন কহিল,—একটু দূর। আমার সঙ্গেই নিকট সম্পর্ক—

মধু কহিল,—তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে তো—ছাখো না, কিছু পাও যদি...

বৃন্দাবন কহিল,—চাইবো ? কখনো না ! যে অবস্থায়ই হোক্, ভিক্ষে চাইবো না—এ তেজ আমাদের বংশে—

কথাটা শেষ হইল না। বাণী আসিয়া কহিল,—কি হে, কোন্ রাজাকে মারলে আজ ?

মন্মথ কহিল,—তার মানে ?

বাণী কহিল,—তোমাদের তো ঐ কাজ—রাজা-উজীর মারা—

মুক্তেশ্বর কহিল,—না না, রাজা-উজীর মারা নয়। বিন্দের দাদা-মশায়ের কথা হচ্ছিল...

বাণী কহিল,—রাখাল ভট্‌চাযি মশায়—নাভা ষ্টেটে চাকরি করতেন ?

ভূতনাথ কহিল,—তবে যে বিন্দে বল্‌ছিল, গোয়ালিয়রে পাথরের কারবার...

বাণী কহিল,—সে তো শেষাশেষি—তাও নাকি টলমল করায় কাশীবাস করচেন এখন।

মন্মথ কহিল,—বিন্দে যখন তাঁর সম্পত্তি পাবে, তখন দেখবে।

বাণী কহিল,—বিন্দে পাবে কোন্ আইনে?

বৃন্দাবন চটিয়া লাল হইয়া গেল। কহিল,—বিশুদ্ধ হিন্দু আইনে।

বাণী কহিল,—তুমি কি সম্পর্কে পাও দাদা?...

বৃন্দাবন কহিল,—আচ্ছা, আমি না পাই, তুমি পাবে না তো।

বাণী কহিল,—বলা যায় না। শেষ বয়সে তাঁকে সেবায় যদি খুশী করতে পারি...

বৃন্দাবন কহিল,—কাশী যাচ্ছ না কি?

বাণী কহিল,—কাশীতে আমি না যাই, তিনি তো আমার এখানে আসতে পারেন।

বৃন্দাবন কহিল—বেশ!—কিন্তু আমি থাকতে তোমার বাড়ী আসবেন তিনি কি দুঃখে! হুঁঃ, আমার সঙ্গে কাশীতে যখন দেখা হয়, এ কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, কলকাতায় আসবেন একবার, আর এসে আমার ওখানেই...

বাণী কহিল,—পনেরো দিন অপেক্ষা করো, দেখা যাবে কোথায় এসে ওঠেন...

বৃন্দাবন রাগিয়া ফুলিতে লাগিল, আর কোনো কথা বলিল না।

মন্মথ হাসিয়া কহিল,—ওহে মুক্তেশ্বর, চায়ের ফরমাশ করো—

মুক্তেশ্বর কহিল,—চাকরটা নেই, কোথায় গেছে ছুটি নিয়ে—নিজেই একবার চেষ্টা দেখি।

২

পাঁচ-ছদিন পরে বৃন্দাবন মুক্তেশ্বরের বৈঠকখানায় একখানা চিঠি হাতে হাজির হইয়া কহিল,—এই ছাখো হে চিঠি, সেদিন বাণীর আস্ফালনটা শুনলে না...

মুক্তেশ্বর কহিল,—কি চিঠি ?

বৃন্দাবন কহিল,—ছোট দাদামহাশয়ের চিঠি। কি লিখেচেন, পড়ো...

মুক্তেশ্বর চিঠি খুলিয়া পড়িল,—

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমার শরীর উপস্থিত ভালো নাই। কলিকাতায় কবে যাইব, বলিতে পারি না। তবে একবার যাইবার ইচ্ছা আছে এবং গেলে তোমার বাসাতেই উঠিব। আশা করি, তোমরা ভাল আছ। আমার আশীর্ব্বাদ সকলে জানিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

শ্রীরাখালচন্দ্র শর্ম্মা।

মুক্তেশ্বর কহিল,—এলে তোয়াজ করে লেখাপড়া একটা করিয়ে নিয়ো,—বুঝলে হে।

বৃন্দাবন মৃদু হাসিল ; কহিল,—তা আর বলতে ! আমার স্ত্রী বলেন, আসুন একবার, আমার সেবার বহরটা দেখাবো তখন।

মুক্তেশ্বর কহিল,—বাণী যে তবে...

বৃন্দাবন কহিল,—জ্ঞাতি-শত্রু আর কাকে বলে। ভালো দেখতে পারে না, অথচ আমি তার কোনো ক্ষতি করিনি।

মুক্তেশ্বর কহিল,—ভারী অন্যায় !

পাঁচ-সাত দিন কোনো বিঘ্ন ঘটিল না। বৃন্দাবনের মন প্রফুল্ল ; বন্ধু-মজলিসে তার কণ্ঠস্বর বেশ দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ।

সেদিন রাত্রে মুক্তেশ্বরের বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় পথে হাবুল কহিল,—বাণীর বাড়ী ও কে এলো হে? বুড়ো মানুষ, রুগ্ন···বাণীর দেখা পাবার জো নেই আর।

ভূতনাথ কহিল,—ঠিক কথা। কাল পথে দেখা...বললে কবিরাজের বাড়ী যাচ্ছি...অসুখ। দেখেচি বটে, বাইরের ঘরে এক বুড়ো...এতখানি পাকা দাড়ি, পাকা গোঁফ, মাথায় টাক, ফ্লানেলের জামা গায়ে...

মন্মথ কহিল—রাখাল বাবু নন্ তো হে! বাণী বলেছিল না, ওর দাদামশায় আসচেন কাশী থেকে!

বৃন্দাবন চমকিয়া উঠিল, কহিল,—কাশী থেকে দাদামশায়!

মনে পড়িল, এমনি একটা কথা বৃন্দাবনের পুত্র বিলাস বলিতে-ছিল বটে! বাণী ক্যাকার কে দাদামশায় আসিয়াছেন, তাঁর খুব অসুখ—বাড়ীর ছেলেরা খেলা বন্ধ করিয়া গুম্ হইয়া থাকে...। বাণী কোনো ছলে তাঁকে শেষে আনিয়া হাজির করিল না কি?

কিন্তু কি করিয়া নিঃশব্দে এতখানি জোগাড়...?

ঠিক! সেই তো মুক্তেশ্বরকে চিঠি দেখাইয়া জাঁক করিয়া-ছিল! চিঠির কথা বাণী সেখানেই শুনিয়াছে। এবং শুনিয়া তৎপর হইয়া...

বৃন্দাবনের অন্তরাত্মা গর্জ্জিয়া উঠিল, রাস্কেল।

বৃন্দাবন স্থির করিল, যেমন করিয়া পারে, এ ব্যবস্থা উল্টাইতে হইবে। গৃহে ফিরিয়া গম্ভীর মুখে সে আহারে বসিল। পত্নী মহিমা-সুন্দরী আসিয়া কহিলেন,—নদোর ছেলের ভাত গো—কাল যাবার জন্য বলে গেছে।

বৃন্দাবন কহিল,—হুঁ—

গৃহিণী কহিলেন,—একটা হাফ-গিনি না দিলে কি ভালো দেখাবে? তা একখানা...

বৃন্দাবন আবার কহিল,—হুঁ—

গৃহিণী কহিলেন,—কাল সকালেই এনে দিয়ো। বেলা এগারোটার সময় গাড়ী পাঠাবে, বলেচে—যাবার সময় নিয়ে যাবো তো—

বৃন্দাবন এবারও কহিল,—হুঁ।

গৃহিণী রাগিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—ভালো জ্বালা। সব কথাতেই হুঁ। হলো কি তোমার? যত কথা সব বন্ধুর বাড়ী এমন খরচ করে এসেচো যে আমার বেলায় ক'বার মত কথা আর খুঁজে পাচ্ছো না? আমারও যেমন কপাল...।

বৃন্দাবন কহিল,—থামো, ঢের গুরু বিষয় ভাবচি আমি।

গৃহিণী কহিলেন,—আমি যা বললুম, এ বিষয়টাও লঘু নয়।

বৃন্দাবন কহিল,—যা খুশী করো, মোদ্দা আমায় জ্বালিয়ো না।

গৃহিণী কহিলেন—বেশ, আমি কাল জুতো-মোজা পায়ে দিয়ে, গায়ে তোমার কামিজ চড়িয়ে হাফ গিনি কিনতে বেরুবো'খন। দয়া করে' টাকা ক'টা শুধু ফেলে দিয়ো—

গৃহিণী মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেলেন। বৃন্দাবন ভোজন করিতে করিতে চিন্তার গহন-বনে প্রবেশ করিল।

অনেক রাত্রি। বৃন্দাবনের চোখে ঘুম নাই। চক্ষু মুদিয়া মাথায় নানা প্ল্যান খাটাইতেছে—সহসা একটা...চিঠি।

ধাক্কা দিয়া সে গৃহিণীকে ডাকিল,—ওগো...

ঘুম ভাঙ্গিতে 'ওগো' বিরক্ত হইলেন, কহিলেন,—কি? জল চাই?

—না, না—শোনো না, ভারী মুস্কিল হয়েচে...

গৃহিণী পাশ ফিরিলেন; কহিলেন,—কিসের মুস্কিল ?

বৃন্দাবন কহিল,—ছোট দাদামহাশয়কে বাণী কাশী থেকে এনে নিজের বাড়ীতে পূরেচে। তার অসুখ—কবিরাজ দেখাচ্ছে, তোয়াজ করচে—মতলবখানা বুঝেচো ?

গৃহিণী কহিলেন,—কি করবে ?

বৃন্দাবন কহিল—ঘুঘু দেখেচেন যাদু ফাঁদ দেখেন নি, এখনো। বাছাধনকে এবার ফাঁদ দেখাবো। ফন্দি যা এঁটেচি—

গৃহিণী কহিলেন,—কি ?

বৃন্দাবন কহিল,—কাল দুপুর বেলায় আপিস থেকে ছুটি নিয়ে চলে আসবো...বাণীচন্দর তখন তো আপিসে থাকবেন! সেই ফাঁক-তালে তার বাড়ী গিয়ে দাদামশায়কে মাথায় করে এখানে আনবো! বাধা দেবে কে ? বৌমা ?...ভাসুরের সঙ্গে কথা কইতে তো পারবে না। দেখাচ্ছি মজা...

বৃন্দাবন হাসিয়া ফেলিল।

গৃহিণী কহিলেন,—কখন্ আন্চো ? নোদোদের ওখানে যে কাল...

বৃন্দাবন কহিল,—আগে আখেরের বন্দোবস্ত করো...একদিন নেমন্তন্ন খেয়ে রাজত্ব পাবে না...

গৃহিণী কহিলেন,—ভালো দেখাবে না যে গো...

বৃন্দাবন কহিল,—বলো আমার ভয়ঙ্কর অসুখ—আপিসে নামটা সই করেই ছুটি নিয়ে আসচি...

গৃহিণী কোনো কথা বলিলেন না। বৃন্দাবন নিজের বুদ্ধি-কৌশলে বিমোহিত হইয়া শুধু কহিল,—এবার ঘুমোও। কাকেও টুঁ শব্দটি নয়! শুধু এই ঘরটা দাদামশায়ের জন্য গুছিয়ে রেখো। আমরা

ওদিককার ছোট ঘরে শোবো—একটু কষ্ট? তা হোক গে—বলো কি, আখেরের একটা হিল্লে যদি করা যায়?

৩

বেলা সাড়ে বারোটায় একেবারে একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী লইয়া বৃন্দাবন আসিয়া বাণীর বাড়ীর সদরে হানা দিল। দ্বারে কড়া নাড়িতে ঝী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

বৃন্দাবন কহিল,—দাদামশায় কোন্ ঘরে রে?

ঝী কহিল,—বৈঠকখানার পাশের ঐ ছোট ঘরে...

অন্ধকার ঘর। তক্তাপোষে একটা জীর্ণ মাদুর: তার উপর একখানি ময়লা কাঁথার উপর ময়লা চাদর পাতা, সেই শয্যায় কম্বল মুড়ি দিয়া কে একজন শুইয়া আছে—

বৃন্দাবন ডাকিল,—দাদামশায়...

জবাব মিলিল,—কে?

—আমি বৃন্দাবন।

—বৃন্দাবন?

—হাঁ, আপনার নাতি।

বৃদ্ধ একটু কষ্ট করিয়া উঠিয়া বসিল। পাকা দাড়ি, মুখ-ভরা গোঁফ। বৃন্দাবন ভালো করিয়া দেখিল, সেই টাক, সেই দাড়ি-গোফ, তবে রঙটা ময়লা হইয়া গিয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে করে তাঁহাকে দেখিয়াছিল এক বেলার জন্য।...রাস্কেল বাণীর চক্রান্তে...

বৃন্দাবন কহিল,—আমার বাড়ীতে আপনাকে নিয়ে যাবো, তাই এসেচি। এই ঘরে রোগা শরীরে মানুষ থাকে কখনো?

আমার ওখানে দোতলা ঘর—দক্ষিণ খোলা, নিন, উঠুন। পারবেন না বুঝি, কোলে করে গাড়ীতে তুলে দেবো ?

বৃদ্ধ কহিল,—বাণী বাড়ী নেই। তাকে না বলে...

মায়ায় বিগলিত স্বরে বৃন্দাবন কহিল,—বাণী আর আমি কি ভিন্ন, দাদামশায় ?

—তা বটে। তবে,...এ-মাসের খরচা বাণীকে দিয়েচি আমি আর টাকাকড়ি···

সে টাকা নিয়ে বাণী রাজা হোক। আপনার সেবা করবো, চিকিৎসা করাবো, তার দরুণ টাকা নেবো আপনার কাছ থেকে ! ছি দাদামশায়। রক্তের টানটা কি কিছুই নয় ? টাকার ভাবনা আপনাকে করতে হবে না। টাকার লোভে আপনাকে নিতে আসিনি তো—আঁতের টান এ যে···বাণীর মতন ব্যবসা-বুদ্ধি···

বৃদ্ধ কহিল,—না, না, বাণীও নিতে চায়নি। আমিই জোর করে···ছাপোষা মানুষ তো···আহা !

বৃন্দাবন দেখিল—এই জায়গায় ঘা দিতে হইবে। সে কহিল,—আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের এমন হাল হয়নি দাদামশায়, যে আপনার জনের রোগে···আমার ওখানে চলুন—দেখবেন, আপনার নাতবৌয়ের যত্ন। আমি ছাড়বো না—চলুন···

বৃদ্ধ উঠিল, কহিল,—আমার বাক্সটা ?

বৃন্দাবন ডাকিল—ঝী···

ঝী আসিল। বৃন্দাবন কহিল,—দাদামশায়ের বাক্স কোথায় ? দাও। দাদামশায়কে আমার ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। বৌমাকে ব'লো, যেন দুঃখ না করেন। তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, তা ছাড়া এই ঘরের কষ্ট ! আমার ওখানে আরামেই থাকবেন—কোনো চিন্তা নেই।

ঝী তক্তাপোষের তলা হইতে ট্রাঙ্কটা টানিয়া কহিল,— বড্ড ভারী যে গো…

বৃন্দাবন কহিল,—থাক, থাক। আমি গাড়োয়ানকে বলচি, সে নিয়ে যাবে'খন…

বৃদ্ধ কহিল,—বাক্সটা সাবধানে বাবা—আমার যথাসর্ব্বস্ব ওরি মধ্যে…

বাক্সটা অসামান্য নয়, তবে ভারী। লোলুপ নয়নে ট্রাঙ্কের পানে চাহিয়া বৃন্দাবন কহিল,— আর কেউ…? আমি নিজেই নয় নিয়ে যাবো…

বৃন্দাবনের হাত ধরিয়া বৃদ্ধ গাড়ীতে গিয়া বসিল। বৃন্দাবনকে কহিল,—বাক্সটা, দাদা…

বৃন্দাবন বাক্স লইয়া চলিল। ঝী কহিল,—মা বলচেন, রোগা মানুষ…ওঁর ওষুধ নিয়ে যান্… আর এই মধুর শিশিটা

খুশী মনে বৃন্দাবন গিয়া গাড়ীতে বসিল। মনে মনে বাণীর উদ্দেশে কহিল,…কেমন বাণীচন্দোর…এসে দেখো, পাখী উড়ে গেছে—খাঁচা খালি। আমার নাম হলো বৃন্দাবন…আমার লীলা বুঝবে তুমি? হুঁ:।

রাত্রে বাণী আসিয়া ডাকিল—বিন্-দা

দোতলার জানালায় দাঁড়াইয়া বৃন্দাবন কহিল—কেন?

বাণী কহিল,—বলি, এ ব্যাপার কি! রোগা মানুষকে এ-রকম চুরি করে আনলে…

বৃন্দাবন কহিল,—থানায় নালিশ করেগে…

বাণী কহিল,—আহা, তা নয় করবো, কিন্তু এই রোগের ভার এমনভাবে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে আমি যে নিশ্চিন্ত হতে পারবো না।

বৃন্দাবন কহিল,—সে চিন্তা না-ই করলে...!

বাণী কহিল,—তবু···বলি, আহা, কথাগুলো শুনেই যাও...একবার নামো নীচে—

বৃন্দাবন কহিল,—কোনা কথা শুনতে চাই না···

বাণী কহিল,—শেষে আমায় দোষ দেবে না তো ?

বৃন্দাবন কহিল,—না, না, না···

বাণী কহিল,—কিন্তু···

বৃন্দাবন কহিল,—আমি কোনো কথা শুনতে পারবো না—শুনবোই না ; তুমি বাড়ী যাও—আমি দাদামশায়ের বুকে পুরোনো ঘী মালিশ করচি এখন।

বাণী কহিল,—কবিরাজমশায় বলছিলেন—

বৃন্দাবন কহিল,—কাল আমি মেডিকেল কলেজ থেকে ভালো ডাক্তার আনবো···নগেন ডাক্তারকে···

জানালা বন্ধ হইল। বাণী পথে চুপ করিয়া খানিক দাঁড়াইল, তারপর খুব খানিকটা হাসিল, হাসিয়া গৃহে ফিরিল।

গৃহে ফিরিয়া স্ত্রী বগলাকে বলিল,—কায়েমী গো একেবারে।

বগলাসুন্দরী কহিল,—এ কি বাতিক !

বাণী কহিল,—যাই হোক, আমরা তো বাঁচলুম ; আপনার জন ফেলতেও পারছিলুম না···এই ঘরের কষ্ট।

বগলাসুন্দরী কহিল,—ও-বাড়ীর বড়ঠাকুরের প্রাণ আছে গো··· নাহলে এ-কালে এমন কে করে...

৪

বৃন্দাবন বৃদ্ধের চিকিৎসার ঘটা বাধাইয়া দিল। কলেজ হইতে নগেন ডাক্তার ও সেই সঙ্গে সাহেব ডাক্তার আনাইল। নগেনবাবুকে রোজ

তারিখের জন্য বাঁধিয়া রাখিল। একমাস কোনো রকমে গড়াইয়া গেল। দাওয়াই, ইঞ্জেক্‌শন, সেঁক, তাপ, মালিশ—এক সমারোহ ব্যাপার। টাকার যেমন অজস্র ব্যয়, শরীরের মেহনৎও তেমনি···

মহিমাসুন্দরী কহিলেন,—ছেলেপিলেগুলো গেল—সময়ে চান নেই, খাওয়া নেই, দুধটুকু বন্ধ হয়ে গেছে...

আশ্বাস দিয়া বৃন্দাবন কহিল,—আর বড় জোর পনরোটা দিন··· জীবনের মেয়াদ ফুরিয়েচে। মৃত্যুর পর দুধ ঘি রাবড়ি ছাড়া ছেলেদের মুখে আর কিছু দেবো, ভেবেচো ?

ট্রাঙ্ক দেখচো তো ..কি রকম ভারী ! ওতেই ··

মহিমাসুন্দরী নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহকর্ম্মে চলিয়া গেলেন।

পনেরো দিনও কাটিল না। সাতদিন পরে একদিন বৃদ্ধের আর ঘুম ভাঙ্গিল না।

আধ ঘণ্টার মধ্যে পাড়ায় খপর রাষ্ট্র হইল, বৃন্দাবনের ছোট দাদামশায় মারা গিয়াছেন ; এবং মৃত্যুকালে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব বৃন্দাবনকে দিয়া গিয়াছেন। প্রতিবেশীরা আসিয়া কহিল,—কত রেখে গেছে হে ?

কেহ বলিল.—ফুল আনাও, সঙ্কীর্ত্তন আনাও—একটা রীতিমত প্রোশেসন বার করো...

কেহ বলিল,—যারা কাঁধ দেবে, তাদের জন্য পাঁচ পাঁচ টাকা নগদ আর ধুতি-উড়ানী কিনে দাও...

বৃন্দাবনের স্ত্রী হাতের বালা বাঁধা দিয়া গোটা ত্রিশেক টাকা জোগাড় করিয়া আনিল।

বৃন্দাবন কহিল,—কীর্ত্তন একটা আনাই—কি বলো ? লোকে নাহলে গায়ে থুতু দেবে।

মহিমাসুন্দরী কহিলেন,—কি আছে না আছে, আগে ছাখো—নাহলে মিছে যথাসর্ব্বস্ব ঘুচিয়ে শেষে...

বৃন্দাবন কহিল,—হুঃ...ট্রাঙ্ক তো আমার দখলে। ওর মধ্যে কাগজপত্র আছে। ওতেই সব আছে...উনি বলতেন শোনো নি ?

মহিমাসুন্দরী কহিলেন,—তাহালেও...ট্রাঙ্ক আর কেউ এসে যদি দাবী করে ?

বৃন্দাবন কহিল,—করলেই হলো কি না? ও সব আইনের ব্যাপার। কাল আমি ও-পাড়ার মৃত্যুঞ্জয় উকিলের কাছে গেছলুম, পরামর্শ নিতে—

মহিমাসুন্দরী কহিলেন,—কে জানে, কি করচো! ঘরে তো একটি পয়সা নেই—দেড়মাস এই চিকিচ্ছে আর ওষুধ-পত্তর···ছেলে-গুলোর গায়ের জামা ছিঁড়ে কি হয়েচে...

বৃন্দাবন কহিল,—কাল এক-দম্ সব ভোল ফিরিয়ে দেবো—দেখ্‌বে তখন। আগে এই সৎকারের ব্যবস্থাটা করি।

বাহিরে লোক-জন জমিয়া গিয়াছে। খাট আসিল; ফুল; কীর্ত্তনের দলও। বৃন্দাবন দিলদরিয়া-মেজাজে সৎকারের আয়োজন করিল।...

খাট লইয়া বাহকেরা হাঁকিল—বল হরি, হরিবোল...

এমন সময় গেঞ্জি-গায়ে কাঁধে গামছা ফেলিয়া বাণী আসিয়া হাজির।

বাণী কহিল,—আমায় একটা খবর দিতে হয়—আচ্ছা লোক তো!

বৃন্দাবন কহিল,—দরকার মনে হয়নি। চলো হে, চলো...

বৃন্দাবন জোর-গলায় হাঁকিল—বল হরি, হরিবোল!—

শব বাহির হইয়া গেল।...বাণী কাঁধ দিবার অবসর পাইল না। সে না শুনুক, আর সকলে শুনিয়াছ, দাদামশায়ের মর্য্যাদা রাখিতে বৃন্দাবন বলিয়াছে, কুছ্ পরোয়া নেই...দাদামশায়ের শব বহিতে যে কাঁধ দিবে, তার জন্য ধুতি, উড়ানি আর নগদ পাঁচ টাকা—

কাজেই কেহ কাঁধ বদ্‌লাইতে রাজী নয়! বাণী সঙ্গে চলিল।...

রাত্রে গৃহে ফিরিয়া সরবৎ ও মিষ্টান্ন সে ব্যাপারেও কি সমারোহ...

তারা বিদায় লইলে বাণী কহিল,—বাক্সটা একবার আনাও বিন্‌দা —ওর মধ্যে আমার স্ত্রীর দিদিমার একখানি নামাবলী আছে। সেখানি...

বৃন্দাবন কহিল,—বুঝেচি হে বাণী...ও-সব ফন্দী চলবে না। সরে পড়ো...বাক্স আমার যখন খুশী, খুলবো...দাদামশায়ের সম্পত্তির ওয়ারীশান অধিক আমিই। তুমি নও, উকিল-বাড়ী পরামর্শ নিয়েচি।

বাণী স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিল,...ডাকিল,—বিন্-দা—

বৃন্দাবন বিরক্ত চিত্তে কহিল,—কেন?

বাণী কহিল,—মস্ত ভুল করচো তুমি। আমার বিশ্বাস, অর্থাৎ কি ভেবেচো, বলো দিকিন...?

বৃন্দাবন কহিল,—কিসের আবার কি ভাববো...!

বাণী কহিল,—যিনি মারা গেলেন, ইনি...?

মুখখানা বিকৃত করিয়া বিদ্রূপের ছলে বৃন্দাবন কহিল,—আমার পূজ্যপাদ দাদামশায় ৺রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়—

অতি-কষ্টে হাসি চাপিয়া বাণী কহিল,—ও হরি! তাই বলো! নইলে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছলুম, বিন্‌দার এ বাতিক ঘাড়ে চাপলো যে... ভুল, ভুল! মস্ত ভুল করেচো বিন্‌দা...

একটা সংশয় অস্পষ্ট আব্ছায়ার মত বৃন্দাবনের চিত্তপটে উদয় হইল। বৃন্দাবন কহিল,—কিসের ভুল…?

বাণী কহিল,—উনি রাখালবাবু নন্…আমার স্ত্রীর মাতুল—রামহরি হালদার—নিম্তেয় থাকতেন—কেউ নেই…রোগে পড়ে এসেছিলেন আমার স্ত্রীর কাছে—সেবা-শুশ্রূষার জন্য…

বুকে হাত চাপিয়া বৃন্দাবন সেইখানে বসিয়া পড়িল। নিম্তার রামগতি হালদার! কাশীর রাখাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় নন্…বীণার উনি মামাশ্বশুর! তার জন্য কোনোদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া আজ সে একেবারে ফতুর হইয়াছে!…ঐ বাক্সের মধ্যে কি ধন-রত্ন—তারি লোভে…

তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল—দুনিয়ার আলো দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল। বৃন্দাবন ধীরে ধীরে উঠানের উপর শুইয়া পড়িল।

—

মল্লিকের মৌলিক মোরব্বা

বি-এ পড়িবার সময় শশধরের চিত্তে সহসা কবিতা-দেবী ভর করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই মোটর-ট্রাম-বাস, এই লোকজনের কলরব-কোলাহল, ঐ ঢাক-ঢোলের আওয়াজে ভরা সারা তুনিয়াখানা শশধরের এমন নীরস, শূন্য···জীবন এমন নিঃসঙ্গ মনে হইল যে, প্রাণ বুঝি যায়! চক্ষু মুদিয়া একটু নূপুর-শিঞ্জন, কালো চোখের দিঠির একটু ঝিলিক, রাঙা ঠোঁটের একটু হাসির সন্ধানে সে কাব্য-লোকে উধাও হইয়া কোনোমতে আপনাকে লইয়া দিন কাটাইতেছিল। কলেজ ভালো লাগে না! কলেজের পথে বাহির হইয়া সে সোজা চলিয়া যায় গড়ের মাঠে—কোনো দিন বা মিউজিয়মে, কোনো দিন বা আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এবং—

কিন্তু এত বিশদ বিবরণের বিশেষ প্রয়োজন দেখি না! A tree is known by its fruit; ফলেন পরিচীয়তে প্রভৃতি কতকগুলা কথা নেহাৎ নাকি কোন্ সনাতন যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে... কাজেই, এই সব কথার মর্যাদা রাখিয়া শশধর এগ্‌জামিনে ফেল করিয়া বসিল। তা বস্তুক, কাব্যলোকের পথে কিন্তু সে ইতিমধ্যে অনেকখানি অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ভাঙ্গিয়া, ভাবে পাক দিয়া, সে এখন এমন তু'চারিটা কবিতা লিখিয়াছে, হালের তু'চারখানা মাসিক পত্র যে-কবিতা সগৌরবে ছাপিয়া শশধরের কবি-প্রতিভার দিব্যজ্যোতি-বিকিরণে গর্ব্ব বোধ করে!

মামা উমাচরণ তার অভিভাবক। বিষয়-বুদ্ধিতে উমাচরণের নিপুণতার সীমা নেই। শশধরের মাতামহ মৃত্যুকালে অনেকগুলি

টাকা-কড়ি রাখিয়া গিয়াছিলেন। মামা উমাচরণ ব্যবসার ফাঁদ পাতিয়া বুদ্ধি-কৌশলে সে টাকা চতুর্গুণ করিয়া তুলিতে কশরতের আর অন্ত রাখেন নাই। দৈনিক কাগজ বাহির করায় মামার বৈষয়িক জীবন স্বরু হয়; তারপর গ্রীষ্মে ঘোলের সরবতের দোকান খুলিয়া, বর্ষায় হোগ্‌লার ওয়াটারপ্রুফ বেচিয়া, শরতে হাওড়া হাটের শাড়ী বেচিয়া, এবং শীতে শিমলার লুই ও জার্ম্মাণির আলোয়ান বেচিয়াও তিনি মূল-ধন অনেকপরিমাণে খোয়াইয়া ফেলিলেন; ব্যবসার বাতিক কিন্তু ছাড়িলেন না। কারণ, সেই যে ইংরাজী বচন আছে,—'ব্যর্থতা হইল সফলতা গড়িয়া তুলিবার থাম,'—সে-বচনের উপর মামার বিশ্বাস অপরিসীম।

অবশেষে শিউড়ি হইতে মোরব্বা তৈরীর নানা প্রক্রিয়া জানিয়া আসিয়া মামা এখন মোরব্বা তৈরী করিতেছেন এবং কড়ির জারে সে মোরব্বা ভরিয়া বাজারে চালাইবার প্রয়াসে প্রমত্ত হইয়াছেন। মহাজনের পথানুসরণে মোরব্বা-প্রচলনের ব্যাপারে তিনি ক্যালেণ্ডার ছাপাইয়া বিতরণ করিয়াছেন, একজিবিসনে ঘুরিয়া বাঙলার মা-লক্ষ্মীদের মহা-সমাদরে সে-মোরব্বা চাখাইয়াছেন, এবং বসুমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রে এক পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ছাপিয়াই শুধু ক্ষান্ত থাকেন নাই, পূজার সময় গল্প-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। সে প্রতিযোগিতার বিশেষ নিয়ম, গল্পের মধ্যে গল্পের সৌন্দর্য্য নষ্ট না করিয়া তাঁহার জগৎ-প্রসিদ্ধ 'মল্লিকের মৌলিক মোরব্বা'র নামটুকু কৌশলে উল্লেখ করা চাই; এবং প্রতি গল্পের কাপির সঙ্গে মোরব্বার জারে যে-কুপন থাকে, তার একখানি সংলগ্ন করিয়া দিতে হইবে।

এ ব্যবস্থায় ফল ফলিল। গল্প আসিতেছে বিস্তর। সে গল্পগুলা হইতে বাছিয়া পুরস্কার-যোগ্য রচনা নির্ব্বাচন সহজ কথা নয়। দু'চার

জন নামজাদা গল্প-লেখকের কাছে ঘুরিয়া তাঁদের দ্বারে বিনা-মূল্যে উপহার দিবার পর একজন প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, সব মোরব্বা গল্প পড়িয়া তার মধ্য হইতে বাছিয়া কুড়িটা তাঁর কাছে আনিয়া দিলে তিনি ঐ কুড়িটি গল্পের যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। তাঁর সম্পাদকী চাকরি আছে, গল্পের কাঁড়ি পড়িবার মত সময় তাঁর কোথায়!

ঠিক এমন সময় শশধর বি-এ ফেল করিয়া বসিল। মাতুল উমাচরণ শশধরকে ডাকিয়া কহিলেন,—ফেল করে বসলে···আর পড়ে সময় নষ্ট করে কাজ নেই। এই ব্যবসা দেখতে সুরু করো। বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস!

মামার বাণিজ্য কিন্তু উল্টা কথার আভাস দেয়; তাই শশধর সবিনয়ে কহিল,—আমার ভবিষ্যৎ···

মামা ধমক দিয়া কহিলেন,—চাকরিতে ভবিষ্যৎ গড়া যায় না; ওকালতিতেও না। দেশের হাওয়া ফিরেচে। ফলের সিরাপ, আর ঐ টিনের ফলে কত পয়সা বিদেশে যাচ্ছে, খপর রাখো?

শশধর কহিল,—মাসিক পত্রে সে হিসাব বেরিয়েছিল, আমি পড়েচি···

উমাচরণ কহিলেন,—দেশের পানে চাইবার তোমার চক্ষু হয়নি,... তাই চাওনি! চাকরির গোলামি, নয় মক্কেলের দাসত্বের মোহে মন ভরে আছে, কি করে দেখবে? কিন্তু আমি ও দাস্য-ভাবের প্রশ্রয় দেবো না। কাল থেকে চীনেবাজারের দোকানে বেরুবে আমার সঙ্গে... যে ক'দিন আছি, আমার সঙ্গে থেকে দেখে-শুনে ভবিষ্যতের রাস্তা পাকা বানিয়ে তোলো...

শশধর আবার বিনয়-সহকারে কহিল,—কিন্তু আমি ভেবেচি...

বাধা দিয়া উমাচরণ কহিলেন,—কি ভেবেচো ?... আবার বি-এ পড়বে ?

—না।

—তবে ?

শশধর কহিল,—কবিতা লিখি, তাই ঐ কাব্যলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য।

উমাচরণ সবিস্ময়ে শশধরের পানে চাহিলেন। কহিলেন,—কবিতা ...সাহিত্য তা'হলে ?...বাঙ্লা কবিতা ?...

শশধর কহিল,—হাঁা...

উমাচরণ কহিলেন,—কিন্তু খাবে কি...করে ? কবিতায় পয়সা হয় না। ও-বয়সে আমি দৈনিক কাগজ বার করেছিলুম, তখনকার দিনে তাই ছিল রেওয়াজ। লোকে কবিতা তেমন বুঝতো না, বুঝতো শুধু খবর আর কৌতুক-কণা। তা, কবিতায় পয়সা মিলতে পারে যদি ও-কবিতা ব্যবসায় খাটাতে পারো !...এই যেমন, ধরো, আমার মোরব্বার ব্যবসা ! সব ব্যবসায় টাকার যেমন দরকার, তেমনি দরকার বিজ্ঞাপনের এবং বিজ্ঞাপনের একটা সাহিত্য আছে...তা বোধ হয় জানো ?

শশধর কহিল,—না।

উমাচরণ কহিলেন,—কবিতায় বিজ্ঞাপন লেখো। এ পথে কবিতার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তা ও-কথা পরে হবে। আপাততঃ এই মোরব্বার গল্প-প্রতিযোগিতায় যে একরাশ ছোট গল্প পাওয়া গেছে, তা থেকে বেছে গোটা-কুড়িক ভালো গল্প একত্র করো...

শশধর কহিল,—গল্প ?

উমাচরণ কহিলেন,—হ্যা গো হ্যা...গল্প, ছোট গল্প ; কবিতা নয়। পারবে না দেখতে ?

শশধর কহিল,—পারবো।

না পারার সামর্থ্য ছিল না। এই মাতুলের আশ্রয়ে সে নিশ্চিন্ত আরামে বাস করিতেছে, তাঁর স্বার্থ যদি একটু না দেখে...

সেই দিনই গল্পের তাড়া শশধরের হস্তগত হইল। শশধর পড়া সুরু করিল।

এ এক নূতন রাজ্য! কত দিক দিয়া চিত্তের শূন্যতা ভরাইবার কি যে ইঙ্গিত! শুধু তাই ? নীরস দুনিয়া এই সব লেখার পরশে এমন সজীব সরস হইয়া উঠিল! পাশের বাড়ীতে এমন রোমান্স! মোটরে তরুণীর একটু হাসি তরুণ পথিকের জীবনকে কি অভিনব পথে চালাইয়া লইয়া যায়!...নিজেকে কত রকমের নায়ক সাজাইয়া কত দুর্গম স্থানে, কি অসুরের রাজ্যেই না ছাড়িয়া দেওয়া যায়! তা ছাড়া মস্ত আরাম এই যে, কথার মিল খুঁজিয়া দুশ্চিন্তায় জর্জ্জরিত হইতে হয় না!...কবিতার পথ গল্পের পথের চেয়ে দুর্গম!

শশধর একটা গল্প পড়িতেছিল। গল্পের নাম, 'উতল হাওয়া'। গল্পের নায়ক বকুল চাকরির খোঁজে পাগলের মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। তার মনে বসন্ত জাগিয়াছে, পাপিয়ার তানে, ফুলের গন্ধে মন আকুল উদাস ; তবু চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়াই তার দিন কাটে। বাড়ীতে বুড়া মা, বিধবা বোন, ছোট দুটি ভাই...উপায় নাই! সেদিন পথে কল বিগ্‌ড়াইয়া একটা মোটর চুপচাপ পড়িয়া ছিল, মোটরে বসিয়া এক তরুণী...তরুণীর অঙ্গে কি লাবণ্য, মুখে-চোখে কি দীপ্তি...বকুল চাকরির কথা ভুলিয়া গেল! অদূরে দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষ নয়নে তরুণীর পানে চাহিয়া রহিল ; তরুণী তা লক্ষ্য করিলেন।

প্রথমে তাঁর ঔদাস্য, পরে বিরক্তি; ক্রমে সে ঔদাস্য ঘুচিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে প্রসন্ন কৌতুকের আভাস, চোখে হাসির মৃদু কিরণ! বকুলের প্রাণ নাচিয়া উঠিল!...ইতিমধ্যে গাড়ীর শোফার আসিল, সেই সঙ্গে মিস্ত্রী এবং মোটর মেরামত হইয়া হর্ণ বাজাইয়া চলিয়া গেল। ওদিকে বকুলের আর দিন কাটে না...সেই দুটি চোখ...কাজল-কালো চোখ! পথে আরও মোটর চলে, সে-সব মোটরে বহু তরুণী...কিন্তু কোথায় সে মোটর?...সে তরুণীটি?

বড় দুঃখে তার দিন যায়...বুকে বেদনার মেঘ জমাট বাঁধিতে থাকে, সে বেদনার চাপে সারা দুনিয়া ক্রমে ছোট হইয়া আসে!...

একদিন...গোলদীঘির মোড়ে আবার সেই মোটরের সঙ্গে দেখা। মোটরে সেই তরুণী! বকুলের মনে হইল, তরুণী তার বড় চেনা প্রাণের জন, কত যুগের সঙ্গী, বন্ধু যেন! একটা কথা কহিবার জন্য বকুল একেবারে আকুল...মোটর চলিয়া গেল! বকুল তাড়াতাড়ি তার নম্বরটা মনে গাঁথিয়া ফেলিল...ও তো নম্বর নয়...যেন কোন্ নিপুণ কবির লেখা 'লিরিক' কবিতা!

আবার দিন যায়...অদর্শনের যাতনায় কাতর করুণ দিন—রৌদ্র যেন দগ্ধ করিবে, এমন তার তেজ—চাঁদ যেন কালোয় কালো...বুক তার পুড়িয়া কালি হইয়া উঠিয়াছে, আলোর উৎস যাতনার অনল-তেজে শুকাইয়া উবিয়া গিয়াছে!...তরুণীর আর দেখা মেলে না...

বকুলের শীর্ণ মূর্ত্তি, মাথার চুল দীর্ঘ, জীর্ণ বেশ। হঠাৎ আবার এক দিন সেই মোটর...শূন্য—একটা ডাক্তারখানার সামনে দাঁড়াইয়া... বকুল দাঁড়াইল। ডাক্তারখানার মধ্য হইতে শোফার আসিল, তার হাতে একরাশ ঔষধের শিশি।

বকুল কহিল,—কি খপর? কার অসুখ?

শোফার কহিল,—দিদিমণির।

দিদিমণির! সর্ব্বনাশ! সেই তরুণী নয় তো? বকুল কহিল,—আমি যাবো...

শোফার কহিল,—উঠে পড়ো গাড়ীতে...

বকুল উঠিল। গাড়ী গিয়া থামিল মস্ত এক বাড়ীর সামনে... পথে আরো দু'চারখানা মোটর—ডাক্তারদের। বাড়ীতে বিষাদের ছায়া! চোরের মত বকুল আসিয়া বাহিরের ঘরে দাঁড়াইল।... ডাক্তার বলিতেছিলেন—একটি উপায় আছে...অপরের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে দিতে পারলে...একবার শেষ চেষ্টা!

তিন-চারজন লাফাইয়া উঠিল,—আমরা দেবো রক্ত...

ডাক্তার কহিলেন,—আপনাদের রক্তে হবে না। বেরিবেরিতে ভুগেচেন সকলে। চাই বাইরে থেকে সুস্থ দেহের রক্ত...তরুণের স্বেচ্ছা-দত্ত তাজা রক্ত...

বকুল মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত...তার পর বুকে হাত রাখিল এবং তার পরক্ষণেই দম্‌কা হাওয়ার মত ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—এই বুকে আছে তরুণের তাজা রক্ত—স্বেচ্ছায় তা দিতে এসেচি...

ডাক্তার কহিলেন,—চমৎকার...বাঃ!

বুক ছিঁড়িয়া বকুল তাজা রক্ত দিল। তরুণী প্রাণ পাইয়া আরামে নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আঃ!...

বকুল ঘরের মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। বুকে বেদনা...ওঃ!

তরুণী কহিল,—কে ও?...

চোখের জল মুছিয়া তরুণীর মা কহিলেন,—ধন্বন্তরি! তোকে বাঁচাতে এসেছিল...নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তোকে বাঁচিয়েছে...

• • তরুণী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, বসিয়া বকুলের পানে চাহিল। ও মুখ... ও মুখ? কোথায় না দেখিয়াছি?...ঠিক...সেই গোলদীঘির ধারে, পথে...দুই চোখে কি আকুল নিবেদন ছিল!

তরুণী কহিল,—না, না, তোমার মরা হবে না, আমি তোমায় বাঁচাবো, এ বুকের তাপ দিয়ে...ওগো প্রিয়, দয়িত, বন্ধু...

তরুণী উঠিয়া বকুলের অবলুণ্ঠিত দেহ তুলিয়া বক্ষে ধরিল। দেওয়ালের ঘড়ি চলিতেছে টক্‌টক্-টক্‌টক্...তার পেণ্ডুলামের দুলুনির শব্দ! স্তব্ধ ঘর...শুধু সেই ঘড়িটার শব্দ...কোনো কথা নাই কারো মুখে...বহুক্ষণ...

সহসা বকুল চক্ষু মেলিল, ডাকিল—ডাক্তার বাবু...

ডাক্তার বাবু কহিলেন,—কি?

বকুল কহিল,—উনি বেঁচেছেন?

তরুণী কহিল,—বেঁচেছি। ডাক্তার বাবু এঁকে দেখুন...একটু করুণা...

ডাক্তার কহিলেন,—আর ভয় নেই। সে shock কেটে গেছে। ওঁর heart এখন all right...

তরুণী ডাকিল,—বন্ধু...

বকুল ডাকিল,—কি বল্‌চেন?

তরুণী কহিল,—যে প্রাণ বাঁচিয়েছো তোমার বুকের রক্তে...

মা কহিলেন.—সে প্রাণ তোমারই প্রাণের পরশে সঞ্জীবিত রাখো বাবা...

গল্প এইখানে শেষ।

শশধর ভাবিল, বাঃ, লেখকের খাসা মাথা! কোথায় ছিল বকুল, কোথায় বা তরুণী...কি কৌশলে লেখক দু'টি প্রেমার্ত্ত

প্রাণীর মিলন ঘটাইয়াছে!...একেই ফার্ষ্ট প্রাইজ, নগদ কুড়ি টাকা!

লেখকের নাম?...এই যে...শ্রীপিনাকীলাল পাল।

২

গল্পটি শশধরের মনে গাঁথিয়া রহিল। যে-গল্প দুনিয়া রঙীন করিয়া তোলে, সে-গল্প ভুলিবার নয়!...শশধর মোটরের হর্ণ শুনিলেই ফিরিয়া তাকায়; এবং সে মোটরে কাব্যলোক-বাসিনী তরুণীর যদি দর্শন মেলে তো সে-গাড়ীর নম্বর কবিতার খাতায় সে টুকিয়া রাখে।...বলা যায় না...দৈবাৎ যদি বুকের রক্ত দিবার প্রয়োজন হয়! মনে দ্বিধা জাগে ...দুনিয়ায় এত লোক...হঠাৎ তারি বুকের রক্ত নির্ব্বাচিত হইবে, এমন আশা কি দুরাশা নয়? তবু...! এই 'তবু'ই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তোলে! আশার নেশায় মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত রাখে!

সেদিন সন্ধ্যায় উমাচরণ আসিয়া ডাকিলেন,—শশি...

শশধর তখন জানলার ধারে বসিয়া একখানা মোটরের নম্বর আওড়াইতেছিল। নম্বর মুখস্থ, তরুণীর সুন্দর মুখখানিও মনে গাঁথিয়া আছে...কিন্তু সেই 'উতল হাওয়া' গল্পের মত ঘটনা ঘটে কি করিয়া?

সত্যকার জীবন এমন কঠিন, পদে পদে তার এত বাধা, এত নিষেধ! কি গণ্ডীর মধ্যেই না সে জীবন আবদ্ধ আছে! আর কল্পলোকের জীবন...হাবড়ার পুলের উপর হইতে গঙ্গার যে মুক্ত অবাধ ধূ-ধূ প্রসার চোখে পড়ে, তেমনি...কল্পনা একেবারে যেন এরোপ্লেনে চড়িয়া হুশ্ হুশ্ করিয়া বহিয়া চলে...কোথাও 'ট্রাফিক' বন্ধ করিতে কন্‌ষ্টেবলের হাত তোলা নাই, মোষের গাড়ী বা ছ্যাকরা গাড়ীর বাধা নাই...যেমন খুশী, যত খুশী উধাও-বেগে চলো!...

মামার আহ্বানে মন ফিরিল। শশধর কহিল,—কি ?

মামা কহিলেন,—গল্পগুলো দেখা হলো ?

শশধর কহিল,—আর দু'চার দিনে শেষ হবে।

মামা কহিলেন,—চট্‌পট্‌ শেষ ক'রে দাও। আর একটা কাজ আছে···ঐ মোটর-কারের মালিকের লিষ্ট এনেচি...ওতে বাঙালীদের নাম-ঠিকানা দেখে একখানা ক'রে আমাদের মোরব্বার বিজ্ঞাপন-ছাপা পোষ্টকার্ড ছাড়ো। বিজ্ঞাপনকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে...অমনি যতগুলো অর্ডার মেলে...

শশধর কহিল,—আচ্ছা...

মোটর-কারের মালিকের লিষ্ট ! মালিকের নাম-ঠিকানা আর গাড়ীর নম্বর—বাঃ ! শশধরের মনে একটা চিন্তা ছলাৎ করিয়া ঢেউ তুলিল !...যে-নম্বর মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে...

পাতা উল্টাইতে ঠিকানা মিলিল...টি, রয়, ১২ নং মাখন সান্যাল লেন, গড়পার !...

টি, রয় ! বিলাত-ফেরত বাঙালী ?...তাহা হইলে তো...নেহাৎ নিরীহ জীব হইবে না !

কিন্তু উদ্যোগ চাই !...ঐ গল্পের মত কোন ঘটনা...নায়িকার অসুখ...বুকের রক্ত...! শশধর ভাবিল, তার চেষ্টা চাই !

রাত্রি দশটা অবধি বসিয়া প্রায় দেড়শো ছাপানো পোষ্টকার্ডে সে ঠিকানা লিখিল।...

পরের দিন ভোরে উঠিয়া চলিল গড়পারে...টি, রয়ের গৃহের সন্ধানে !...

ফটকওয়ালা বাড়ী। এককালে শ্রী ছিল, সৌষ্ঠব ছিল। এখন তা অন্তর্হিত। ফটকের উপর একটা মস্ত সাইনবোর্ড—দি গ্রেট বেঙ্গল

মোটর ওয়ার্কস্...সাম্‌নে প্রাঙ্গণে ক'খানা ভাঙ্গা-চোরা মোটর গাড়ী পড়িয়া আছে।

ফটকের সাম্‌নে সে দাঁড়াইয়া রহিল, কতকটা উদাসভাবে। মন তখন ধূলামাটী ও স্বার্থ-হিংসা-ভরা সত্যকার জগৎ ছাড়িয়া কোন্ কল্পলোকে ঢুকিয়া পড়িয়াছে !...

একটা খোট্টা আসিয়া প্রশ্ন করিল,—কি চাই ?

শশধর চমকিয়া উঠিল, তার পর কহিল,—রায়-সাহেব আছেন ?

খোট্টা কহিল,—আছেন; আসুন।

শশধর কহিল,—চলো···

চকিতের ঘটনা ! ভিতরের ঘরে তাকে আনিয়া খোট্টা বসাইল। কহিল,—আমি বাবুকে খবর দি...

বাবু আসিলেন। কহিলেন,—গাড়ী আছে ?···

শশধরের কল্পনা তখন জাগিয়া সচেতন হইয়াছে। প্রতিযোগিতার অতগুলো গল্প পড়িয়া উদ্ভাবনী-শক্তি শাণ পাইয়াছিল। শশধর কহিল, —আজ্ঞে শুন্‌লুম, আপনার একখানা গাড়ী না কি বিক্রি আছে ?···

—কত নম্বর ?

শশধর সেই মুখস্থ নম্বর বলিল।

বাবু কহিলেন,—সে গাড়ী মেরামতের জন্য এসেছিল। ফেরত গেছে। সে গাড়ী আমাদের নয়...

শশধর কহিল,—বটে !···কার গাড়ী ?

বাবু কহিলেন,—শ্যামাচরণ বসাক।

বসাক !...শশধর মুষ্‌ড়াইয়া গেল। বসাক-গৃহে অমন...? কিন্তু কবি বলিয়াছেন, পঙ্কেই পদ্মের জন্ম ! পুরাতন শাস্ত্রবাক্য মনে জাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সে কথাটাও...সেই স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি...

শশধর কহিল,—তিনি কোথায় থাকেন ?

বাবুটি কহিলেন,—দমদমায় ।

—ঠিকানাটা যদি...?

ঠিকানা মিলিল। শশধর অদম্য উৎসাহে তখনি বাসে চড়িয়া দমদমা যাত্রা করিল ।

জীর্ণ বাগান-বাড়ী। শশধর ভিতরে ঢুকিল। ঢুকিয়া সন্ধান করিল—শ্যামাচরণ বাবু ?

জবাব মিলিল—মধুপুর গেছেন ।

মধুপুর ! সর্ব্বনাশ !

শশধর ফিরিল। পরক্ষণে আবার প্রশ্ন তুলিল—বাড়ীতে কেউ নেই ?

উড়ে মালী জবাব দিল,—মা-ঠাকরুণ আছে, দিদিমণি আছে...

—হুঁ ! বলিয়া শশধর দাঁড়াইল ।

মালী কহিল,—কাজ আছে ?

শশধর কহিল,—কাজ আছে, ভারী জরুরি কাজ ।

মালী কহিল,—আপনি বসবেন চলুন, আমি মা-ঠাকরুণকে বলি...

শশধরের বুক দুলিল। সে কহিল,—চলো···এত দূর এসে এমনি ফিরে যাওয়া...

মালী কহিল,—বাবুর ফিরতে আট-রোজ দেরী হবে। ··

কথাটা বলিয়া মালী ছুটিল গৃহিণীর উদ্দেশে। শশধর এক-তলার বারান্দায় রঙ-চটা বেঞ্চটায় বসিল ।

মালী তখনি ফিরিল। ফিরিয়া কহিল,—কি কাজ, বলুন...মা-ঠাকরুণ ঐ পাশের ঘরে আছেন...

মালী ইণ্টারপ্রিটরের মত পাশের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল। পর্দ্দার মান থাকিবে, কাজও হইবে !

কাসিয়া গলা সাফ করিয়া শশধর কহিল,—মানে, আমাদের মোরব্বার কারবার আছে...নাম শুনেচেন বোধ হয়, 'মল্লিকের মৌলিক মোরব্বা'...?

মালীর মারফৎ গৃহিণী জানাইলেন, তিনি মল্লিকের মৌলিক মোরব্বার নাম কখনো শুনেন নাই, তবে ক্রশ ব্ল্যাক-ওয়েলের জ্যাম, ব্রাউন পোলশনের ফ্রুট-জেলির পরিচয় তাঁর অবিদিত নয়।

শশধর কহিল,—সে হলো বিদেশী ফল। আমাদের এ দেশী...

মালীর মারফৎ গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, কর্ত্তার সঙ্গে যদি সে সম্বন্ধে কোনো কথা থাকে তো তিনি ফিরিলেই তা ঘটিতে পারে।

শশধর কহিল,—আপনার বাগানে যদি কোনো ফল থাকে তো উচিত মূল্যে আমরা তা নিতে প্রস্তুত আছি।

মালীর মারফৎ আবার জবাব মিলিল,—এ আবার বাগান! তবে আমড়া আছে, বেল আছে, কয়েৎবেল আছে...

শশধর কহিল,—বাঃ! খাশা হবে!...তা হ'লে আর এক সময় আসবো। ইতিমধ্যে মালীকে দিয়ে যদি একটা ফর্দ্দ করান, কত ফল গাছে পাবো...

গৃহিণী জানাইলেন—আচ্ছা।

মালীর ভাব-ভঙ্গীতে বুঝা গেল, গৃহিণী দ্বারান্তরাল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। অতঃপর দাঁড়াইয়া থাকা ভালো দেখায় না। অথচ মন বেদনার মেঘে আচ্ছন্ন। সে তরুণী বা মালী-কথিত এই দিদিমণির কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না!

শশধর প্রস্থানোদ্যত হইল। ফটকে পা দিয়াছে, গৃহাভ্যন্তর হইতে সুরের স্রোত বহিয়া আসিল...নারী-কণ্ঠে গান...

ও কেন গেল চলে'
কথাটি নাহি বলে'
মলিন-মুখী, আঁখি ভরিয়া নীরে!...

শশধর নিমেষের জন্য দাঁড়াইল। ভাবিল,—বাঃ!

৩

আবার আসিতে হইল। সেই মোটর. মোটরে তরুণী···তার ঐ গানের স্বর এবং বয়স তরুণ!

এবার শ্যামাচরণের দেখা মিলিল। ভারী ব্যস্ত মানুষ। দিবা-রাত্র ছুটাছুটি করিতেছে...একটা খবর কাণে আসিলে হয়!

মোরব্বা শ্যামাচরণের মনে সরসতার সাড়া তুলিল না। শশধর কহিল,—দেশী জিনিষ...শুধু দেশের লোকের কো-অপারেশন! তার পর বহু অর্থ আমদানী হবে বিদেশ থেকে...এবং বিদেশীকে আমাদের বাঙলা দেশের আমড়া, আঁশফল, জাম, কামরাঙা, কয়েৎবেল, করমচার স্বাদে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলবো!...বাঙলা দেশ স্বরাজের দাবী অনেকখানি অগ্রসর ক'রে তুলবে!

শ্যামাচরণ কহিল,—ও-সবে হবে না। মানুষ অত হাঙ্‌লা নয়! উদরটাকে সর্ব্বস্ব ক'রে কোনো জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা যাবে না। শ্রদ্ধা নিতে হলে কালচারের পরিচয় দিতে হবে। এই যে বিশ্ব-কবি... দেশ-দেশান্তরে এই যে বারে-বারে দিগ্বিজয়-যাত্রা করচেন, এতে কাজ এগিয়ে যাচ্ছে কত! আমরাও তাই করতে চাই...

শশধর সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে শ্যামাচরণের পানে চাহিল।

শ্যামাচরণ কহিল.—প্রাচ্য শিল্পকলার বিকাশ...ঐ যে ভারতীয় চিত্রকলা দেখিয়ে অবনীন্দ্রনাথ চমকে দিলেন whole Westকে...আমার

ছবি আঁকবার শক্তি নেই...তাই আমি অন্য ললিতকলার চর্চ্চা নিয়ে আছি !...

শশধরের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইল অদম্য কৌতূহলে।

শ্যামাচরণ কহিল,—আমি প্রাচ্য পুরাণ-ইতিহাসের সাব্জেক্ট নিয়ে নাট্য-লীলা অভিনয় করাতে চাই। এম্পায়ারের ষ্টেজ ভাড়া নিয়ে 'ব্রজলীলা' দেখিয়েচি। এবারে দেখাবো 'চন্দ্রাবলী'! শুধু মেয়েরা সাজ্‌বে···ভদ্র ঘরের সব মেয়ে···পোষাক, নাচ, দৃশ্যপট আগাগোড়া প্রাচ্য বিশেষত্বে ভরা...

শশধর বাক্যহারা ! চমৎকার মৌলিক আইডিয়া তো !

শ্যামাচরণ ডাকিল,—চকিতা...

শশধর চমকিত ! চকিতে এক তরুণী আসিয়া শ্যামাচরণের সাম্‌নে দাঁড়াইল ! গল্প-উপন্যাসে বর্ণিতা চম্পক-বরণা নায়িকার মত নয় ! না হোক, তবু বেশ-ভূষায় শ্রীতে চমৎকার পারিপাট্য !

শ্যামাচরণ কহিল,—এটি আমার মেয়ে চকিতা। ও সাজ্‌বে, আরো অন্য বাড়ীর মেয়েরা আছে...কেউ শ্রীকৃষ্ণ, কেউ বৃন্দা, কেউ শ্রীরাধা...দেখিয়ে দাও তো তোমার সে নাচটা, চকিতা। আগাগোড়া oriental grace পাবেন।

চকিতা চকিতের জন্য শশধরের পানে চাহিল। শশধরও চাহিল—চারি-চক্ষে মিলন হইল। শশধরের মন থর-থর কম্পিত হইল। সলজ্জ ভঙ্গীতে সে দৃষ্টি নামাইল ; তার পর আবার যখন চোখ তুলিল, শ্যামাচরণ তখন পিয়ানোর ধারে বসিয়াছে !

চকিতা গান ধরিল,—

আজু শেয বিছায়নু সাঁঝে...
কেশব হে, থুয়ে সব কাজে !...

তার পর নাচ…সে নাচে শশধর বিবশ, বিহ্বল হইল !

নৃত্যশেষে শশধর কহিল,—আমি টিকিট কিন্‌বো। আপনাদের প্লে কবে ?

শ্যামাচরণ কহিল--খপর দেবো। দেরী আছে। পথে প্ল্যাকার্ড পড়বে।

শশধর কহিল,—তা হ'লে আমার আর্জী ?...

শ্যামাচরণ কহিল,—ঐ মোরব্বা! না, ও-সব আমি বুঝি না, বাবু...আর্ট নিয়ে আমার কারবার !...

শশধর কহিল,—স্যাম্প্‌ল্ আছে...এই দেখুন।

ডুমুরের মোরব্বার পেট-মোটা একটা শিশি শশধর শ্যামাচরণের সাম্‌নে ধরিল। চকিতা কৌতূহলী, লোলুপ দৃষ্টিতে বোতলের পানে চাহিল, তারপর শ্যামাচরণের দিকে, এবং অবশেষে শশধরের দিকে !

উৎফুল্ল চিত্তে শশধর কহিল,—খেয়ে দেখুন আপনি।..ডুমুর অতি সুপাচ্য...প্রাচীন ভেষজ-শাস্ত্রে বলে…

শ্যামাচরণ কহিল,—শুনেছিলুম না, আপনি কবি। তা, আপনি ভেষজ-শাস্ত্র আলোচনা করচেন ?

শশধর কহিল,—দেশের দুর্ভাগ্য! এই জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশে যিনি ভেষজ-শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁকেই কবিরাজ বলে এবং ছন্দের যে কারবারী, সে রাজ্য-হীন কবি মাত্র !

শ্যামাচরণ কহিল,—কথাটা ঠিক! কিন্তু দেশের এ দুর্ভাগ্য দূর করতে হবে—পশ্চিমী হাওয়ায় পূবের যা-কিছু সংস্কারে বদ্ধ, রুদ্ধ, তাদের সে বন্ধন থেকে মুক্ত করতে না পারলে...

শশধর কহিল,—বিশাল প্রকৃতি ছেড়ে আমাকে আপাতত খণ্ড প্রকৃতি নিয়ে পশরা সাজাতে হচ্ছে !

শ্যামাচরণ ও চকিতা দুজনেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে শশধরের পানে চাহিল।

শশধর কহিল,—মল্লিকের মোরব্বার মৌলিকতা প্রচারের উদ্দেশে এই কবিতা লিখেচি...

আছে ঝড়, আছে ঝঞ্ঝা, রৌদ্র সুদুঃসহ,
পাওনাদারের উৎপাত, স্ত্রীর ক্রোধও অহরহ!
পথে পুলিশ এবং বৃষ্টি-জলে ভীষণ কাদা;
রবিবারে 'গৃহ-দুর্গাক্রমি' চাওয়া চাঁদা....
প্লেগ্ বেরিবেরি, সর্দ্দি-কাসি, মাথা-ধরা,
জ্বর ও যক্ষ্মা, বাতের ব্যাধি ভীষণ ভয়ঙ্করা;
কন্যাদায় ও চাকরি হীনে ফাঁকা দুনিয়াটা—
এ সব নিয়ে দুর্ব্বহ হয় যদি জীবন ঘাঁটা,
মল্লিকের এ মৌলিক মোরব্বা হে দিবা-রাতি,
খেতে যদি পারো—মাভৈঃ, উঠবে ফুলে ছাতি!

এমন কবিতা...মামার পছন্দ হলো না!

চকিতার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। শ্যামাচরণ কহিল,—পুলিশ, জ্বর-যক্ষ্মা...এ-সব নিয়েও কবিতা লিখতে পারো! দেখচি অদ্ভুত মাথা তোমার। মন্দ নয়। বিজ্ঞাপন-সাহিত্যও সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট দিক। তা আমাদের একটা লিখে দিতে পারো...ঐ এম্পায়ারে আমাদের চন্দ্রাবলী প্লে হবে, সেই সম্বন্ধে?

উদ্‌গ্রীব নেত্রে চকিতা শশধরের পানে চাহিয়া; শশধর চকিতার পানে চাহিবামাত্র সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। তার প্রাণে উৎসাহ জাগিল। সে কহিল,—নিশ্চয় লিখে দেবো!

৪

রাত্রে ঘরে বসিয়া শশধর চন্দ্রাবলীর বিজ্ঞাপনের কবিতা লিখিতেছিল।

উমাচরণ আসিয়া কহিলেন,—মোরব্বার বিজ্ঞাপনটা বদ্‌লালে ?

শশধর কহিল,—কবিতা কি অমনি ফরমাসে বদ্‌লানো যায়... ভাব না এলে...?

উমাচরণ কহিলেন,—বটে! তা হ'লে তুমি যা কো-অপারেশন করবে কারবারে, তা দেখতেই পাচ্ছি। গল্প-গুলো দেখে দিতে পারলে না—এ-ও পারবে না! এই ত্যাখো, আমাদের অনুকূলের ভাইপো কবিতা লিখে দেছে...

শশধরের অন্তরাত্মা ফুঁশিয়া উঠিল। তাকে ভার দিয়া আবার অন্যত্র চেষ্টা...! সে কহিল,—সেটা যদি ভালো হয়ে থাকে তো সেইটেই নেবেন...কিন্তু আমার কবিতায় রস ছিল।

উমাচরণ কহিল,—অত লোভের কথায় লোকের সন্দেহ হয়। গরু হারালেও তার সন্ধান দেবে মোরব্বা ?

শশধর কহিল,—মোরব্বার এমনি সুবাস! এতে সর্ব্বতোমুখী গুণব্যাখ্যা হচ্ছে।

উমাচরণ কহিলেন,—তুমি পাগল!...গল্পগুলো ফেরত দাও... অনুকূলের ভাইপোর হাতে দেবো।

শশধর কহিল,—তাই দেবেন।...

গল্পের বাণ্ডিল লইয়া উমাচরণ চলিয়া গেলেন। শশধর কবিতা লেখায় মনঃসংযোগ করিল।...

পরের দিন আবার সেই দমদমার বাগান। শ্যামাচরণ কহিল,— কবিতা হয়েচে ?

শশধর কহিল,—খশড়া করেচি...একটু কাট্‌কুট্‌ ক'রে...

শ্যামাচরণ কহিল,—বসো, আমি একটু ব্যস্ত আছি।...

অদূরে বাগানে কে ফুল তুলিতেছিল...! গাছের ডাল নড়িতেছে! কে ও?...চকিতা!

শশধর সন্তর্পণে শ্যামাচরণের সান্নিধ্য ছাড়িয়া বাগানে আসিল। মালতীর ঝাড়ে প্রচুর ফুল! শশধর কহিল,—পেড়ে দেবো?

চকিতার গালে চকিতে গোলাপ ফুটিল। অনুপম শোভা! এমনি শোভায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবি চিরদিন বিমুগ্ধ! শশধরও কবিতা লেখে, সুতরাং...

চকিতা মৃদু হাসিয়া কহিল—ওপরের ডালে নাগাল পাচ্ছি না।

শশধর কহিল—আঁকশি নেই? ..

পাশে একটা পেঁপে গাছ। তার পত্র-সমেত দুটা ডাল গাছের তলায় পড়িয়াছিল। শশধর সেই ডাল দুটা একত্র করিয়া মালতীর ঝাড়ে আঘাত করিল। কতকগুলা পাপড়ি-ঝরা ফুল শাখাচ্যুত হইয়া ভূমে লুটাইল।

চকিতা কহিল,—আপনি না কবি! আপনার প্রাণে বাজলো না—ঐ ফুলের গায়ে আঘাত করতে!

কথায় আছে, লজ্জায় এতটুকু! শশধরের ঠিক সেই দশা! শশধর চারিদিকে চাহিল,—বাগান যেন মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। আঁকশি বানাইবার যোগ্য একটা শুষ্ক ডাল, বা কঞ্চি? চিহ্নমাত্র নাই!

অদূরে পাথরে-রচা একটা জীর্ণ বেদী এক কালে বিলাসের মঞ্চ ছিল; এখন দৈন্য-দুর্দ্দশাগ্রস্ত। চকিতা তার উপর বসিল, ডাকিল—মালী...

সেই মালীর প্রবেশ। চকিতা কহিল,—বেশ তাজা দেখে দু'চার থোলো ফুল পেড়ে দে...

মালী ফুল পাড়িতে উদ্যত হইলে শশধর চকিতার পানে চাহিল। ফশ্ করিয়া বলিল.—আপনার চমৎকার গলা, আর নাচও যা দেখলুম...

হাসিয়া চকিতা কহিল,—অপূর্ব্ব...না ?

ঘাড় নাড়িয়া শশধর কহিল,—তাই।

চকিতা কহিল,—বাবার কাছে শিখেচি।

শশধর কহিল,—আপনার বাবা এক জন আর্টিষ্ট।

চকিতা কহিল.—বাগান থেকে চালতা নিয়ে গেলেন সেদিন, তার মোরব্বা হলো ? কৈ, দিলেন না তো ..!

শশধর কহিল.—মামার কাছ থেকে মোরব্বা তৈরীর প্রণালী এখনো শিখিনি...শিখলেই তৈরী ক'রে দেবো.

চকিতা কহিল—আপনাদের মোরব্বা বেশ ভালো. তবে মিষ্টি ওতে আর-একটু কম দেবেন। বিলিতি ফলে ওরা ফলের মৌলিক স্বাদটুকু বাজায় রাখে। আপনারা যদি সেটুকু না পারেন, তা হ'লে বিলিতির বাজারে পশার করতে পারবেন কেন ?

ঠিক কথা। মামার মোরব্বার কোথায় যেন একটু ত্রুটি বোধ হইত! কিন্তু সে বুঝিতে পারে নাই যে...

সকালের স্নিগ্ধ মৃদু বাতাস চকিতার কেশে দোল দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল!...শশধরের বুকের মধ্যে রাজ্যের ভাব প্রকাশের যোগ্য ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছিল না, ঐ কেশের দোলার সৌন্দর্য্য-সুষমা প্রকাশের! প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় তার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

সহসা চকিতা কহিল,—আপনাদের অনেক পয়সা আছে...না ?

শশধর কহিল,—আমার নয়, মামার কিছু পয়সা আছে; আর আমিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী।

চকিতা কহিল,—আপনি কি করেন?

শশধর কহিল,—কবিতা লিখতুম। এখন মল্লিকের মৌলিক মোরব্বার কারবার দেখি...

তার পর কি যে মনে হইল, শশধর ফশ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল—আপনার যখন বিয়ে হবে, তখন একটি কবিতা লিখবো, সাধ আছে।

তাচ্ছীল্য-ভরে চকিতা কহিল,—বিয়ের আমার ইচ্ছা নেই!...

কথা এমন অদ্ভুত যে শশধর অবাক্!...সে ভাবিয়াছিল, ঐ কথাকে অবলম্বন করিয়া মস্ত আলোচনা জুড়িয়া দিবে এবং মাসিক-পত্রে ছাপা গবেষণামূলক প্রবন্ধের তলায় ছোট অক্ষরে ছাপা ফুটনোটের মত তারি মধ্যে এক সময় নিজের প্রাণের নিশ্বাসটুকু...

কিন্তু সে রঙীন আশা সাবানের ফেনার মত ফাটিয়া চূরমার হইয়া গেল!

দুপুরবেলায় মামার প্রীতি-আহরণের চেষ্টায় শশধর আবার সেই বিজ্ঞাপন-লেখা পোষ্টকার্ড ও ডিরেক্টরী লইয়া বসিল। দেখিয়া মামা বলিলেন,—থাক, আর ডাকটিকিট নষ্ট করতে হবে না। মাঠে আজ ম্যাচ আছে...কতকগুলো জার নিয়ে সেখানে যদি চেষ্টা দেখতে!...প্রচার, প্রচার, প্রচার চাই...এই যে স্বদেশীর দুন্দুভি বেজেছে! এই ফাঁকতালে...

চেষ্টা? কিন্তু মানুষের সব চেষ্টা কি ফলবতী হয়?...

বেচারা শশধর...তার মোরব্বা মাঠে বিক্রয় হইল না। মাঠে সকলে চীনা-বাদাম কিনিতে ব্যস্ত...দু'চার পয়সায় প্রচুর মেলে। তা ছাড়া

একজন বলিল,—রস জব্ জব্ করচে ..হাত চট্ চট্ করবে...মাঠে মোরব্বা খাবে কে, বাপু ?...

নৈরাশ্য এবং সেই সঙ্গে জারের বোঝা বহিয়া শশধর মাতুলালয়ে ফিরিল।

মাতুল কহিলেন,—পারো নি ?

শশধর কহিল,—না। হাত ধোবার জন্য এক বাল্‌তি জল নিয়ে গেলে বোধ হয় হতো...

মাতুল কহিলেন,—অনুকূলের ভাইপো দশটা জার বেচে এসেছে—শেয়ালদা ষ্টেশনের মোড়ে গেছলো...

রাত্রে বহু চিন্তা তার মাথার মধ্যে তাল পাকাইয়া উঠিল। গোল বাধিয়াছে...এবং সে গোল বাধাইয়াছে ঐ চকিতা।...শুধু সাহস...একটু সাহস...

পরের দিন অপরাহ্নে শ্যামাচরণ কি লেখাপড়া করিতেছিল, শশধর আসিয়া কহিল,—একটা কথা আছে...

শ্যামাচরণ মুখ তুলিল, কহিল—কি কথা ? আমাদের প্লে এই সাম্‌নে জুন মাসে !

শশধর একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—মানে, চকিতাকে আমি বিবাহ কর্‌তে চাই !

বিবাহ ! শ্যামাচরণ শশধরকে ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল। বীজাণুতত্ত্ববিদ্ যেমন করিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষা করেন, তেমনি ভাবে...তার পর কহিল,—তোমার যোগ্যতা আছে তার ? মানে, বিষয়-বৈভব ?...

জগৎ শূন্য হইয়া গেল...স্কুলের সেই রং-চটা গ্লোবটার মত !

শ্যামাচরণ কহিল,—নারীর পাণিগ্রহণ করার যোগ্যতা যে পুরুষের থাকে, সেই শুধু নারীর পাণি কামনা করতে পারে, সকলে নয়। সে-কালে নারীর পাণিগ্রহণ করতে কত যুদ্ধ, কত বিগ্রহ করেচে পুরুষ। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে পাবার যোগ্য হয়েছিলেন, অতগুলো রাজাকে হারিয়ে! কি প্রচুর রক্তপাত! রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করেছিলেন! নারীর পাণির কি মূল্য, তা সেকালের পাত্র বুঝতো. একালে অপদার্থের দল খাট-বিছানা, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, রূপোর-দান, নগদ যৌতুকের ঘুষে তুষ্ট ক'রে বর আনে মহাসমাদরে। এরা বর, না, বর্ব্বর! পুরুষ কামনা করবে নারীকে, আর নারীকে গ্রহণ কর্‌বে যোগ্যতায় পরিচয় দিয়ে। তুমি জানো. আমি Orient cultureএর ভক্ত...সুতরাং আমি কোনোদিন আমার মেয়ের জন্য পাত্রের সন্ধানে বেরবো না—যৌতুকের লোভ তুলে। আমার মেয়েকে যে বিবাহ করবে, সে তার যোগ্যতার পরিচয় দেবে, তবে...

শশধর কহিল,—কিন্তু কালের পরিবর্ত্তন হয়েচে। স্বয়ম্বর-প্রথা বিলুপ্ত...তা ছাড়া আমাদের ঘোড়া নেই,—অস্ত্র নেই—কাজেই যোগ্যতার পরিচয়...

তার মুখের কথা লুফিয়া শ্যামাচরণ কহিল,—বর যোগ্যতার পরিচয় এখন দেবে তার ধন-সম্পদে। ব্যাঙ্কে প্রচুর ক্রেডিট্ এবং মোটর প্রভৃতির মালিকানী যোগ্যতার পরিচয় ব'লে আমি গ্রহণ করবো..

নৈরাশ্যে মন ঝাঁজিল। শশধরের যত কথা এ ইঙ্গিতে বাধা পাইয়া থামিয়া গেল।...সে সেই মালতী-ঝাড়ের পিছনে গিয়া বসিল। চকিতা সেখানে ছিল না; উপরের ঘরে বসিয়া গান গাহিতেছিল,—

পাখী তুই ডাকিস্ কেন অমন সুরে!
মন আমার দিকে দিকে মরে ঘুরে!

শশধর বুঝিল, এ সেই 'চন্দ্রাবলী' নাট্যলীলার গান! সে ঊর্দ্ধে আকাশের পানে চাহিল, দুটো কাল মেঘ ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে। নীচে দীঘির পানে চাহিল, জলে ছোট ছোট ঢেউ—মালী দীঘির জলে তার কোদাল ধুইতেছিল...তারি ফলে!...নিজের মনের পানে সে চাহিল, সেখানে ছোট ছোট মেঘের ছুটাছুটি, আর অমনি ঢেউ...শশধর নিশ্বাস ফেলিল, তার প্রাণে বৈরাগ্য জাগিল!...

কিন্তু পা উঠিতে চায় না...সন্ধ্যা আঁধারের অবগুণ্ঠন দিকে দিকে মেলিয়া ধরিতেছিল...সহসা চকিতার কণ্ঠস্বর—আপনি ঠায় এখানে চুপ ক'রে ব'সে আছেন?

শশধর মুখ তুলিয়া চাহিল...আবার যেন দিকে-দিকে আলোর আভাস...

চকিতা কহিল,—আমি বহুক্ষণ থেকে দেখ্‌চি, আপনি এমনি ব'সে আছেন—হলো কি?

করুণ দীন নয়নে শশধর চকিতার পানে চাহিল! তার পর কহিল,—একটু যদি বসেন তো বলি...

চকিতা বসিল, কহিল—বলুন...

শশধর কহিল,—আমি...আমি...আমি...

তার কথাগুলা ষ্টেজের নাটকের নায়কের মত বাধিয়া যাইতেছিল! চকিতা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তোৎলা হলেন কবে থেকে? স্পষ্ট ক'রে বলুন...

শশধর কহিল,—আপনার বাবার কাছে এক মস্ত দুরাশার কথা তুলেছিলুম...

চকিতা কহিল,—দুরাশা! এরোপ্লেনে চড়ার কল্পনা...?

শশধর কহিল,—সেটা এখন আর দুরাশার বস্তু নয়...অনেকে চড়ছে! তা নয়..

—তবে?

শশধর কহিল,—আপনার পাণি-লাভের প্রস্তাব...

চকিতা নিমেষের জন্য স্তব্ধ থাকিয়া কহিল,—বাবা কি বল্‌লে?

শশধর শ্যামাচরণের অভিপ্রায়ের রিপোর্ট দিল...তার প্রতি কথা, প্রতি বর্ণ! শ্যামাচরণ উপস্থিত থাকিলে শশধরের স্মৃতিশক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন!

চকিতা কহিল,—কথাটা ঠিক! বিবাহ করতে গেলে যোগ্য পাত্রকেই বিবাহ করা উচিত—আর সে যোগ্যতার পরিচয় তার সম্পদে!

শশধরের বুকে ছুরির আঘাত বাজিল। শশধর কহিল,—আর এই কবিত্ব-শক্তি—যা একান্ত দুর্লভ বস্তু...?

চকিতা কহিল,—দুয়ের আমি সমন্বয় চাই...সেইজন্য আমার পছন্দ...অর্থাৎ যদি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মত পাত্র পাই, অমনি কবিত্বের আর ধনের প্রাচুর্য্য...

শশধর কহিল—তা তো সম্ভব নয়! তার স্বরে হতাশা এবং শ্লেষ...

চকিতা কহিল—সে জন্য অপেক্ষা করবো। যে আধুনিক সাহিত্য মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে...

শশধর অভিমানে-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—অর্থহীন কবি কি ভালোবাসতে পারে না?...

চকিতা কহিল,—পারলেও নারীর তা কাম্য নয়!...

এ কথার পর আর বসিয়া থাকা চলে না। শশধর উঠিল এবং মাতালের মত টলিতে টলিতে নিষ্ক্রান্ত হইল।...

তার মনে আগুন জ্বলিতেছিল, ঐ অর্থ-সম্পদ...দুনিয়ার কোনো দিকে তাকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দিবে না। তার মনে হইল, ধনীর তোষাখানা সে এই দণ্ডে লুঠ করিয়া সাফ করিয়া দেয়! কিন্তু হায় রে, তা হয় না...হয় না!...

৮

মাতুল প্রাক্‌টিকাল মানুষ! কবিতার কদর তিনি করেন, যদি সে কবিতা তাঁর ব্যবসার কাজে লাগে! শশধরের লেখা মোরব্বার কবিতা তাঁর পছন্দ হয় নাই; অনুকূলের ভাইপো চার লাইনে যে কবিতা লিখিয়া দিয়াছে, তা একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশ!

সকালে মুখখানা হাঁড়ি করিয়া শশধর বসিয়াছিল...বসিয়া দুনিয়ার উপর প্রাণের অভিশাপ বর্ষণ করিতেছিল। উমাচরণ আসিয়া কহিলেন,—পারলে না কবিতা লিখতে? এই দ্যাখো অনুকূলের ভাইপোর কবিতা,—

মাতুল উচ্ছ্বসিত আনন্দে কবিতা পড়িলেন—

মিছে মোটরের সখ, পোষাকের ছব্বা—
বিনা মল্লিকের হায় মৌলিক মোরব্বা!
ডাক্তার-বদ্দিতে কভু পশিবে না গেহ—
এ মোরব্বা খেলে চির রোগহীন দেহ!...

কবিতা শুনিয়া শশধর ফুঁশিয়া উঠিল, কহিল,—ওর না আছে ছন্দ, না আছে ভাব!

মাতুল কহিলেন,—ছন্দ না থাক্, মানে আছে। আর সব কথা পরিস্ফুট নাই হলো, বাপু...আর্টের শ্রেষ্ঠতা সেইখানে, যেখানে ভাবের

অংশ প্রচ্ছন্ন থাকে... আমিও একদিন দৈনিক কাগজ বার করতুম— সাহিত্যসম্বন্ধে আমায় একদম্ আনাড়ী ঠাউরো না...

কাল দমদমায় বাণের খোঁচা খাইয়া একেই সে জর্জ্জরিত, তার উপর সকালে মাতুলের কথায়ও তেমনি বাণ! .. বৈরাগ্যবাসনা বৰ্দ্ধিত হইল।...

নিঃশব্দে উঠিয়া সে ছাদে পায়চারি করিয়া বেড়াইল, বুঝি, আপনার সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া লইবার উদ্দেশ্যে... তার পর যথাসময়ে স্নানাহার সারিয়া সে বাড়ীর বাহির হইল।

গড়ের মাঠে ঘুরিয়া সে বেঞ্চে বসিল। রাজ্যের দুর্ভাবনা বুকের উপর যেন পাহাড়ের ভার চাপাইয়াছে! নৈরাশ্যের প্রবল দাহ...! চকিতা, শ্যামাচরণ, উমাচরণ···তিন জনে তার জীবনটাকে ছন্নছাড়া করিয়া দিয়াছে!...বিশেষ করিয়া ঐ শ্যামাচরণ, আর উমাচরণ...এ দুই চরণের চাপে তার হাড়-পাজ্‌রাগুলা অবধি চূর্ণ হইবার উপক্রম!... সহসা একটি ভদ্রলোক আসিয়া ডাকিলেন,—শুনচেন...?

শশধর মুখ তুলিয়া চাহিল—তার সাম্‌নে খাকী-হাফ প্যাণ্ট ও খাকী সার্টের উপর গলা-খোলা কোট গায়ে চড়ানো, মাথায় শোলা হাট...এক মূর্ত্তি...!

মূর্ত্তি কহিল,—যদি কিছু মনে না করেন, তো একটা কথা বলি...

শশধর আশ্চর্য্য কৌতূহল-ভরে কহিল,—বলুন...

মূর্ত্তি কহিল,—আমি হচ্ছি দি মাদ্রাজ-বোম্বে-বেঙ্গল-পাঞ্জাব কো-অপারেটিং মুভি প্রোডিউসার্শের ম্যানেজিং ডিরেক্টর...

নামটার দৈর্ঘ্যে শশধর চমকিয়া উঠিল। কথার প্রথমাংশ শুনিয়া সে ভাবিয়াছিল, কংগ্রেসের জন্য বুঝি আন্তর্জাতিক কি গানের পরিকল্পনা চালাইবে! কিন্তু না, মুভি, চলচ্চিত্র!

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কহিলেন,—আপনার মুখে হতাশার চমৎকার ছায়া ফুটে আছে...আপনার মুখ হলো, যাকে বলে film face... আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করবেন? আধ পার্সেন্ট লাভের বখরা আর ফ্রী বোর্ড, ফ্রী লজিং...জানেন, ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্, চার্লি চ্যাপলিন...এঁদের আয়ের বহর...?

হোয়াইট-এ্যাওয়ে লেডল'র দোকানের ঘড়িওয়ালা গম্বুজটার পানে শশধর চাহিল। বেলা দুটা বাজিয়া গিয়াছে...। সহসা...ঘড়ির কাঁটা দু'টা দুখানি সুগোল হাতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা উবিয়া গেল এবং তার স্থানে রবি-বর্ম্মার আঁকা মাথায় অপরূপ টোপর-পরা সেই লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ফুটিল!...তাঁর আঁচল...সেলের মস্ত নিশানটা হাওয়ায় দুলিতেছিল...শশধর দেখিল, ও নিশান নয়, যেন দেবীর অঞ্চল! শশধর ভাবিল, তার নৈরাশ্যের দাহ স্বর্গলোকে ঝাঁজ ফুটাইয়াছে...চকিতার অমন নির্ম্মম আচরণে, তাই দেবীর প্রাণে চকিত-করুণা জাগিয়াছে...

শশধর কহিল,—আমি রাজী। মাহিনা কি দেবেন?

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কহিল,—মাহিনা আমরা দিই না। খাওয়া-পরা পাবেন ফ্রী, আর লাভের উপর আধ পারসেন্ট বখরা। আমাদের ছবি যা তোলা হবে, তার advance show contract হয়ে আছে বেলজিয়ামের সঙ্গে, বোর্ণিওর সঙ্গে, ল্যাপল্যাণ্ডের সঙ্গে...তা ছাড়া নর্থ পোল, সাউথ পোলে যে অভিযান গেছে, তাঁদের চিত্ত-বিনোদনের জন্য আমাদের ফিল্মই সেখানে দেখাবো। Sole rights...বাঙালীর এমন সৌভাগ্য কবে হয়েচে?

শশধর কহিল,—ছবি তোলা হয়েছে?

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কহিল,—এখনো হয়নি। আর্টিষ্ট খুঁজচি... তার পর আর্টিষ্টদের নিয়ে যাবো সিরাজগঞ্জে...ফিল্মের ফার্ষ্ট শীন

ওখানকার পাটের ক্ষেতে। ফিল্মের নাম 'পাটেশ্বরী'। ডবল্ উদ্দেশ্য আমাদের, পাটে লক্ষ্মী। ছবিতে দেখ্‌বে পাশ্চাত্য জগৎ... পাটের ক্ষেতে ভারতের কি মণি-মাণিক্য...আর ভারত দেখ্‌বে পাটে তার কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে...এর সাফল্য সুনিশ্চিত!

শশধর কহিল,—আমি রাজী আছি।...থাকবার আশ্রয় মিলবে?

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কহিলেন,—আমরা আছি বাগনানে। simple জীবন-যাত্রা...studyর কাজ চলেছে...তার পর ষ্টুডিয়ো খুল্‌বো...

শশধরের এখন মনের অবস্থা এমন যে, যদি কেহ আসিয়া তাকে বলিত, আলিপুর জুয়ে আশ্রয় মিলিবে তো তাহাতেও সে রাজী হইত! সংসারে সে যে আঘাত পাইয়াছে···বাগনানের ষ্টুডিয়ো তার কাছে স্বর্গ···

ম্যানেজিং ডিরেক্টর কহিলেন,—কন্‌ট্রাক্ট সই করবেন, চলুন। আমাদের উকীল আছেন···রেজেষ্ট্রি অফিসেই তাঁর কাজ-কর্ম্ম...দলিল-পত্রের ব্যাপার কি না...

শশধর কহিল,—বেশ!··

কোম্পানীর কারবার দেখিয়া শশধর বিস্মিত হইয়া গেল। আর্টিষ্ট অনেকগুলি...ফ্রী বোর্ড আর লজিং, এবং ঐ আধ পারসেণ্ট নেট্ লাভের আশায় সকলেই মহা-খুশী! ট্রেণে থার্ড ক্লাশে যাত্রা... কেহ ভিড়ের কথা তুলিলে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলেন,—গান্ধীজীর আদেশ মেনে চল্‌তে চাই—plain living and high thinking —ভারতের সেই সনাতন আদর্শেই শুধু মুক্তি! তা ছাড়া study·· মনুষ্য-চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ···

সিরাজগঞ্জ, কালীঘাট, বাগনান, উলুবেড়ে, বাঁশবেড়ে প্রভৃতি জায়গা ঘুরিয়া দু' বছরে দু'খানি ছবি তোলা হইল—প্রথম ছবি

"পাটেশ্বরী", দ্বিতীয় ছবি "খাঁচার বাঘ।" ছবি তোলা হইবার পর টাকার টান পড়িল।..ছবির 'পশিটিভ' আর তৈরী হয় না...

আর্টিষ্টের দলের অবস্থা প্রায় সত্যাগ্রহীদের মত...দলে বিদ্রোহ জাগিল...দু'চার জন টাকা ভাঙ্গিল। শশধর মাতুলের কাছে বহু মিনতিপূর্ণ নিবেদন জানাইয়া পত্র দিয়া গোটা কয়েক টাকা সংগ্রহ করিল এবং অবিলম্বে সে টাকা লইয়া ষ্টেশনে গিয়া টিকিট কিনিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিল...

হাবড়ায় পৌঁছিয়া হাঁটা-পাড়িতে মাতুল-ভবনের অভিমুখে সে যাত্রা করিল।...

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে প্রকাণ্ড ভিড়!...তার লগেজের মধ্যে ছিল, বিলাতী ক'খানা ফিল্ম্ ম্যাগাজিন।...ভিড় দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। অদূরে বিচিত্রবর্ণের খদ্দর-ভূষণা একদল মহিলা...এবং তাঁদের ঘিরিয়া ভিড়!...ব্যাপার কি?

এক পথিকের কথা কানে গেল।—মেয়েরা বন্দে মাতরম্ গান গেয়ে স্বদেশী-প্রচারে বেরিয়েচেন!

বিস্ফারিত নেত্রে শশধর দেখিতে লাগিল...খদ্দর-পরা নারী-অক্ষৌহিণী! চমৎকার দৃশ্য! পৌরাণিক যুগের মহীয়সী ললনাবৃন্দের কথা তার মনে জাগিল...

সহসা সে দেখে, ও-দলে...এ কি? চকিতা!...তার পরণে খদ্দর...মুখে বাণীর বন্যা...

শশধর ভিড় ঠেলিয়া চকিতার কাছে গেল..ডাকিল,—চকিতা দেবী...

চকিতার বক্তৃতা শেষ হইয়াছিল। চকিতা কহিল,—শশধর বাবু!...

নারী-অক্ষৌহিণী ওদিকে নব-দুর্গ-আক্রমণে যাত্রা করিল।…

চকিতা কহিল,—কি করচেন?

শশধর কহিল,—ফিল্মের কাজ, আধ পার্সেণ্ট লাভের বখরা। চকিতা দেবী…

চকিতা কহিল,—কি?

শশধর কহিল,—আপনার বাড়ীর খপর ভালো? আপনার বাবা?…

চকিতা কহিল,—বাবা Oriental থিয়েটার ছেড়েচেন, 'প্রাচ্য জ্ঞানের কাহিনী' বই লিখচেন।

শশধর কহিল,—আপনার বিবাহ হয়েচে?

চকিতা কহিল,—বিবাহ করিনি।

শশধর কহিল—রাজপুত্র আসেন নি তাঁর যোগ্যতা নিয়ে?…

চকিতা কহিল,—রাজপুত্রে রুচি নেই। দুর্ভাগা ভারত… বিলাস-ভূষণ বিসদৃশ ব্যাপার। দারিদ্র্যেই সুখ, দারিদ্র্যেই শান্তি…

শশধরের বুক দুলিয়া উঠিল—আশার স্পন্দন!…

শশধর কহিল,—আমি অতি-দরিদ্র…এবং…

চকিতা কহিল,—আসুন, বিবাহ-বাসনা ত্যাগ করুন.. দাস-বংশ বৃদ্ধি করায় কোন লাভ নেই ..শুধু নব-নব- দুঃখ-সংগ্রহ . মহাত্মা গান্ধীর জয়!…

শশধর বিস্মিত…তার বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

চকিতা কহিল,—বিবাহ করতে হয় যদি তো মহাত্মার মত ত্যাগী, নির্লোভ দেশব্রতী…

তার কথা শেষ হইল না। প্রচারিকা-দল অগ্রসর হইয়া গিয়া হাঁকিল,—বন্দে মাতরম্…

চকিতা কহিল,—বন্দে মাতরম্...

বলিয়া সে দলে গিয়া মিশিল।...

শশধর বিস্ময়ে স্তম্ভিত! সেই চকিতা...!

দুনিয়া ঘুরিতেছে, ভূগোলে লেখা আছে! তা বলিয়া এমন ঘোরা!...দু'বছরে...আশ্চর্য্য!...কিন্তু চমৎকার...চমৎকার দৃশ্য! অপরূপ!...শশধর দাঁড়াইয়া চক্ষু ভরিয়া সে দৃশ্য দেখিতে লাগিল... বাঃ! তার বিবাহের বাসনা, ক্ষুদ্র প্রণয়-রোমান্স ঐ খদ্দরের তলায় অদৃশ্য হইয়া গেল!

ছবি

অপ্রকাশ বলিল,—ছেলেমানুষের মত কাঁদতে বসলে তুমি! ছি, সুরো—

সুরো চোখের জল মুছিয়া কহিল,—না, কাঁদবে না! আমার বুঝি মন কেমন করবে না? একলাটি—বা রে!

অপ্রকাশ কহিল,—সাতটি দিন শুধু—এ সাত দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে! আমায় রোজ তুমি চিঠি লিখো—

সুরো কহিল,—আমি লিখতে পারবো না।

সুরো স্বামীর পানে চাহিল। অপ্রকাশের দুই চোখে হাসির ঝিলিক! সুরোর চোখে জল আবার উথলিয়া উঠিল।

সুরো এখানে চার মাস আসিয়াছে। অপ্রকাশ ল' পাশ করিয়া এ ক'মাস বাড়ীতে আছে। তরুণ বয়সের কাব্য-মাধুরী নিঃশেষে দু'জনে উপভোগ করিতেছিল। সে হাইকোর্টে ওকালতি করিবে—সনদ বাহির হইয়াছে। তাই একবার গিয়া বাসার বন্দোবস্ত করা দরকার। তার পর কথা আছে, সস্ত্রীক সেই বাসায় গিয়া উঠিবে। বিধবা মা...তিনি ঠাকুর ফেলিয়া, ঘর ফেলিয়া কি করিয়া এখন যান। তবে পরে যদি সুবিধা করিতে পারেন, যাইবেন। তা ছাড়া মাঝে মাছে তিনি তাদের বাসায় গিয়া দু-চারদিন থাকিয়া আসিবেন বৈ কি।

কাল সকালে অপ্রকাশ কলিকাতায় যাইবে। রাত্রিতে স্বামি-স্ত্রীতে বসিয়া সেই কথাই হইতেছিল।

স্বরো বলিল,—সাত দিন কেন থাকবে তুমি? বাসা বুঝি এক দিনে দেখে ঠিক করা যায় না?

অপ্রকাশ কহিল,—শুধু বাড়ী ঠিক করাই নয় তো—টেবিল-চেয়ার কেনা, বই কেনা, সব গোছ-গাছ করে নিতে হবে তো! তার পর তোমার জন্য একটি ঝীয়ের দরকার—তাও ঠিক করে আসবো।

স্বরো কহিল,—ঝীয়ের কোনো দরকার নেই।

অপ্রকাশ কহিল,—পাগল! তা কখনো হয়! আমি কোর্টে বেরিয়ে যাবো, তুমি একলা থাকবে?

স্বরো কহিল,—একটা চাকরে খুব হবে। এখান থেকে নিমাই যাচ্ছে তো।

অপ্রকাশ কহিল,—তা হলেও ঝী দরকার। কথা কবার জন্য। লক্ষ্মীটি, আমার স্যুটকেশটা গুছিয়ে দাও—তোমার জন্যে খুব ভালো ভালো বই কিনে আনবো'খন।

স্বরো কহিল,—আমার বই দরকার নেই। স্যুটকেশ গুছিয়ে রেখেচি।

অপ্রকাশ কহিল,—কি কি দিলে, দেখি এসো—

অপ্রকাশ উঠিয়া স্যুটকেশ খুলিল। জামা, কাপড়, রুমাল, সাবান, সেভিং-কেশ, আয়না চিরুণী, ব্রাশ, টুথ পেষ্ট, টুথ-ব্রাশ মায় সেণ্ট—কোথাও এতটুকু ত্রুটি নাই। রবি বাবুর দু'খানা নূতন বই পর্য্যন্ত স্বরো স্যুটকেশে পূরিয়া দিয়াছে।

অপ্রকাশ সাদরে স্বরোর অধরে চুম্বন করিয়া কহিল,—গৃহলক্ষ্মী তো একেই বলে।

স্বরো কহিল,—সারাদিন কি করবে? এত সাত দিন?

অপ্রকাশ কহিল,— কত ঘুরতে হবে, তার ঠিক আছে।

প্রথমে একটা বাড়ী— যাঁর কাছে আর্টিকেল ছিলুম, তাঁর বাড়ীর কাছে বাসা হলেই ভালো হয়, না হলে আমার সাধ বালিগঞ্জ এভিনিউয়ে থাকা—খাশা সব বাড়ী হয়েছে। সেখানে পথে তোমরা হেঁটে বেড়াও, কেউ কোনো কথা বলবে না, ভিড় নেই, কোনো ঝামেলা নেই, কাছেই লেক্...একেবারে স্বপ্নপুরী।

সুরো কহিল,—রোজই এমনি ঘুরবে ? সব সময়েই ?

অপ্রকাশ তার কপোলে মৃদু করাঘাত করিয়া কহিল,—পাগল ! তার পর ফার্ণিচার কেনা, বই কেনা, বাড়ীটা একটু গুছিয়ে রাখা, কোর্টের জন্য গাউন তৈরি করানো—এ সব আছে তো।

সুরো কহিল,—রাত্রে তো দোকান খোলা থাকবে না ?

অপ্রকাশ পত্নীর পানে চাহিয়া কহিল,—বন্ধুবান্ধব আছে, একটু দেখাশুনা করা আছে—দু'চারজন মুরুব্বি পাকড়াতে হবে, মক্কেল পাওয়া যায় যাতে ! তার পর রাত্রে তোমার কথা চিন্তা—

সুরো কহিল,—হ্যাঁ, আমায় মনে থাকবে কি না ! অত কাযের ভিড়..

অপ্রকাশ কহিল,—তুমি ইলার কথার প্রতিধ্বনি তুলছো—রাজা-রাণীর ইলা—

টেবিলের উপর সুরোর সদ্য-তোলা ফটো পড়িয়াছিল। অপ্রকাশ তা লক্ষ্য করিল, কহিল,—তোমার ঐ ফটোটি দাওনি যে ! এটি দাও, এর সঙ্গেই কথা কবো, এ'কে কত আদর করবো !

সুরো কহিল,—যাও—ও ছবি নিতে হবে না। ছবিকে আদর করলে আমার দুঃখ ঘুচবে কি না...চোখে তার জল আসিল।

অপ্রকাশ কহিল,—দেবে না ছবি ?

স্বুরো হাসিয়া ছবিখানা লইয়া সুটকেশে রাখিল। অপ্রকাশ ছবিখানা তুলিয়া বুকে ছোঁয়াইল, তার পর গালে। চুম্বনের পর চুম্বন বর্ষণে ছবিখানাকে সে অভিষিঞ্চিত করিয়া তুলিল।

হাসিয়া স্বুরো কহিল,—খুব হয়েচে! খুব হয়েচে! আমার সাম্‌নে একটু নয় উচ্ছ্বাস কমই করলে! আমার বুঝি হিংসে হয় না?

হাসিয়া অপ্রকাশ কহিল,—হিংসে কেন? এ কি তোমার সতীন?

স্বুরো কহিল,—সতীন বৈ কি!

বটে! বলিয়া অপ্রকাশ ছবি রাখিয়া স্বুরোকে বাহু-বন্ধনে বদ্ধ করিল এবং তার লজ্জারক্তিম কপোলে, অধরে—

আনন্দের আতিশয্যে স্বুরো অভিভূত হইয়া পড়িল। সে কহিল,—সাত দিন—অন্‌-এ-ক দিন, অত দেরী করো না—একটু শিগ্‌গির—

অপ্রকাশ কহিল,—তিন দিনে যদি কাজ শেষ হয় তো চার দিনের দিন ফিরে আসবো।

স্বামীর পানে চাহিয়া স্বুরো একটা নিশ্বাস ফেলিল। তার দুই চোখ অশ্রুর বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

২

আট দিনের দিন অপ্রকাশ বাড়ী ফিরিল। বাসা ঠিক হইয়াছে লেকের কাছে। ঝীও পাওয়া গিয়াছে—বাসায় জিনিষ-পত্র সাজানো। শুধু পাজি দেখিয়া ভালো দিন দেখিয়া যাত্রা করার ওয়াস্তা—

অপ্রকাশ জামা ছাড়িতেছিল। স্বুরো কহিল,—ক'টা ঘর?

অপ্রকাশ কহিল,—দোতলায় তিনখানি, একতালায় তিনখানি, তা ছাড়া রান্না-ঘর আলাদা। দোতলায় বাথরুম আছে—একতালায়ও আছে। বেশ ফাঁকা ফর্দ্দা—দক্ষিণ খোলা। ইলেক্‌ট্রিক লাইট-ফ্যান—

বাড়ীখানি নতুন একেবারে। একটু খালি জায়গা আছে, তাতে ফুলের চারা লাগাতে পারো।

স্থরো কহিল,—সব ঘরই দক্ষিণ খোলা ?

অপ্রকাশ কহিল,—না, দুটো।

স্থরো কহিল,—তার একটা ঘর আমরা নেবো, আর একটা মা'র জন্য সাজিয়ে রাখবো। বাকিটায় কাপড়-চোপড় থাকবে। আলমারী কিনেচো ?

অপ্রকাশ কহিল—নিশ্চয় !

অপ্রকাশ খাটে বসিল। স্থরো বাতাস করিতে করিতে বলিল,—এ ক'দিন কি করলে বলো ? কখন্ কি ?

অপ্রকাশ কহিল,—আগে তোমার রিপোর্ট দাও।

স্থরো বলিল,— আমার যা নিত্য কাজ, সকালে উঠে কাপড় ছেড়ে গা ধুয়ে মা'র পূজার উদ্যোগ করা, তার পর রান্নার কুটনো কোটা—তার পর মা'র কাছে বসা—পাণ সাজা—নাওয়া খাওয়া।

অপ্রকাশ কহিল,—দুপুর বেলায় ?

স্থরো কহিল,—মা বলতেন, যাও বৌমা, একটু জিরোও গে। তখন ঘরে এসে তোমায় চিঠি লিখতুম—তার পর তোমার এই বালিশটিতে মাথা রেখে কত কি ভাবতুম—

অপ্রকাশ কহিল,—কি ভাবতে ?

স্থরো কহিল,—বলো দিকিনি—

অপ্রকাশ কহিল,—বলবো ? সেই ছেলেটির কথা—না ? তোমার মামার বাড়ীর সাম্‌নে সেই মেশ—তোমরা বিকেলে ছাদে উঠলে সেই যে ছেলেটি দূরবীণ চোখে তোমাদের দেখতো—সেই বেচারীর করুণ মুখ ?

স্বরো রাগিয়া উঠিল, কহিল,—যাও…ও কি বদ ঠাট্টা!

অপ্রকাশ কহিল,—তুমি বলোনি তার কথা? বলোনি, যে বেচারী—

স্বরো কহিল,—আমি বুঝি তাই বলেছি! আমি শুধু বলেছিলুম—বেচারী কি আশায় যে দূরবীণ চোখে চায়! কোথাকার কে—আস্পর্দ্ধা ছ্যাখো না।

অপ্রকাশ কহিল,—ঐ…যাই হোক, তারি কথা ত ভাবতে, না?

স্বরো কহিল,—বয়ে গেছে তার কথা ভাবতে!—কি দুঃখে ভাববো! সে আমার কে যে…

অপ্রকাশ কহিল,—তবে কার কথা ভাবতে?

স্বরো কহিল,—সে এক জনের কথা। তার নাম তো বলবো না। না, ককৃখনো না।

অপ্রকাশ কহিল,—আমি বুঝেছি…

স্বরো কহিল,—কে? বলো তো মশাই?

অপ্রকাশ কহিল,—গাধার মত যার হাঁদা বুদ্ধি, হতভাগার মত চেহারা—তবে তার যে স্ত্রী আছে, সে একেবারে দুনিয়ার সেরা—রূপে যেমন লক্ষ্মী, গুণেও তেমনি সরস্বতী!

স্বরো কহিল,—যাও—দেখ্‌বে, আমি কি করতুম—

বলিয়া সে একটা খাতা আনিয়া অপ্রকাশের সাম্‌নে ফেলিয়া দিল। খাতা খুলিয়া অপ্রকাশ দেখে, এক জায়গায় লেখা আছে—

'তুমি এখন কি করচো, বলবো! বাড়ী দেখচো—ও ঘরে ওইখানে একটা যে কৌচ পাতবো—এই কৌচে ব'সে দুটিতে ছুটির দিনে দুপুর বেলায় 'বলাকা' পড়বো'—কেমন?

অপ্রকাশ হাসি-মুখে স্থরোর পানে চাহিল। স্থরো মুখ বাঁকাইয়া আড় চোখে তাকে লক্ষ্য করিতেছিল, লজ্জায় তার মুখ ছল্ ছল্ করিতেছে!

অপ্রকাশ আর-একটা পাতা খুলিল,—সে পাতায় লেখা আছে—

'বড্ড আমার মন কেমন করচে। দত্তদের বাগানের গাছে একটা পাখী এমন ডাকচে, মনে হচ্ছে, ওর সাথী যেন ওকে ছেড়ে কোথায় দূরে চ'লে গেছে। আজ চার দিন হলো। আরো এখনো তিন দিন। এ তিন দিন কেমন ক'রে কাটবে গো? কায নেই তোমার বাড়ী ঠিক ক'রে। তুমি এইখানে থেকে ওকালতী করো—এসো গো চ'লে এসো, আমার কথা না হয় নাই ধরলে, মা'র জন্যও কি মন কেমন করে না? কেমন নিষ্ঠুর গা তুমি!'

অপ্রকাশ ডাকিল—স্থরো—

স্থরো কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—কি?

অপ্রকাশ কহিল,—ঠিক বলেচো—দরকার নেই ওকালতী ক'রে! পয়সার জন্মই তো ওকালতী? কিন্তু পয়সায় কি স্থখ? এ মনে যে ভালোবাসা, যে প্রীতি আমার জন্য সঞ্চিত, তাই কি প্রচুর সম্পদ নয়?

স্থরো কহিল,—যাক, তোমার কথা বলো। কাল সন্ধ্যার সময় কি করছিলে?

অপ্রকাশ কহিল,—কাল?—ও কাল সত্য ধরেছিল, তার সঙ্গে থিয়েটারে গেছলুম, একটা অপেরা, আর একটা ফার্শ ছিল। গানগুলো সত্যি বেশ লাগছিল। আর নাচ? ভারি আর্টিষ্টিক। কলকাতায় গেলে তোমায় এক দিন ও-অপেরাখানা দেখাবো।—চমৎকার!

স্থরো একটা নিশ্বাস চাপিল—অতি-কষ্টে। তার পর কহিল,—পরশু সন্ধ্যাবেলা?

অপ্রকাশ কহিল,—পরশু তো রবিবার গেছে? আঃ, বলো কেন? বেলা তিনটের সময় সুরেশের পাল্লায় পড়ে একটা ফিল্ম্ কোম্পানির ছবি তোলা দেখতে গেছলুম—একটা মস্ত শীন্ তোলা হলো। প্রায় পঁচিশ জন রাজপুত-নারী দুর্গ রক্ষা করচে সশস্ত্র... মোগলের আক্রমণের বিরুদ্ধে—কেল্লা যা বানিয়েছিল...স্রেফ বাঁশের থামে ছবি-আঁকা কাগজ সেঁটে...বেশ করেছিল!

সুরোর বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। সে কহিল,—তরশু?

অপ্রকাশ কহিল,—তার আগের দিন বিনয়ের বাড়ী খেতে হলো কি না! ছাড়লে না। তার বোন গান গাইলে—রবি বাবুর গান। খাশা গাইলে...বিশেষ সেই গানটা—আমায় একটুখানি বস্‌তে দিয়ো কাছে—রাত্রে কতক্ষণ অবধি তার রেশ আমার কাণে বাজছিল যে! ওর বোনকে যে গান শেখায়, কলকাতায় গেলে তোমায় তার ছাত্রী ক'রে দেবো।

সুরোর বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—তোমার কষ্ট হয়নি তা হলে তেমন?

অপ্রকাশ কহিল,—না, ভারী আমোদে ছিলুম ক'দিন। যেদিন গেলুম, তার পরের দিনই এ বাড়ীর সন্ধান পাই গোলোকের কাছে। দেখে অমনি কথা পাকা ক'রে ফেললুম। তার পর গোলোক এক কাঠওয়ালার কাছে নিয়ে গেল বৌবাজারে—ফার্ণিচার কিনলুম, কতক অর্ডার দিলুম—ব্যস,—ঝী তার দিদির জানা একটি ছিল! তার পর ক'টা দিন...এ বন্ধু নিমন্ত্রণ করে তো ও ছাড়ে না—গান বাজনা, তাশ, বায়স্কোপ, থিয়েটার ..আজই কি ছাড়ছিল? তা, নেহাৎ কথা দিয়ে গেছি—আর এখান থেকে বেরুতে দেরী হবে—আমার উকিল-সাহেব তাড়া দিলেন, কাজেই...

ওঃ! তাই!...স্বরোর চোখের পাতার পিছনে জল ঠেলিয়া আসিল।

অপ্রকাশ কহিল,—সুটকেশটা খোলো তো স্বরো...এক টীন বিস্কুট আছে—বার ক'রে রাখো, চায়ের সঙ্গে চলবে'খন।

স্বরো সুটকেশ খুলিল। কাপড়-চোপড় ঘাঁটা—ছড়ানো—বিপর্য্যয় কাণ্ড! নাড়িয়া তুলিয়া গোছ-গাছ করিতে একবারে তলায় দেখে—খবরের কাগজে জড়ানো চটি জুতা জোড়ার তলায় কোণ-ভাঙ্গা তার সেই ফটোখানা...জুতা জোড়া যেন তাকে চাপিয়া হত্যা করিয়া ছাড়িয়াছে!

অপ্রকাশ কহিল,—ওটা কি, বলো তো?

স্বরো কোনো কথা কহিল না, উপুড় হইয়া দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া সে বসিল। তার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা নামিল।

অপ্রকাশ ঝুঁকিয়া দেখে, স্বরোর ছবি।

বিদায়-বেলার কথাগুলা বিদ্যুতের মত মনে ফুটিয়া উঠিল। অপ্রতিভের মত সে স্তব্ধ রহিল।

বাহির হইতে মা ডাকিলেন,—বৌমা!

স্বরো উঠিয়া চোখের জল মুছিয়া দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ছবিখানা দু'টুকরা হইয়া মেঝেয় লুটাইল।

অপ্রকাশ তা দেখিল,—দেখিয়া সে বিছানায় শুইয়া পড়িল।

বাহিরে বাগানের গাছে একটা পাখী ডাকিতেছিল, খাতায় যে পাখীর কথা স্বরো লিখিয়াছে, বুঝি সেইটাই—নহিলে অপ্রকাশের কাণে সুর অমন করুণ ঠেকিবে কেন?

———

উপন্যাসের মর‍্যাল

বি, এ পরীক্ষার পর লম্বা ছুটি। এ ক'মাস অবু তুনিয়া ভুলিয়া কেবলি বইয়ের পাহাড়ে আড়াল তুলিয়া তার পিছনে পড়িয়া ছিল। এগ্‌জামিন চুকিলে সে বাঙ্‌লা মাসিক-পত্র খুলিয়া বসিল। সাহিত্যের প্রতি তার একটা রীতিমত টান আছে।

গল্পগুলা নেহাৎ কেমন একঘেয়ে মনে হইল। সেই অসম্ভব ঘটনার নিবিড় ব্যূহ ভেদ করা কঠিন। আর ভিতরে সেই মামুলি ব্যাপার, প্রেম। বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া অবু আকাশের পানে চাহিল। সকালের সোনালি রৌদ্রে আকাশের বর্ণ পীতাভ লাল। অবু ভাবিল, এই প্রেম বস্তুটার দর্শন কি সংসারে সত্যই মিলে? বিশেষ বাঙালীর ঘরে? না, ও বস্তুটি নিছক কবি-কল্পনা? একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে মাসিকের পাতা উন্টাইতে লাগিল। দৈহিক ব্যায়াম-চর্চ্চার উপর সচিত্র এক মস্ত প্রবন্ধ নজরে পড়িল। হাতের মাশ্‌ল্‌-এর বিবিধ ছবি। প্রবন্ধের উপসংহারে লেখক লিখিয়াছেন,—হে বাঙালী তরুণ-তরুণী, যদি সুশ্রী ও সুন্দর হইতে চাও, তো ব্যায়াম-চর্চ্চা করো। সুডৌল হাত-পা, ইয়া গুলি, সবল পেশী—ইহারাই শুধু নর-নারীর শরীর স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্য্যে ভরাইয়া তুলিতে পারে। স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য, এ-কথা মনে রাখিয়ো।

ঠিক কথা! এই ব্যায়ামের কথাটাই অবু ভুলিয়া আছে। নহিলে সাহিত্য—যে সাহিত্য মনের স্বাস্থ্য গড়িয়া তোলে, তার চর্চ্চা সে বহুকাল করিয়াছে। কিন্তু স্বাস্থ্যচর্চ্চা...

এটার দিকে মন দেয় নাই বলিয়াই আজ মাথা-ধরা, কাল অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, পরশু গায়ে ব্যথা—নানা উপসর্গের উপদ্রব ঘটে! ভালো কথা নয় তো! এমন করিয়া শরীরকে মৃত্যুর পথে আগাইয়া দেওয়া বেকুবি!...

বই রাখিয়া অবু পকেটে পার্শ ফেলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া উঠিল গিয়া একেবারে ধর্ম্মতলায় এক স্পোর্টিং গুড্‌স্‌এর দোকানে। স্যাণ্ডোর বই, গ্রিপ ডাম্বেল, মুগুর প্রভৃতি কিনিয়া সে একখানা ফিটন ডাকিল, এবং সেই ফিটনে চড়িয়া সটান বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী ফিরিয়া চাকরকে ডাকিল। কহিল,—সর্ষের তেল নিয়ে আয়।

তরুণ মনিবের পানে চাহিয়া চাকর তেলের বাটি আনিল। অবু কহিল,—একটি ঘণ্টা কষে আমার গায়ে ঐ তেল মাখা...বেশ ডলে-ডলে রগ্‌ড়ে-রগ্‌ড়ে! তেলে-জলেই বাঙালীর শরীর, বুঝলি রে...

ভৃত্য আদেশ পালন করিল।

এক্সারসাইজ করিতে হইবে সকালে—বই দেখিয়া সে বিস্তর নোট লিখিল, তার পর কশরতের চার্টখানা নিজের পড়ার ঘরে টাঙাইল। কাল হইতে...বেশ নিয়মে এক্সারসাইজ! আর অবহেলা নয়।...অ্যাপলো সৌন্দর্য্যের আদর্শ। নিটোল হাত-পা, দরাজ ছাতি,...দু' মাসে না হোক, ছ'মাসে আয়ত্ত হইবেই। বাঙালীর দুর্নাম সে ঘুচাইবে। বুকে পাথর ভাঙ্গা—সেটা গোঁয়ার্ত্তুমি! শিল্কের সার্ট বা পাঞ্জাবীর তলায় বলিষ্ঠ পেশীযুক্ত দেহ অথচ বাহিরে মুখে-চোখে-অবয়বে কোমল লালিত্য—এই তো সুপুরুষের লক্ষণ! ভুঁড়ি থাকিবে না, মুখ চ্যাপ্টা হইবে না—সে-সব দিকে দস্তুর-মত লক্ষ্য রাখা চাই।

আহারাদি সরিয়া অবু খবরের কাগজ খুলিল। সকালে কাগজ-খানা পিতা ও পিতৃব্যের হাতে ঘোরে, দেখার সুযোগ ঘটে না—তার পক্ষে এই সময়টাই খবরের কাগজের পক্ষে সুপ্রশস্ত।

একটা খবর চোখে পড়িল, নোয়াখালির ওদিকে ষ্টীমারঘাটে এক ফিরিঙ্গি মাতাল এক বাঙালী মহিলাকে অপমান করিতে গিয়াছিল, আর এক জন বাঙালী তাকে দুই গাঁট্টায় সিধা করিয়া দিয়াছে! এই তো চাই! বাঙালীর মনুষ্যত্ব জাগাইতে হইলে তার শরীরে বল থাকা প্রয়োজন—এবং ব্যায়াম নহিলে এই বল পাওয়া দুষ্কর।

অবুর কল্পনা-নেত্রের সামনে বাঙ্‌লা দেশ ও বাঙালীর ভবিষ্যতের ছবি ফুটিয়া উঠিল। বাঙ্‌লার সবুজ শ্যামল মাঠের উপর দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বাঙালী ছুটিয়া চলিয়াছে দুর্ম্মদ বেগে···ঘোড়ার পিঠে লাঞ্ছিতা আশ্রয়-পাওয়া বাঙালী তরুণী—অত্যাচার-ব্যাঘ্রের থাবার ঘায়ে জর্জ্জর তাঁর দেহ ও মন, আতঙ্কে উত্তেজনায় বরতনু এখনো থর-থর কাঁপিতেছে... আর ঐ পুকুরের পাড়ে দশাননের মত পাচ-সাতটা পাষণ্ড মাটীতে লুটাপুটি খাইতেছে—তাদের কারো হাত ভাঙ্গা, কারো মাথায় চোট, কারো বা পায়ের হাড় চূর হইয়া গিয়াছে! ঝোপগুলার আড়ালে বঙ্গমাতা জাগিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন, তাঁর চোখে আনন্দাশ্রু! অবুর প্রাণ জয়ের উল্লাসে নাচিয়া উঠিল!

বেলা প্রায় তিনটা... সুকু আসিয়া ডাকিল,—অবু।

অবু উঠিয়া বসিল, কহিল,—কি?

সুকু কহিল,—বায়োস্কোপে যাবি?

অবু কহিল,—কি ছবি আছে?

সুকু কহিল,—ভেনাস্...

অবু কহিল,—কাবিা?

স্কুর দুই চোখে বিস্ময় ফুটিল। সে কহিল,—তার মানে ?

অবু কহিল,—ও-সব বাজে সেন্টিমেন্টের ছেলে-খেলা দেখার প্রবৃত্তি আর নেই। কোনো heroic theme যদি—

স্কুর বিস্ময় মাত্রা ছাপাইয়া উঠিল। সে অবাক্ হইয়া অবুর পানে চাহিল। তার মুখে কথা নাই।

অবু কহিল—বল, বল, শারীরিক বল। তারি চর্চ্চা করো, বন্ধু। অসার কাব্য নাটক ছেড়ে heroic ideas-এ বুক ভরিয়ে তোলো। দেশের কথা ভাবো। দেশকে তুলতে হ'লে দেশের লোকের শরীরের শ্রী আর শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে আগে।

অবুর চোখের সাম্‌নে তখনো বাঙলার প্রান্তরের ছবি জাগিয়া আছে! পচা খানা-ডোবা বুজাইয়া সেখানে কুস্তির বড় বড় আখ্‌ড়া গড়িয়া উঠিয়াছে, মুদির দোকানের পাশে ব্যায়াম-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন চলিয়াছে, ফুলের মালায়-পাতায় লাল নিশানে সে এক সমারোহ ব্যাপার!

স্কু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তাকিয়ায় মাথা দিয়া তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িল, শুইয়া একখানা বই খুলিল।

অবু কহিল,—কি বই হে ? গোলেন্দামের অভিসার ? না, আরব-রজনীর এক টুকরো।

স্কু কহিল,—না। "বিপদের মুখে বেচারাম।" কি এ কাহিনী...ওঃ, পড়তে পড়তে রক্ত নেচে ওঠে!

—বটে! বলিয়া অবু হাত বাড়াইল।

স্কু তার হাতে বই দিল। অবু মলাট উল্টাইয়া দেখে, প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীকানাই চক্রবর্ত্তী প্রণীত লোমহর্ষণকারী নবন্যাস।

বাঃ! অবু কহিল,—দাও তো, একটু পড়ি।

স্বকু কহিল,—আমার আর ক'টা পাতা বাকী আছে, ভাই! বায়োস্কোপ দেখ্‌তে যাবার সময় লাইব্রেরীতে ফেরত দিয়ে যাবো, ভেবেচি।

২

স্বকুর পড়া শেষ হইলে সে কহিল,—এই নাও। Grand বই। কমলকুমারীর প্রেমের গল্প প'ড়ে প'ড়ে হায়রাণ হয়ে গেছি। এ একেবার নতুন আব্‌ হাওয়া...

মহা উৎসাহে অবু "বিপদের মুখে বেচারাম" খুলিল। প্রথম পরিচ্ছেদের আরম্ভে টাইটেল, 'সাগর-বক্ষে বেচারাম।' সে পড়িতে বসিল। বইয়ের অক্ষরগুলো তীরের গতিতে চোখের সাম্‌নে দিয়া ছুটিয়া চলিল। চোখ একেবারে লিনো-টাইপ যন্ত্রের মত লাইনগুলাকে বইয়ের পাতা হইতে তুলিয়া তার মনের উপর সুস্পষ্ট ছাপিয়া ধরিতে লাগিল! মাঝে মাঝে অবু বইয়ের পাতা হইতে চোখ তুলিয়া উদাস-ভাবে চাহিয়া থাকে—সে শুধু বইয়ে-লেখা বিপদগুলার ছবি ভালো করিয়া তলাইয়া বুঝিবার উদ্দেশ্যে। হু-হু বেগে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ মনে দাগ টানিয়া গেল। খাশা! নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে! ...বাঙ্‌লায় এমন বই সে আর কখনো পড়ে নাই। ওস্তাদ লেখকের ঘটনার ব্যূহচক্র রচনার শক্তি দেখিয়া তার তাক্‌ লাগিয়া গেল! বাঙ্‌লা সাহিত্যক্ষেত্রের যে আদরা ছবি মনে ফুটিল, তা অপরূপ! সে ক্ষেত্র হইতে বঙ্কিম, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ কোথায় ছিট্‌কাইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছেন, আর ক্ষেতের বুকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শুধু শ্রীযুক্ত কানাই চক্রবর্ত্তী—তাঁর হাতে মস্ত একটা কলম। সেই কলমের খোঁচায় বাঙ্‌লার মাটী ফুঁড়িয়া রাশি রাশি শয়তান, পাষণ্ড, বদমায়েস,

ঠগ, ডাকাত, বাটপাড় সাঁ-সাঁ করিয়া দৈত্যের মত ভীষণ মূর্ত্তিতে মহা-আস্ফালনে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে!

প্রেমও আছে! ঐ বদমায়েসদের বেঁটে সর্দ্দার ছটুলালের তরুণী মেয়ে সুশুভ্রা—আহা, এক হাতে তার ফুলের মালা, অপর হাতে রক্ত-মাখা শাণিত খর্পরে দোদুল নরমুণ্ডমালা! হরি-হর মূর্ত্তির কল্পনা হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। কিন্তু সুশুভ্রা? যেন আধ-রতি, আধ-শ্যামা! তার এক চোখে প্রেমের আবেশ, অপর চোখে প্রলয়-দাহ-যজ্ঞের বিরাট অগ্নি-জ্বালা! ·

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অবু ডাকিল,—সুকু...

সুকু খপরের কাগজ দেখিতেছিল, কহিল,—কি?

অবু কহিল,—এই বই বাঙালীকে জাগাবে। এর ক'টা edition হয়েচে?

মলাট খুলিয়া নিজেই দেখিল, প্রথম সংস্করণ, ১৩২৫ সালে ছাপা। আর এডিসন হয় নাই? সুকু কহিল,—জানি না।

বইয়ের ভূমিকা খুলিয়া সে দেখে, গ্রন্থকার থাকেন ডায়মণ্ড-হারবারে। ঠিকানাও ছাপা,—আরাম-কুটীর, ডায়মণ্ড-হারবার।

উত্তেজনার ঝোঁকে সে একখানা কাগজ টানিয়া গ্রন্থকারকে এক চিঠি লিখিয়া বসিল। অবু লিখিল,—

মহাশয়,

আপনার লেখা "বিপদের মুখে বেচারাম" পড়িয়া যে কি খুশী হইলাম, বলিতে পারি না। এ বই বাঙলার গীতা। বাঙালীর মোক্ষ-মন্ত্র আপনি গল্পচ্ছলে প্রথম প্রচার করিলেন। ধন্য আপনি!

ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন আমি দেখিতাম, এ বই পড়িয়া বুঝিতেছি, তা নিতান্ত অসার, অলীক। আমি এবার বি, এ এগ্জামিন দিয়াছি। বাবা হাইকোর্টের বড় উকীল। তাঁর ইচ্ছা, আমিও উকীল হই।

আমারও সেই সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু আপনার বই পড়িয়া সে সঙ্কল্প আর নাই। বেচারামের মত দুনিয়ার বুকে আমি বিপদ খুঁজিয়া বেড়াইব। যদি একটি আর্ত্ত অসহায়কেও উদ্ধার করিতে পারি, তবেই আমার এ জীবন সফল হইবে। দয়া করিয়া পত্রোত্তরে যদি আমায় এক ছত্র লিখিয়া জানান, কবে এবং কোন্ দিকে এই বিপদের সন্ধানে বাহির হইব, তাহা হইলে পরম আপ্যায়িত হই। পূর্ব্ববঙ্গে নারীর উপর প্রচুর অত্যাচার চলিয়াছে,—সেই দিক হইতে সুরু করিব ? তবে একটু সময় চাই। সস্থ স্যাণ্ডো আনাইয়াছি ; কাল হইতে ব্যায়াম-চর্চ্চায় মন দিব। এক মাস পরে বোধ হয় অভিযানে বাহির হইবার যোগ্য হইব। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানাইয়া আমাকে চির-অনুগৃহীত করিবেন। ইতি—

একান্ত ভক্ত

শ্রীঅবনীলাল মুখোপাধ্যায়।

০

সুকু কহিল,—কি লিখচিস ?

অবু কহিল,—একখানা চিঠি।

সুকু কহিল,—দেখি।

—না। এ আমার গোপন-মনের কথা।...

কথাটা বলিয়া খামে টিকিট আঁটিয়া অবু ডাকিল,—ন্যাপলা...

ভৃত্য ন্যাপলা আসিলে তার হাতে চিঠি দিয়া অবু কহিল,— এখনি ডাকে দিয়ে আয়।... বুঝলি ?

ঘাড় নাড়িয়া ন্যাপলা চিঠি লইয়া ডাকঘরে ছুটিল।

অবু কহিল,—এ্যালবিয়নে কোনো সিরিয়াল ছবি নেই ?

সুকু কহিল,—আছে। এডি পোলো—থার্ড পার্ট।

অবু কহিল,—চ', তবে এ্যালবিয়নে।

সুকু কহিল,—যা বললি ! ছেলেমান্ষী ছবি !

অবু কহিল,—তা হোক···Full of thrills...এই তো জীবন। আমি এ্যালবিয়নেই যাবো।···

সুকু কহিল,—বেশ। আমি যাবো গ্লোবে।

৩

চার-পাঁচ দিন পরের কথা।

সকালে চার্ট দেখিয়া ডেভেলপার লইয়া অবু কশরৎ করিতেছিল, ডাকে চিঠি আসিল। খামে চিঠি।

ব্যায়াম-চর্চ্চা শেষ করিয়া অবু চিঠি খুলিল। লেখকের নাম দেখিয়া প্রাণ খুশীতে ভরপূর হইয়া উঠিল। কানাই চক্রবর্ত্তী জবাব দিয়াছেন,—

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দ পাইলাম। আমার বই আপনার ভালো লাগিয়াছে জানিয়া খুশীও হইলাম।

গল্পটি নিছক কাল্পনিক, বানানো। ও-রকম ঘটনা বাস্তব-জগতে ঘটে কি না, সে সম্বন্ধে আমার নিজের মনে প্রচুর সন্দেহ আছে। সুতরাং মিথ্যা কাহিনী পড়িয়া তেমন ঘটনার সন্ধানে ছোটা বুদ্ধির কায হইবে না।

আপনি এবার বি. এ পরীক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং বয়সে আপনি তরুণ। এ-বয়সে খেয়ালের ঝোঁকে যা'-তা করা ঠিক নয়। আমার বয়স হইয়াছে, এ উপদেশটুকু কাযেই বোধ হয় অনায়াসে দিতে পারি। পাশ করিয়া ওকালতী পড়ুন। তার পর বিপদের জন্য ভাবিতে হইবে না। ভগবান্ না করুন, সংসারে এমনিই বহু বিপদ আমাদের আক্রমণ করে। বেচারাম বইয়ের পাতার লোক। তাই সব বিপদেই বাঁচিয়াছে। এমন বিপদে বাস্তব-জীবনে বাঁচিয়া ওঠা খুব কঠিন; বোধ হয়, অসম্ভবও। আমার কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ইতি—

শুভার্থী
শ্রীকানাইলাল চক্রবর্ত্তী।

চিঠি পড়িয়া অবু দমিয়া গেল। এ-সব ঘটনা জীবনে অসম্ভব কিসে? ঐ তো এডি পোলোর ঘটনা!...বাস্তবের উপর অনেকখানি রঙ চড়ানো শুধু! নহিলে একেবারে অসম্ভবের উপর কিছু গড়া যায় না—গল্পও না। আকাশে যেমন প্রাসাদ রচনা সম্ভব নয়, অসম্ভব প্লট লইয়া সম্ভবপর গল্পও তেমনি জমানো যায় না!... কানাই চক্রবর্ত্তী মহাশয় যা লিখিয়াছেন, ওটা নিছক বুড়া বয়সে হিতোপদেশ দিবার দুর্দ্দম আগ্রহ-বশে! বিনয়ও তো হইতে পারে।...

অবুর চোখের সাম্‌নে সমুদ্রের বুকে বেচারাম তেমনি ভাসিয়া বেড়ায়...ছোটনাগপুরের জঙ্গলে বাঘের সম্মুখে বেচারাম...গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া বাঘকে দুম্‌ করিয়া এক ঘা সে বসাইয়া দিল,—বাঘ ভয় পাইয়া ছুটিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।...

অবু ভাবিল, অসম্ভব এর কোন্‌খানে?...শুধু সাহস আর শক্তি... শরীরের, মনেরও। ব্যস্‌।

আরও এক সপ্তাহ পরে বন্ধুর দল আসিয়া কহিল,—চন্দননগর যাচ্ছি সকলে মোটর-বোটে। চলো হে...

অবু কহিল,—না।

এই ইঙ্গিতটুকু। অবু ভাবিল,—একবার ডায়মণ্ড-হারবারে গিয়া আরাম-কুটীরে কানাই চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে হয় তো। মুখের কথায় তর্ক তুলিয়া সে তাঁকে বুঝাইয়া দিবে...

তাই ঠিক।

বন্ধুরা চলিয়া গেল। অবুও আহারাদি সারিয়া চলিল বেলেঘাটা ষ্টেশনে। ইণ্টার ক্লাশের একখানা টিকিট কিনিয়া সে ডায়মণ্ড-হারবারে রওনা হইল।

ষ্টেশনে নামিয়া ঠিকানা সংগ্রহ করিতে একটু বেগ পাইতে হইল। ষ্টেশনের লোক-জন বাঙ্‌লার এত বড় লেখকের কোনো সন্ধান রাখে না। হা রে বেকুব বাঙালী।...অন্ন-বস্ত্রের চিন্তায় এমনি কাতর যে...ছিঃ। এ বাঙ্‌লার উন্নতি কখনো সম্ভব ?...

পথে আসিয়া দোকানী-পসারীর কাছে সন্ধান লইল ; তারা অম্লানবদনে কহিল,—জানি না মশাই, কে কানাই চক্রবর্ত্তী।

অবু কহিল,—মস্ত বাঙালী লেখক !

মুদি কহিল,—ওঃ ! তা হ'লে কাছারিতে খোঁজ নিন্ দিকিন... মুহুরি-লেখক যত, ঐখানেই পাবেন !

অবু কহিল,—মুহুরি-লেখক নন্। তিনি গ্রন্থকার। তাঁর লেখা অনেক ভালো ভালো বই আছে।

মুদি কহিল,—না মশাই, বলতে পারলুম না।

অবুর মনে হইল, একটি চড়ে মুদির এ নির্লজ্জতা ঢিট্ করিয়া দেয় ! এমন মূর্খ এরা...

সে পোষ্ট অফিসে গেল। এক ডাক-পিয়ন কহিল,—আরাম-কুটীরে সে বুড়ো বাবু থাকেন...ঠিক ! তা ঐ গঙ্গার ধারে যান। লক গেটের পাশ দিয়ে সোজা...একটা বাবলা-ঝোপ দেখবেন, তার ঠিক পিছনে আরাম-কুটীর।

খুশী-মনে অবু তখন বাবলা-ঝোপের উদ্দেশে যাত্রা করিল। ঐ বাবলা-ঝোপ ! দেবী বীণাপাণি কমল-বন ছাড়িয়া ঐ বাবলা-ঝোপের পাশে এখন আস্তানা বাঁধিয়াছেন ঐ বাবলার কাঁটার থাকে থাকে এবার রক্ত-কমল ফুটিবে !

বাবলা-ঝোপ মিলিল ; সুতরাং আরাম-কুটীর মিলিতেও বাধিল না। একতলা ছোট বাড়ী ; পথের ধারে বাঁখারির বেড়া-দেওয়া

ছোট্ট ফটক। সাম্নে কতকগুলা ফুলের গাছ. বেড়ার ধারে বড় বড় কাঁটা-বাবলার ফাঁকে-ফাঁকে বাতাবি লেবু, কালো জাম, জামরুল, পেঁপে ও খেজুরগাছ; তার পিছনে গঙ্গার বুকে মস্ত চড়া।

ফটকের সাম্নে দাঁড়াইয়া অবু ডাকিল,—বেয়ারা...

ডাক শুনিয়া একটি মেয়ে আসিয়া বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইল। মেয়েটি ময়লা নয়, সুন্দরীও নয়। বয়স তেরো-চোদ্দ বছর। মুখে-চোখে বয়সোচিত ব্রীড়ার চিহ্নমাত্র নাই। মেয়েটি কহিল,—কাকে খুঁজ্‌চেন?

অবু কহিল,—কানাই বাবু থাকেন এ-বাড়ীতে?

মেয়েটি কহিল,—হ্যা। তাঁর অসুখ করেচে।

অসুখ! বাঃ! অবু কহিল,—তাই দেখতে এসেচি।

মেয়েটি কহিল,—দাঁড়ান!

অবু দাঁড়াইয়া রহিল। তার মনে ক্ষোভের উদয় হইল। হায় বেচারী বাঙ্‌লার গ্রন্থকার! বাঙালীর অলস অবসরে তাকে কতখানি আনন্দ দান করো, আর সে আনন্দের পরিবর্ত্তে তারা তোমায় কি দিয়াছে! লোকালয়ের বাহিরে এই জীর্ণ ঘরে পড়িয়া তুমি রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ, আর তারা ইলেকট্রিক্ ফ্যানের তলায় আরাম কৌচে বসিয়া তোমারই লেখা বই পড়িয়া আনন্দে মশ্‌গুল্ হইতেছে! নাঃ, কোনো দিক্ দিয়াই বাঙালীর হৃদয়বৃত্তি বিকাশের চেষ্টা নাই! কবি সত্য কথাই লিখিয়া গিয়াছেন, 'ভূতলে বাঙালী অধম জাতি!' কৃতজ্ঞতা কথাটাও বুঝি বাঙালী কোন বাঙ্‌লা অভিধানেও পড়িয়া দেখে নাই...

মেয়েটি ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—আসুন ..

অবু গৃহে প্রবেশ করিল। দালানের পর ছোট ঘর। মেঝের এক ধারে তক্তাপোষ পাতা—অপর দিকে মস্ত একটা শেল্ফ,—বইএ

ঠাশা। তা-ছাড়া কাঠের আলমারী একটা, একটি কাচের আলমারীও আছে। সেগুলার কাঠের রঙ্ কত কালের পালিশের অভাবে উঠিয়া গিয়াছে...অঙ্গে দাক্‌ড়া-দাকৃড়া ছোপ্—ঠিক যেন শ্যাম-বর্ণ বাঙালীর গায়ে ছুলি বাহির হইয়াছে!...

তক্তাপোষে এক প্রৌঢ় বাঙ্গালী অর্দ্ধ-শায়িত। অবুকে দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনি কহিলেন,—আপনি কোথা থেকে আস্‌চেন?

মৃদু হাস্য-রেখা মুখে টানিয়া অবু কহিল,—কলকাতা থেকে। আপনি কানাই বাবু?

প্রৌঢ় কহিলেন,—হাঁ। আপনি...

অবু কহিল,—আমার নাম অবনী মুখুয্যে। ক'দিন আগে আপনার লেখা 'বিপদের মুখে বেচারাম' বই পড়ে আপনাকে চিঠি লিখে বিরক্ত করেছিলুম।

কানাই চক্রবর্ত্তীর মুখ-চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অবু তা লক্ষ্য করিল।

প্রৌঢ় ডাকিলেন,—মা গৌরী..

এ-আহ্বানে সেই মেয়েটি আসিয়া কহিল,—কেন বাবা?

কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—গঙ্গার ধারের বারান্দা থেকে সেই চেয়ারখানা মা এনে দাও...বাবু বস্‌বেন।

গৌরী চেয়ার আনিতে যাইতেছিল। অবু কহিল,—না, না। আমি আন্‌চি। বলিয়া সে গৌরীর অনুসরণ করিয়া বারন্দায় আসিল। একখানি কাঠের চেয়ার - পালিশ-ওঠা। চেয়ারখানা নিজেই বহিয়া ঘরে আনিল। কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—বসুন...

অবু বসিল। গৌরী কাঠ্ হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের হল্‌কা তার মুখে পড়িয়াছে। অবুর মনে হইল, বিরাট

তেজোবহ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ! যে শক্তি বেচারামের দেখিয়াছি—বুঝি সেই শক্তির তেজই বালিকার মুখে-চোখে অমন দীপ্ত-রাগে ফুটিয়া রহিয়াছে! অবু কহিল,—আপনার অসুখ..?

কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—হ্যাঁ, বাতের ব্যথা। আজ পাঁচ-সাত দিন ধ'রে চলেছে, তবে কাল থেকে কিছু নরম।

অবু কহিল,—চিকিৎসা ?...

হাসিয়া কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—এর আর চিকিৎসা কি! ঐ গৌরীই হ্যারিকেন জেলে ফ্লানেলের সেঁক দেয়—তা ছাড়া আকন্দপাতা চাপিয়ে রাখি। এ তো নতুন নয়। আজ পাঁচ-সাত বছর ধ'রে রোগও এমনি ধরচে—আর সেবাও এমনি চলছে!...

ধিক্কারে অবুর মন ভরিয়া উঠিল। অজস্র আনন্দের পশরা... কি বেদনা, কি ব্যথা শরীরে বহিয়া বিলাও তুমি, ওগো, বাঙ্‌লা দেশের হতভাগা লেখক!...এক টাকা দিয়া একখানা বই কিনিয়াই আমরা পাঠক দায়ে খালাস! কখনও ভাবি না, যে-লোকটি এ আনন্দ জোগাইতেছেন, তাঁর শরীরে মনে...

কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—এখানে কোথায় এসেচেন ?

অবু কহিল,—আপনার কাছেই এসেচি...আপনাকে দেখ্‌তে, আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে। আপনার বই প'ড়ে আমি খুব আনন্দ পাই,—আমি আপনার একজন ভক্ত!...

কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—ছি. ছি, ও-কথা বল্‌বেন না। আমার আবার লেখা! দেশে বড় বড় সব রথী, মহারথী লেখক রয়েচেন—মানুষের প্রাণ-মনের কত সূক্ষ্ম নিঁখুত ছবি আঁক্‌চেন। আমার এ পেটের দায়ে দু' ছত্তর লেখা বৈ তো নয়! কোনো দিকে

কিছু হলো না, তাই। ফাঁকির কারবার, মিথ্যার বেসাতি মাত্র! একটু চমক দিয়ে দু'পয়সা ভিক্ষে সংগ্রহ!...

অবু চিত্তে বেদনা বোধ করিল। এ-কথাগুলার পিছনে কতখানি ব্যথা-বেদনা, কি প্রচুর দীর্ঘশ্বাস যে পুঞ্জিত আছে! কানাইয়ের এই অতি-বিনয়ের ভঙ্গী নিমেষে এমন একখানি করুণ ছবি ফুটাইয়া তুলিল যে, তেমন ছবি অবু পূর্ব্বে আর কখনো দেখে নাই!...

অবু কহিল,—সে-সব রথী মহারথী যতই থাকুন, আপনার লেখা বই আমার ভালো লেগেচে...

বাধা দিয়া কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—আপনার অনুগ্রহ!

তার পর কথায় কথায় পরিচয়াদি চলিল। কানাই কহিলেন,—আপনাদের তরুণের দলেই জীবনের যা সাড়া পাই। বুড়োদের কাছে, বিজ্ঞ বিষয়ীদের কাছে আমাদের এই সব লেখার পাট, সাহিত্য-চর্চ্চা ... ছেলেখেলার সামিল বৈ নয়। তাঁরা বলেন, ওতে কার কি দুঃখ ঘোচে? শুধু কুঁড়ের সময় কাটানো। যে সময়টা ব'সে বই লিখি, তাঁরা বলেন সে-সময়টা পরের দু'টো মোট বয়ে দিয়ে এলেও দু'পয়সা তবু রোজগার হয়।...

অবু কহিল,—সৌভাগ্যক্রমে যখন এই সব বিজ্ঞ বিষয়ীদের ধন-সম্পত্তি আদালতের গর্ভে এবং তাঁদের প্রাসাদ-সমান অট্টালিকা ভাটিয়া বা মাড়ওয়ারীর কবলে, এবং নাম বিস্মৃতির অতল সাগরে ডুবে যাবে, তখনো, সেক্সপীয়ার, স্কট, বায়রণ, শেলি, বঙ্কিম, মাইকেল—আপনারা ...অমর হয়ে এই মর্ত্ত্যলোকে জেগে থাকবেন—অনন্ত শক্তি কালও আপনাদের স্মৃতির বিলোপ-সাধন করতে পারবে না।...

কানাই চক্রবর্ত্তী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। কহিলেন,—কিন্তু এই স্মৃতি যা থাকে, তা ঐ সব ক্ষমতাশালী লেখকদের মৃত্যুর পর।

বেঁচে থাকতে হেম-মাইকেলকে যে দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল, তাতে মনে হয়, মাইকেল 'মেঘনাদ-বধ' না লিখে এই সব বিষয়ী লোকের পরামর্শে যদি কোনো মাড়ওয়ারী মহাজনের খাতা লিখ্‌তেন, তা হ'লে মাসের শেষে বাঁধা তঙ্কা হাতে পেয়ে পেট ভ'রে খেতে পেতেন...অন্ততঃ দাতব্য চিকিৎসালয়ে ও-ভাবে...

অবু বেশ উত্তেজিত স্বরেই কহিল,—জ্ঞানের প্রতি বাঙালীর এই যে অবহেলার পাপ, আপনি কি ভাবচেন, বাঙালীকে তার প্রাশ্চচিত্ত করতে হবে না? না, সে-প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে না? বাঙালী ধনীর ধন তার পুত্র-পৌত্র এই যে অকস্মাৎ উড়িয়ে দিচ্ছে,—এ ওই অবহেলা-পাপেরই শাস্তি নয় কি? শুধু culture-এর অভাব, শিক্ষার অভাব...

তর্ক থামিতে চায় না—কথায় কথা বাড়ে। দরদী তরুণকে বুকের এত কাছে পাইলে প্রাণের বহু নৈরাশ্য, রুদ্ধ বহু অভিমান কি ভারী আবরণ ঠেলিয়াই না অবাধে উৎসারিত হইয়া পড়ে..

মাথামুণ্ড নানা কথায় বেলা পড়িয়া আসিতেছিল। কানাই চক্রবর্ত্তী ডাকিলেন,—মা গৌরী...

গৌরী এক ধারে দাঁড়াইয়া এ-তর্ক সমানে শুনিতেছিল। কি বুঝিতেছিল, সে-ই জানে। বাপের আহ্বানে গৌরী কাছে আসিল। কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন—অবনী বাবুর জন্য জলখাবারের কিছু জোগাড় ভাখো মা!

গৌরী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাপের পানে চাহিয়া রহিল।

কানাই কহিলেন,—তা লজ্জা কি, মা! তোমার ঘরে যা আছে, ফল,—ঐ কলা, পেঁপে, ডাব, মুড়ি, নারিকেল,...তোমার তৈরী নাড়ুও তো আছে...সে যে বেশ দেশী টিফিন, মা...

মুখ রাঙা করিয়া গৌরী সে-ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

৪

অবু কহিল,—আপনারা দু'জনে মাত্র এখানে থাকেন?..

কানাই কহিলেন,—দু'জন ছাড়া তিন জন আর পাবো কোথায়, বলো? আমার স্ত্রী মারা গেছেন ..সে আজ প্রায় পাচ বছর হলো। ...আমি তখন চাকরি করতুম, ঐ ইষ্ট বেঙ্গল রেলের ছোট একটা ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টারী। তাঁর মৃত্যুর পর চাকরী আর ভালো লাগ্‌লো না। এখানে চ'লে এলুম। জ্ঞাতির দল আমার বাড়ীর আশ্রয়টুকু দখল ক'রে বসেছিলেন, আমায় আস্‌তে দেখে মহা-বিরক্ত হলেন—আমোল দিতে নারাজ! মেয়েটার উপর একটু ঝাঁজও ফুটতে দেখলুম। তখন বাড়ী ছেড়ে এইখানে খালি জমীটুকু যা পড়েছিল, তার উপর এই ইট-কাঠ চড়িয়ে একটু আস্তানা বাঁধলুম।...অভাব চারিদিকে হি-হি ক'রে ফুটে উঠ্‌লো। মেয়েদের পাকা গেরস্থালীর মধ্যে এমন পরিপাট্য থাকে যে, অভাবের ফাঁকটা চোখের সাম্‌নে তেমন মূর্ত্তি নিয়ে দেখা দিতে পারে না। তাঁর অবর্ত্তমানে তাই সে অভাবের চেহারা দেখে আমি শিউরে উঠ্‌লুম।...সে অভাব ঘোচাবার জন্য, আর মেয়েকে কতক ভুলিয়ে রাখবার জন্য ঐ গঙ্গার পানে আর আকাশের অসীমতার পানে চেয়ে গল্প লিখ্‌তে সুরু করলুম। প্রথমে ছেপে দাঁড়াতে একটু বেগ পেয়েছিলুম। তার পর ভগবান্ দয়া ক'রে আপনাদের মতই দরদী বন্ধু এনে দিলেন। আপনাদের দয়ায় আমার দিন এক-রকমে চ'লে যাচ্ছে। তবে ভাবনা এখনো আছে: আর সে ভাবনা এই আমার গৌরী-মাকে নিয়ে। আমার অবর্ত্তমানে...নাঃ, সে কথা থাক্!

কানাই চক্রবর্ত্তী অতি-আয়াসেও একটা বড় নিশ্বাস রোধ করিতে পারিলেন না।

এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে অবু কহিল,—এখন আর কোনো বই লিখচেন না কি ?

কানাই চক্রবর্ত্তী কহিলেন—লিখচি বৈ কি, বাবা। লিখতে হয় দায়ে প'ড়ে। না লিখলে চলে না। তা ছাড়া সঞ্চয়ও কিছু চাই তো গৌরীর বিবাহের জন্য। আপনারা দয়া ক'রে আমার বই পড়েন, আমার সৌভাগ্য! না হ'লে ঐ যে আর্ট ব'লে কথা আছে, তার কোনো ধার ধারি না। অত-বড় স্পর্দ্ধাও কোনো দিন হয়নি। এ গরীবের অন্নদায়ের লেখা, বাবা...এর মধ্যে কিছু পাবার আশা রাখবেন না—শুধু গরীবকে সাহায্য করচেন, এই ভেবেই...

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া অবু কহিল,—আপনি ও-সব কথা দয়া ক'রে বল্‌বেন না। সত্যি বল্‌তে কি, আপনার লেখা প'ড়ে আমি কল্পনার যে অবাধ-প্রসারী রাজ্য দেখেচি, তা ভোলবার নয়। আমার ক'দিন কেবলি মনে হচ্ছে যে, বাঙালীর জীবন কি বৈচিত্র্যহীন! শুধু কি কেরাণীগিরি, ওকালতী, ডাক্তারী, স্কুলমাষ্টারী করেই বাঙালী এত-বড় মনুষ্য-জন্মটা কাটিয়ে যাবে! বাইরে যে, বিরাট পৃথিবী প'ড়ে আছে —কোথাও দিগন্তপ্রসারী মরু, কোথাও সাগরের উত্তাল তরঙ্গ...সে-সবের কোনো পরিচয় না নিয়ে? সে-হিসাবে আপনার কাছে আমি ঋণী। সাহিত্য একটু-আধটু দেখি—হয়, বেদান্তের তত্ত্ব, নয়, পাড়ার কারো বাড়ীর জানালায় ভদ্দর লোকের মেয়ে দেখে কবিতায় কে প্রেম জাগাচ্ছে—সে-সব কদর্য্য, বিশ্রী, লক্ষ্মীছাড়া ব্যাপার। এমনি এ্যাড্‌ভেঞ্চার যদি জীবনে একটাও না ঘট্‌লো তো সব যে মিথ্যা হয়ে গেল!

গৌরী একটা কাঁশিতে মুড়ি ও কাঁচা লঙ্কা লইয়া আসিল, কহিল, —পেপে তো ভালো পাকেনি, বাবা। আক্ ছাড়িয়ে আনবো ?

কানাই কহিলেন,—নিশ্চয় আনবে, মা। অমন উপকারী জিনিষ আর আছে! যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি...

অবু কহিল,—এ আপনি কি করচেন? কেন, অনর্থক...

কানাই কহিলেন,—সে কি হয়, বাবা! এ তো কিছুই নয়—বিদুরের খুদ। তা আমার কোনো লজ্জা নেই। দেশের ছেলে, তার সামনে দেশের জিনিষই ধ'রে দিচ্ছি।...এতে কোনো অসুখও হবে না। উপস্থিত এর বেশী সংগ্রহ করাও কঠিন। আমি প'ড়ে আছি বিছানায়...তবু মা আমার যা করচে...দাও মা, আক এনে দাও। আর ডাব আছে তো? ডাবের জলও খাসা হবে।

গৌরী আবার আদেশ-পালনে ছুটিল।

কানাই কহিলেন,—হাত-মুখ ধুয়ে ফেলুন, ওই বাইরে বাল্‌তিতে জল আছে, বোধ হয়...

অবু কহিল,—আমার একটি অনুরোধ আছে...

—বলুন।

—দয়া ক'রে আমায় স্নেহ দিয়েচেন যদি, তো ঐ 'আপনি' সম্বোধনটুকুও রহিত করুন।

হাসিয়া কানাই কহিলেন,—ওটা কালের দস্তুর, বাবা। কাঁচা-পাকায় এইখানেই বিরোধ জাগে। মাঝে যেন মস্ত ব্যবধান। পাকা হাত বাড়িয়ে আছে সর্ব্বক্ষণ, কাঁচাকে বুকে নেবার জন্য। সব কাঁচা তা বোঝে না, বাবা—এইটেই পাকার বড় দুঃখ...

আহারের অল্প আয়োজন ও তার সঙ্গে প্রচুর স্নেহ দেখিয়া অবু তৃপ্তি বোধ করিল। এর কাছে বড়লোক আত্মীয়-গৃহের চায়ের পেয়ালা, গরম লুচি, মটন্-কারীও অতি তুচ্ছ!...

বিদায়ের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে অবুর উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া কানাই কহিলেন,—ও পাগলামির চিন্তা মনেও এনো না, বাবা। সাম্‌নে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে আছে! জানা পথ, পাকা,...প্রশস্ত...তা ছেড়ে না-জানা কোন আঁধার-ভরা গলিতে অগ্রসর হওয়া সুবুদ্ধির কায হবে না। বইয়ের পাতায় যে-দুনিয়া দ্যাখো, তাকে ঐ মানস-লোকের পাশে রেখেই নিশ্চিন্ত থেকো—আর চলার বেলায় এই সত্যিকার কড়া কঠিন দুনিয়া... এ ভুলো না। মানুষের ধাক্কা খেয়ে, মানুষকে ধাক্কা দিয়ে পথ ক'রে এগুতে হবে। অভাবের উর্দ্ধে ব'সে অভাবের কল্পনায় আরাম আছে, কিন্তু অভাবের শত-তালি-দেওয়া কাঁথায় ব'সে অভাবের বেদনা জগতের সাম্‌নে ধরা...অপরে তা দেখে যা-ই পাক, নিজের বেদনার তাতে সীমা থাকে না!

অবু কহিল,—কিন্তু আন্তরিকতা না থাক্‌লে সব যে ভুয়ো হয়ে যাবে।

কানাই কহিলেন,—অভাবের উপর ব'সে আর যা-ই করো, তাতে সাহিত্য গড়তে পারবে না, এ-কথা ঠিক। দুনিয়ার উপর অভিশাপে, অভিমানে বুক ভ'রে ভারী হয়ে থাকবে...নিরপেক্ষ হয়ে দুঃখের ঠিক রঙটুকুও হয় তো তাতে লাগানো সম্ভব হবে না! এই সংসার...সেখানে অভাব থাক্‌লে, অভিযোগ উঠলে নিশ্চিন্ত হয়ে লেখা কি সম্ভব, ভাবো?

অবু কহিল,—কিন্তু প্রকৃত যে আর্টিষ্ট—সে তার বুকের রক্ত-লেখায় নিজের বেদনা দুনিয়াকে দেয়।

কানাই হাসিয়া কহিলেন,—সে বেদনা প'ড়ে বিশ্বের পাঠক-পাঠিকা রচনা-কৌশলের তারিফই শুধু করে, বাবা! বিশ্বের দুঃখে কারো বুক দরদে দোলে নি, কোনো দুঃখীর দুঃখ-বেদনাও তাতে এক তিল ঘোচেনি। একটা দৃষ্টান্ত দি—গিরিশ বাবুর 'বলিদান' নাটক পড়েচো

তো ? কন্যা-দায়ের ঐ মর্ম্মান্তিক ছবি দেখে বাঙালী নাট্যকারের লিপি-কুশলতার লোকে মুগ্ধ হলো, কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙালীর পানে দরদের চোখে কেউ কি চাইতে পেরেচে ?

অবু কহিল,—সমস্যার কথা।...

কানাই কহিলেন,—শুধু চারু-চিত্র আঁকা—চোখে-মনে তৃপ্তির বস্তু ! কিন্তু আর্টের বৃহত্তর কর্ত্তব্য, আমার মনে হয়, দুনিয়ার দরদ বাড়িয়ে তোলা, মানুষের দুঃখ-অভাব ঘুচোনো।...মানুষের মনে দুশ্চিন্তার কাঁটা দিবারাত্র ফুটে থাক্‌লে শিল্পের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগ করা শক্ত হয় না কি ? যে গরীব ভিখারী অনাহারে দুর্ব্বল, দাঁড়াতে পার্‌চে না, তাকে তাজমহলের ধারে পূর্ণিমা-রাত্রে দাঁড় করালে তাজমহল কি কখনো তাকে মুগ্ধ কর্‌তে পার্‌বে ?

গম্ভীরভাবে অবু কহিল,—সত্যি, এ সমস্যার কথা ! ..

ইহার পর হইতে অবু প্রায়ই ডায়মণ্ডহারবারে আসিতে লাগিল। আরাম-কুটীরে আরাম যে প্রচুর সঞ্চিত ছিল, সেজন্য নয়। এমনি···দুঃখের, অভিযোগের এমন জীবন্ত ছবির সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ-পরিচয় ছিল না। এ পরিচয়ে প্রাণে বেদনা জাগে,—তবু বেদনার যে মোহ, সেই মোহই তা'কে এখানে টানিয়া আনিত।

গৌরীর সঙ্গেও তার পরিচয় হইল। গৌরীর মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য ছিল না, যা তরুণ-চিত্তে রেখাপাত করে। দারিদ্র্যে লালিত, বাঙ্‌লার অতি-সাধারণ একটি বালিকা...রুগ্ন বাপের পাশে বসিয়া তাঁর সেবা করে, শুশ্রূষা করে, তাঁর জন্য অন্ন রাঁধিয়া দেয়—নিপুণ অভিভাবিকার মত বাপের খবরদারী করে। সাতানব্বইটা বাঙালী পরিবারে নিত্য যেমন দেখা যায়, তেমনি ! তার মধ্যে রোমান্স নাই, কাব্য নাই ! এ

ঘরের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সে ডাকিয়া দু'টি কথা কয়, তা'র দুটো কাযের বা তারিফও করে।...

বাপের মুখে তার ভবিষ্যৎ-চিন্তার কথা শুনিয়া গৌরীর উপর দরদে একবার হয় তো অবুর বুকখানা দুলিয়াও ওঠে! সে সময় একবার অবু গৌরীর পানে তাকায়, তাকাইয়া বাঙ্‌লার সুপাত্র-সভার একটা আদ্‌রা ছবি মনে গড়ে! যদি এমন একটি পাত্র ধরিয়া তার হাতে·· কানাই চক্রবর্ত্তীর দুশ্চিন্তা তাহা হইলে দূর হয় এবং এত বড় দুশ্চিন্তা দূর হইলে কোনো একখানা বই যদি তিনি লিখিতে পারেন—নিছক দরদের ব্যাপার, তা-ছাড়া আর কিছু নয়।

৮

প্রায় এক মাস পরের কথা।

বাড়ীতে অসুখ-বিসুখের গোলমালে অবু এক হপ্তা আর আরাম-কুটীরে যায় নাই। অসুখ সারিতেই সে বেলা দশটার ট্রেণে সেদিন যাত্রা করিল।

কানাই চক্রবর্ত্তী গৃহে ছিলেন না। গৌরী গঙ্গার ধারের বারান্দায় সিঁড়িতে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছিল।

অবু আসিয়া ডাকিল,—গৌরী ..

গৌরী বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অবু কহিল,—তোমার বাবা কোথায়?

গৌরী কহিল,—বেরিয়েচেন।

—কখন্ ফিরবেন্?

—সকালেই বেরিয়েচেন, এসে খাবেন। না খেয়েই গেছেন।

অবু কহিল,—বটে! নিমেষের জন্য আকাশের পানে চাহিয়া সে কি ভাবিল। তার পর সিঁড়ির এক ধারে বসিয়া পড়িল। কহিল,—কি বই পড়ছিলে ওটা?

গৌরী কহিল,—অগ্নিচক্র।

—তোমার বাবার লেখা, না?

মাথা নাড়িয়া গৌরী জানাইল, হাঁ।

—দেখি।

গৌরী বই দিল। অবু তার কয়েকখানা পাতা উল্টাইয়া দেখিল, কহিল—ও, এ সেই পিনাকীলালের গল্পটা—না? পিনাকীলাল্ বাড়ীতে তাড়া খেয়ে আসামে গেল চাকরীর সন্ধানে—তার পর নাগাদের দলে ভিড়ে···

গৌরী কহিল,—হ্যাঁ।

অবু কহিল,—তোমার বাবার লেখায় বাঙালী-জীবনের ভারী একটা বৈচিত্র্যের ছবি পাই। মামুলি ঘর-কন্না, মান-অভিমান, এ-সব ঢের লেখা হয়েচে। বাঙালীর মন তাতে এক তিল উন্নত হয়ে ওঠে নি। সে তার সেই হিংসা, দম্ভ, দ্বন্দ্ব নিয়ে সমান আস্ফালন ক'রে চলেছে।··· সাহিত্য কি? মানুষের cultured মনের অভিব্যক্তি—জ্ঞানের প্রকাশ, কিন্তু এ জ্ঞান বৃথা বিতরিত হচ্ছে, মানুষের প্রতি মানুষের এক তিল দরদ সহানুভূতি জাগাতে পারচে না!···

আবেগে উচ্ছ্বসিত অবু নানা কথা বলিয়া চলিল; গৌরী অবাক্ হইয়া তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।···উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে অবুর খেয়ালও হইল না, এ কথাগুলা কোনো সভা ডাকিয়া বলিলে হয় তো একটু আলোচনা বা তর্কের সৃষ্টি করিত—এবং গৌরী এ-কথাগুলার ঠিক যোগ্য শ্রোতা নয়!···

হঠাৎ তার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া গৌরী কহিল,—আপনি একটু বসুন—আমি এখনি আসচি।

অবু কহিল,—কোথায় যাবে ?

গৌরী কহিল,—ধনীরামের দোকানে।

ধনীরাম ? অবুর সপ্রশ্ন দৃষ্টি বুঝিয়া গৌরী কহিল,—মহাজন ; বাবা বই ছাপাবার জন্য তার কাছ থেকে টাকা ধার নেয়, তার পর বই বিক্রী হ'লে আস্তে আস্তে সে টাকা শোধ করে।...

ওঃ ! এমনি করিয়া বইয়ের ব্যবসা চালাইতে হয় !

অবু কহিল,—তা...

গৌরী কহিল—এ মাসে ঠিক সময়ে তার কিস্তী দেওয়া হয়নি। দু'বার সে তাগাদা ক'রে গেছে। কাল বাবা এক জায়গা থেকে কিছু টাকা পেয়েছেন। তা থেকে কিছু দিয়ে আসবো।...

—বেশ।

গৌরী টাকা লইয়া মহাজনের কাছে গেল।

অবু চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া 'অগ্নিচক্র' বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। বইয়ের পাতায় মন কিন্তু বসিতে চাহিল না। এই নানা কথা আর ঘটনার সঙ্গে কল্পনার ভাণ্ডার হইতে সে আরো কথা, আরো ঘটনা বাহির করিয়া সেগুলা সব একসঙ্গে জুড়িয়া এক মস্ত ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইল।

লোকালয়ের বাহিরে এই নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া এক বেচারা বাঙালী গ্রন্থকার দুই হাতে অভাব-অভিযোগের বিরুদ্ধে কি-ভাবেই না সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে।...এ জীবন তাহা হইলে সংগ্রামই ! নিজের বিলাস-লীলার ক্রীড়া-কুঞ্জটির বাহিরে কি অভাব, কি অভিযোগই না হাহাকার করিতেছে ! বইয়ের পাতায় লেখা নর-নারীর দুঃখ-বেদনা

বাস্তব জীবনে যে কতখানি মর্ম্মান্তিক—দারিদ্র্যে জর্জ্জর বাঙালী কি লইয়া আজ বিশ্ব-সভায় দাঁড়াইতে চায়! একজনই শুধু ঐশ্বর্য্য-প্রাচুর্য্যের উপর বসিয়া! কিন্তু বাকি নিরানব্বুই জনে যে অস্থিচর্ম্মসার কঙ্কালের সমষ্টিমাত্র!...

অদূরে গঙ্গার বুক হইতে তীর অবধি বিস্তীর্ণ চড়া। সেই চড়ায় কতকগুলা ছেলে-মেয়ে কাদা ঘাঁটিয়া মাতামাতি করিতেছে। তাদের পরণে জীর্ণ বাস। অবু ভাবিল, মানুষ হইয়া জন্মিয়া এরা কি ভাবেই না জীবনটাকে তুচ্ছ করিতেছে! জীবনের কোনো স্বাদ না জানিয়া, কোনো পথের সন্ধান না করিয়া...বেচারা, অভিশপ্তের দল! এমনি চিন্তায় তার মন উদাস হইয়া উঠিল। দুনিয়ার নানা দুঃখ জমাট বাঁধিয়া ভারী পাথরের মত তার বুকে চাপিয়া বসিল।...

হঠাৎ গৌরীর স্বরে তার চমক ভাঙ্গিল। গৌরী কহিল,—বাবা আর একখানা বই লিখেচেন..বল্লেন, আপনি যেমন বলেছিলেন, সেই ভাবে..

অবু কথাটা ঠিক বুঝিল না। সে অনেক কথাই বলিয়াছে, লেখা সম্বন্ধে তার কোন্ কথাটা ..?

গৌরী কহিল,—একটা ট্রেন তো এলো। দেখি, বাবা যদি আসে। আপনি একটু বসুন। আমি উনুনে আগুন দি ..

অবু কহিল,—রান্না এখন হবে?

গৌরী কহিল,—রেঁধে রাখলে সে ভাত কড়কড়ে হয়ে যেতো, তাই...

ঠিক! গৌরীর মুখখানি তাই আজ এমন ম্লান দেখাইতেছে। সেও তাহা হইলে...

অবু কহিল,—তুমিও খাওনি?

গৌরী কহিল,—না।

কথাটা অবুর গায়ে যেন চাবুক ছোঁয়াইল! দুনিয়ার দুঃখ-বেদনার কথা ভাবিতে সে তন্ময়, আর তার পাশেই এই বালিকা এত বেলা অবধি অনাহারে আছে! সে খবর না লইয়া তার কাছে সে ভাষার—ভাবের উচ্ছ্বাস বহাইয়া দিয়াছে!

অবু কহিল,—ছি গৌরী, এত বেলা অবধি না খাওয়া ঠিক হয় নি; অসুখ করবে...

মৃদু হাসিয়া গৌরী কহিল,—না।

গৌরী উনুন ধরাইতে গেল। অবু কাঠ্ হইয়া বসিয়া রহিল। সহসা বাহিরে জুতার শব্দ ও সঙ্গে সঙ্গে কানাইয়ের স্বর—ও মা গৌরী...মা গো...

—যাই বাবা। বলিয়া গৌরী ছুটিয়া আসিল। অবুও উঠিয়া বাহিরে আসিল। কানাই একেবারে রৌদ্রদগ্ধ হইয়া ফিরিয়াছেন! অবুকে দেখিয়া কহিলেন,—এই যে বাবা, এসেচো। এত দিন আসোনি, বড় ভাবনা হয়েছিল।...গেছলুম কলকাতায় একটা কাযে। ভাবলুম,—একবার যাই। তা পারলুম না। বড্ড বেলা হয়ে গেল—রোদের ঝাঁজে আর হাঁটতে পারলুম না। তা, অসুখ-বিসুখ করেনি তো?

গৌরী হাত-পা ধুইবার জল আনিয়া দিল, গামছা ভিজাইয়া আনিল, তার পর একখানা হাত-পাখা আনিয়া বাপকে বাতাস করিতে লাগিল।

কানাই মুখ-হাত ধুইয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। গৌরী কহিল,—ডাবের জল আনি, বাবা...

যেন একটা যন্ত্র চলিতেছে! গৌরী এ কাযগুলি এমন সহজ অনায়াস ভঙ্গীতে করিতেছিল যে, অবুর সম্ভ্রম হইল—পাকা গৃহিণীর মত রীতিমত

অভ্যাসের হাত এ যে। বাঃ। দারিদ্র্যে এইটুকুই পরম সান্ত্বনা !···এর দাম···

কানাই ডাবের জল খানিকটা পান করিয়া মেয়ের সাম্‌নে ধরিয়া কহিলেন,—এটুকু তুমি খেয়ে ফ্যালো, মা। ভাতের কত দূর ?

গৌরী কহিল,—তরকারী তৈরী। শুধু ভাতটা চড়িয়ে দি। উনুন ধ'রে উঠেচে।

গৌরী চলিয়া গেল।

কানাই কহিলেন,—একটু বিশেষ কাযে যেতে হয়েছিল, বাবা। মানে, একটি পাত্র পেয়েচি। খিদিরপুর ডকে কায করে—পঁয়ত্রিশটি টাকা পায়। দোজবরে—একটি ছেলে আছে—অবোলা শিশু। একখানি ছোট বাড়ী আছে, ঐ দুর্গাপুরে। বাপ নেই, মা আছে। ছোট্ট সংসার···কিচ্ছু দিতে হবে না। প্রথম পক্ষের গহনাপত্র দু'চারখানা আছে। খেতে-পরতে পাবে—একটু সংস্থানও—তা এর চেয়ে আর বেশী কামনাই বা কি করতে পারি!

কানাই একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

অবু চুপ। বহুক্ষণ পরে সে-ও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—কত বয়স ?

—বয়স বছর তিরিশেক। তা, বেশ জোয়ান ছেলে···

না—না—না!···অবুর মন বিদ্রোহে তাতিয়া উঠিল। অবু কহিল, না, ও পাত্রে দেবেন না।

কানাই সখেদে কহিলেন,—এর বড় পাত্র যে আমার পক্ষে রাজপুত্র, বাবা। বামনের চাঁদ চাওয়ার প্রয়াস সে যে। বুঝি সব। কিন্তু তোমাদের কবির সেই কথাই মনে পড়ে, 'সংসার কঠিন বড়,

কারেও সে দেখে না !'...তা ছাড়া কবে আছি, কবে নেই, বিলম্বও তো আর করতে পারি না।

অবুর মনে হইল, ঠিক কথা। 'সংসার কঠিন বড়, কারেও সে দেখে না !'...অবুও তো মুখে বহু দরদ দেখাইয়াছে, কিন্তু...

কানাই কহিলেন,—বুক ভেঙ্গে যায় যখন ভাবি, এই নিরালা ঘরে আমি—মা'কে আমার কোথায় কোন্ অজানা ঘরে পাঠিয়ে দিছি !...অদৃষ্টে কি ঘটবে !..অদৃষ্ট দেখা যায় না ! যতদূর সম্ভব, দেখ্চি,—তার পর...উঃ, এক এক সময় মনে হয়, ইংরেজের সমাজে ঐ যে ভালোবেসে বিবাহের রীতি আছে—ও বেশ ! অন্ততঃ স্ত্রী স্বামীর যত্নটুকু পাবে। আমাদের সমাজে সেটুকুও বরাতের উপর ছেড়ে দিয়ে কায !...

অবু কোনো জবাব দিল না। মুখে জবাব কিছু আসিল না। মনের মধ্যটা রাশি রাশি চিন্তার বাষ্পে এমন গাঢ় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল যে, সে-অবস্থায় মানুষ কথা কহিতে পারে না।

অনেক কথা সে ভাবিতেছিল—এই কানাই চক্রবর্ত্তী, এই কানাই চক্রবর্ত্তীর কন্যা ঐ গৌরী...প্রথম যে-দিন সে এখানে আসিল, সে-দিনকার সেই প্রথম পরিচয়টুকু হইতে কেবলই ভাবিয়াছে, দারিদ্র্যের কথা বাঙালীর হৃদয়-হীনতার কথা.........

গৌরী আসিয়া ডাকিল,—বাবা

সে-আহ্বানে চমকিয়া অবু গৌরীর পানে চাহিল। সদ্য আগুন-তাত হইতে সে উঠিয়া আসিয়াছে—মুখ-চোখ রাঙা! অবু ভাবিল, গৌরী সুন্দরী ! না, ময়লা ! তাও নয়! ইহাকে যদি সে... অর্থাৎ, আর কোনো উদ্দেশ্যে নয়—সে যে গল্পের নায়কের মত প্রেমে পড়িয়াছে, তা নয়—প্রেমের কথা ভাবিবার খেয়ালও ছিল না !

তা নয়, শুধু দরদ...এই বিপন্ন পরিবারটির দুঃখে একটু সহানুভূতি! জীবনে তার কি এমন মস্ত আকাজ্ক্ষা? আমেরিকার প্রেসিডেণ্টও হইবে না, মিনিষ্টারও নয় যে, অসীম প্রতাপশালিনী, বিদ্যাবুদ্ধিতে-সেরা, রূপসী নূরজাহাঁ বেগমের মত পত্নী নহিলে তার জীবন একেবারে চূর্ণ হইয়া যাইবে! ওকালতীর চরম...হাইকোর্টের জজ···তাহাতেও স্ত্রীর অসাধারণ পাণ্ডিত্য বা অনুপম রূপশ্রীর এমন অতি-প্রয়োজনও নাই যে···

বাপকে গৌরী কি বলিল, চিন্তার অরণ্যে পড়িয়া অবুর তা শুনা হইল না।...তবে চেতনা ফিরিল কানাইয়ের কথায়। কানাই বলিলেন,—ওরা এই মাসেই বিয়ের কথা বলচে···

গম্ভীর স্বরে অবু কহিল,—হুঁ!

কানাই কহিলেন,—দিতেই যখন হবে, তখন দু'দিন আগে আর পরে, কিছুই এসে যায় না!...কি করবো, বুঝতে পারচি না। আরো দু' তিনটি পাত্র এসেছিল, পড়চে,—কিন্তু অনেক চায়। সে সামর্থ্য নেই। তার উপর কলেজে-পড়া ছেলে—কে জানে, কতদূর দৌড়ুবে! এ তবু যা, হোক্ একটা চাকরী করচে।...এরা এটুকু বোঝে না যে, আমার যা-কিছু আছে, সে-সবই ঐ গৌরী আর জামাই পাবে। যত তুচ্ছই হোক—একটা এই আস্তানা, আর যৎ-সামান্যও কিছু তো...তা নয়, উপস্থিত কেবল নগদ টাকার টাক করে!...

অবু ইতিমধ্যে অনেকগুলা চিন্তাকে একত্র করিয়া কোনোমতে বলিল,—এও পয়ত্রিশটি মাত্র টাকার উপর নির্ভর ক'রে জীবন সুরু—একটি ছেলে আছে—তার পর আরো পাঁচটি হ'লে বিষম মুস্কিল বাধ্‌বে না?...

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কানাই কহিলেন,—নিরুপায় !...

পাশের ঘর হইতে গৌরী ডাকিল,—ভাত দেওয়া হয়েচে, বাবা।

কানাই কহিলেন,—তোমারও ভাত বেড়েচো ?

—বেড়েচি।

—আচ্ছা।

কানাই উঠিলেন। অবু ঘরে বসিয়া আবার চিন্তার সূতা ছাড়িয়া দিল—সে কোন্ অসীম রহস্য-লোকে!.. গৌরীকে নানা মূর্ত্তিতে কল্পনা করিয়া মনকে সে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল, যদি ঐ গল্প-উপন্যাসের মত তাকে সরস প্রেমার্দ্র করিয়া তুলিতে পারে!... কিন্তু ...

নাই-বা ঘটিল গল্পের প্রেম, সোজা মামুলিভাবে বিবাহের প্রস্তাব! লজ্জায় তার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ কি বলিয়া এ প্রস্তাব—? না, সে বড় বিশ্রী শুনাইবে! ইনি ভাবিবেন, এই মতলবেই ছোকরা এখানে যাতায়াত সুরু করিয়াছে!..তা যে নয়, কি করিয়া সে কথা? না, আজ থাক্—ভাবিয়া-চিন্তিয়া দু'দিন পরে না হয়...

সেই ভালো!

৬

গৌরীর বিবাহের দিন আসন্ন হইয়া আসিল। নানা কথায় নানা আলোচনার মধ্যে অবু নিজের কল্পিত অভিপ্রায়টুকু খুলিয়া বলিতে পারিল না, এবং নিতান্ত যন্ত্রচালিতের মত বিবাহের দিন বরের জন্য সে একটি রিষ্ট ঘড়ি ও গৌরীর জন্য এক জোড়া ভালো রেশমী শাড়ী ও ফ্যান্সি এক ছড়া সোনার মফ্ চেন আনিয়া কানাই চক্রবর্ত্তীর

হাতে দিল। আনন্দে কানাইয়ের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। অবুর হাত ধরিয়া কানাই কহিলেন,—সব হচ্ছে, বাবা। তোমার এ স্নেহ মায়া, সব বুঝি। ভগবান্ তোমার ভালো করুন। কিন্তু আমি কাল থেকে যে একেবারে নিঃস্ব নিরাশ্রয় হ'তে বসেচি...

এ বেদনায় সান্ত্বনা নাই। যুগ-যুগ ধরিয়া এই বেদনা গভীরতম আনন্দের মুহূর্ত্তকে বেদনায় কাতর, উদ্বেল করিয়া আসিতেছে !...

যথাসময়ে বর আসিল এবং বিবাহ হইয়া গেল। শুধু অনুষ্ঠানটুকু —কোনো সমারোহ নাই, কিছু না। মাঙ্গল্য যেটুকু না করিলে নয়, সেইটুকুই। পাড়ার দু'চার জনকেও ডাকা হইয়াছিল। তার পর অশ্রুর সাগর বহাইয়া গৌরী চলিয়া গেল স্বামীর গৃহে, তার নূতন সংসার পাতিতে, মা-হারা শিশুর মা হইয়া তাকে বুকে লইতে !...

অবু বিবাহ দেখিয়া বুকে পাথর চাপিয়া গৃহে ফিরিল। তারো জীবনে যেন অনেকখানি কি উলট্-পালট্ হইয়া গেল। থাকিয়া থাকিয়া তার বুকেও কাঁটার আঘাত বাজিতেছিল। ঐ সেবা-নিপুণা সুশীলা বালিকা...জগতের বিরাট কলরব-কোলাহলের মধ্যে বুঝি চিরদিনের জন্যই হারাইয়া গেল! কি-ভাবে সেখানে ওর দিন কাটিবে, মাতৃ-হারার অন্তরের নিগূঢ় বেদনা সেখানে কে বুঝিবে, বুঝিবে কি না, তারও স্থিরতা নাই। আর কানাই চক্রবর্ত্তী? নদীর বারি-প্রসারের দিকে চাহিয়া থাকিবে...শূন্য ঘর, শূন্য শয্যা...হাসির যে মৃদু জ্যোৎস্নাটুকু তাঁর জীবনের পথে ঝরিয়াছিল, সেটুকুও আজ উবিয়া গিয়াছে !...

আরাম-কুটীরে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াও অবু দু'দিন যাইতে পারিল না। সেই ব্যথাতুর চিত্তের সামনে কি সান্ত্বনা লইয়া সে দাঁড়াইবে! ঘরে বসিয়া কল্পনায় আপনাকে সে সেই কুটীরের দিকে

ভাসাইয়া দিত...দীন শুষ্ক মূর্তি...হয় তো লেখা অক্ষরে কাগজের পর কাগজ ভরাইতেছেন, যদি লেখার মধ্যে মনের এই গভীর বিরহ-বেদনা ঢাকিয়া দিতে পারেন !...

দিনগুলা হু-হু করিয়া কোথা দিয়া যে কাটিয়া চলিল, সেদিকে তার খেয়ালও ছিল না ।...সহসা পরীক্ষার ফল বাহির হইল, এবং তার পরেই আচম্বিতে সে শুনিল, তার বিবাহ। হাইকোর্টের এক নামজাদা উকীলের কন্যা বধূ হইবে। শ্বশুর তার পিতার বন্ধু, মেয়েটিও রূপসী, শিক্ষিতা, অর্থাৎ একালে যেমন হইতে হয় !..

তরুণ বয়সের মোহ ! তবু সে কানাইকে ভুলিল না, গৌরীকেও না। মাকে বলিয়া ফেলিল, তাদের এ বিবাহে আনিতে হইবে। মা বলিলেন,—বেশ।...

বিবাহের দু'দিন পূর্ব্বে অবু আরাম-কুটীরে যাত্রা করিল, কানাই বাবুকে নিমন্ত্রণ ও সেখান হইতে তাঁকে লইয়া খিদিরপুরে গৌরীর শ্বশুরবাড়ী যাওয়া···

বাবলা-ঝোপের পাশে সেই বাড়ী! সেই বেড়া গলিয়া ভিতরে ঢুকিতে দেখে, বারান্দায় দু'তিন বছরের একটি শিশু, আর তার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া শুভ্র-বসনা এক তরুণী···

গৌরী ? তার এ বেশ ? অবুর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল !···

ইহারি মধ্যে ?...

তাই। কানাই চক্রবর্ত্তী কাঁদিয়া কহিলেন,—আজ এক মাস হলো, সব চুকে গেছে।···কি দরকার ছিল ? ওর জন্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওকে কোনোমতে একটা আশ্রয়ে তুলে দিলুম, নিজের খালি বুকের কথা না ভেবে, সব সহ্য ক'রে···! কিন্তু মা আমার দুশ্চিন্তার তুফান তুলে আমার ঘরে ফিরে এলো ! এই সংসার·· !

অবুর পকেটে বিবাহের ছাপানো চিঠি ছিল—সে চিঠি যেন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। অবুর চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। ভণ্ড, সে ভণ্ড...দুনিয়ার বেদরদ বুঝিয়া দুনিয়ার উপর চটিয়া আগুন হইয়া ছিল, অথচ নিজে দরদ দেখাইয়া কি না করিতে পারিত!. মন ধিক্কার তুলিয়া কহিল,—তুই যদি গৌরীকে বিবাহ করিতিস্—তাহা হইলে তার আজ এ দশা তো ঘটিত না! গৌরীর সমস্ত ভবিষ্যৎ নিমেষে চুর হইয়া গেছে—অথচ কোথা হইতে ঐ শিশুর ভার—বুড়ারও চিন্তার উপর এ কি আরো গভীর চিন্তা!...

অবু কহিল,—আমার একটি কথা দয়া করে রাখুন...

কানাই কহিলেন,—কি কথা, বাবা?

অবু কহিল,—আমার সঙ্গে গৌরীর বিবাহ দিন্...বেচারী একরত্তি মেয়ে...আমি রাজী।

কানাই কোনো কথা বলিলেন না। অবু কহিল,—আমি বিবাহ করবো গৌরীকে। এর জন্য সকলে আমায় যদি ত্যাগ করে, তবুও...

কানাই কহিলেন,—চঞ্চল হয়ো না, বাবা...কি মিথ্যা বিপদ কল্পনা ক'রে সেই বই লিখেছিলুম, তখনও জানতুম না, সংসারের যা সেরা বিপদ, তা আমার জন্য এ-ভাবে উদ্যত ছিল!...বাঙালীকে মানুষ হ'তে বলো তুমি—তাই হও বাবা, মানুষই হও। এ বিপদ মানুষের মত সহ্য করা ছাড়া উপায়ও যে নেই। এ বিধাতার দান।

অবু চীৎকার করিয়া ডাকিল,—গৌরী...

দ্বারপ্রান্তে গৌরী দাঁড়াইয়া ছিল। অবু তার পানে চাহিল—সেই হাসি-ভরা চোখ দুটি আজ কি ম্লান!... সহ্য হয় না।...

অবু কানাইয়ের পায়ের উপর পড়িয়া কহিল,—দয়া ক'রে এ অনুমতি দিন্। আমি বুঝতে পারিনি,—গৌরীর জীবন এ-ভাবে

শেষ হবার নয়। তার সেবা, তার গৃহিণীপণা দুনিয়ার একটি সংসারকেও যে পরিপাটী সুন্দর ক'রে তুলতে পারবে, একজন সংসারীও গৌরীর সাহচর্য্য পেয়ে বুঝবে, এ-দুনিয়ায় দারিদ্র্যের মধ্যেও শান্তি আছে, আরাম আছে।···গৌরীর সে-দান থেকে সে-সংসারকে, সে-সংসারীকে বঞ্চিত রাখ্‌বার আপনার কি সত্যই কোনো অধিকার আছে?···

গৌরী কথা কহিল,—অতি মৃদু স্বর! গৌরী বলিল,—ভুল করচো কেন, অবু-দা! এই যে শিশু—একে নিয়েই এক দিন আমি একটা সংসার গড়বো যে...একে সংসারী ক'রেই আমার সংসারকে আবার আমি এক দিন আয়ত্ত করবো...দু'দিন দেরী,···তা হোক! আমার বাবাও তো আমায় নিয়ে এক দিন আশায় বুক বাঁধ্‌তে পেরেছিলেন।···এবার বাবাতে আমাতে দু'জনে বুক বেঁধে আবার চেয়ে থাকবো সুদূর ভবিষ্যতের পানে। মানুষ আশাতেই বাঁচে, অবু-দা। এই আশা যদি না থাকতো মানুষের মনে, তা হ'লে দুনিয়ায় কি মানুষ বাঁচতো? না, দুনিয়া বাঁচার মত জায়গাই হতো?···

কথাটা বলিয়া গৌরী শিশুকে বুকে তুলিয়া লইল।

অবু তার পানে চাহিল,—গৌরীর চোখের কোলে জল টল-টল করিতেছে! সেই টলটলে জল-ভরা চোখে হাসির অতি-মৃদু কিরণ··· অপূর্ব্ব!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অবু কহিল,—তাই হোক, দিদি। আমাকেও তোমাদের পাশে স্থান দিয়ো···দূর ক'রে দিয়ো না কোনো দিন।···এই বেদনার মধ্যে এসে আমি যে শান্তি পাই, আর কোথাও তেমন পাই না।···এর মধ্যে আমার এই হাত যেটুকু স্নেহ, যেটুকু আরাম রচে তুলতে পারে, তাকে তা তুলতে দিয়ো, এই আমার মিনতি!

কানাই কহিলেন,—সুখ বড় তুচ্ছ, বাবা, মনের উপর কোনো ছাপ রাখে না—মনকে গড়তেও পারে না। কিন্তু দুঃখ, বেদনা… যে মনের দাম জানে, দুঃখ-বেদনার দামও তার কাছে অনেক বেশী, বাবা!…

সে রাত্রে অরু আর গৃহে ফিরিল না। বাড়ীতে একটা চিঠি লিখিয়া দিল মা'র নামে—

আমি বিবাহ করিব না! দুনিয়ায় বিবাহ করিবে কি সকলেই? না। আমায় ক্ষমা করো মা। কিছু দিন নিরুদ্দেশ রহিলাম। ভাবিয়ো না। মাঝে মাঝে খপর দিব এবং এক দিন দেখাও হইবে। দু'দিন বিরলে বসিয়া শুধু ভাবিতে চাই, মানুষ তার মনের শক্তি লইয়া জন্মটাকে কি-ভাবে সফল করিতে পারে এবং কি-ভাবে তা করা উচিত।

তপশ্চর্য্যা

১

"উজ্জ্বলা" সাপ্তাহিক কাগজ। তাই বলিয়া রাজ্যের খবরই শুধু ছাপা হয় না। 'উজ্জ্বলায়' ধারাবাহিক উপন্যাস, ছোট গল্প, কবিতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ—সবই ছাপা হয়। সেই সঙ্গে পশার জমাইবার উদ্দেশ্যে থিয়েটার-বায়োস্কোপের আলোচনাও রীতিমত প্রতি-সপ্তাহে ছাপা হয়। এই বিভাগের লেখক শ্রীপদ চক্রবর্ত্তী। 'কুটুস্-কামড়' বিভাগে থিয়েটার-বায়োস্কোপের আলোচনা চলে; এবং শ্রীপদ স্বনামে এ-বিভাগের দণ্ড-মণ্ড পরিচালনা করে, তেমন ধারণা যদি কাহারো থাকে তো সে ভুল। এ বিভাগ-পরিচালনায় ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রয়োজন, এবং তা অকারণও নয়। শ্রীপদর সে ছদ্ম-নামটুকু "শ্রীবৃশ্চিক শর্ম্মা।"

ছদ্মনাম কাগজে ছাপা হইলেও রঙ্গ-জগৎ-সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন, এ শ্রীবৃশ্চিক শর্ম্মা শ্রীমান্ শ্রীপদ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীপদ তিন-বার বি, এ পরীক্ষা দিয়াছিল, কিন্তু···

সে-কথার আলোচনার প্রয়োজন নাই। বি, এ পাশ করিলেই কিছু সর্ব্ব-বিদ্যায় বিশারদ হওয়া যায় না, তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বাহিরে সে প্রমাণের জন্য না ছুটিয়া শ্রীপদকে দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি, তার রোগা দেহ এবং ছোট্ট মাথাটুকুর মধ্যে বিশ্বের সকল সাহিত্য, সকল আর্ট এবং সমালোচনাযোগ্য মিষ্ট ও ঝাঁজালো ভাষা একেবারে ঠাশা! পাব্‌লোভার নাচ দেখিয়া আসিয়া কাগজে সে এমন আলোচনা ছাপাইয়া দিল, এত কোটেশনে ভরিয়া যে, লোকের

তাক্ লাগিয়া গেল! নাচ দেখিয়া দর্শক যে আনন্দ পাইয়াছিল, তার সমালোচনার পাণ্ডিত্যের নীচে সে আনন্দ হাঁফাইয়া মরিল এবং 'উজ্জলা'য় সে-নাচের আলোচনা পড়িয়া কণ্টকিত বিস্ময়ে তা'রা ভাবিল, এত বিজ্ঞান, এমন ব্যাপার ঐ নাচের মধ্যে...আর তা'রা তা না বুঝিয়া শুধু দেখিয়া আসিল কতকগুলা বিচিত্র ভঙ্গী···সে ভঙ্গী শুধু মুগ্ধ করিয়াছিল—নাচে এনসাইক্লোপিডিয়ার অস্তিত্বের আভাসও জাগায় নাই!

শুধু পাব্‌লোভা কেন? বাঙ্‌লা থিয়েটারের অভিনয়! যে অভিনয় দর্শকের ভালো লাগে, বৃশ্চিক শর্ম্মার দংষ্ট্রার আঘাতে তাহাই দাঁড়ায় 'কিস্স্যু নয়'! এবং যে-অভিনয় তাদের অসহ্য ঠেকে, তাহারি ব্যাখ্যা করিতে বৃশ্চিক শর্ম্মা রুশ, জার্ম্মান, সুইডিশ অভিনেতার নাম পাড়িয়া এমন হেঁয়ালি গড়িয়া তোলে যে, বেচারা দর্শকের দল রীতিমত ভয় পাইয়া যায়। অভিনয় দেখার সহজ আনন্দ তাদের বিলুপ্ত হইয়াছে। কোনো জায়গা ভালো লাগিলে তারা আর আনন্দ পায় না, ভাবে, ওগুলা হয় তো ফাঁকি! যেখানটা অসহ্য বোধ হয়, সেখানটায় চুপ করিয়া থাকে, 'উজ্জলায়' না-জানি কি গভীর গবেষণা বাহির হইবে! অর্থাৎ 'উজ্জলা' কাগজ বাহির হইবার আগে যে-আনন্দ রঙ্গমঞ্চে দর্শকের অনায়াস-লভ্য ছিল, এখন তাহা বিভীষিকায় রূপান্তরিত হইয়াছে!

'উজ্জলায়' বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ-কথা বলিতে বসি নাই। এ-কথা খুলিয়া না বলিলে শ্রীপদর পরিচয় পাছে অসম্পূর্ণ থাকে, শুধু এই উদ্দেশ্যেই দু'চারি কথা বলা।

অর্থাৎ সাহিত্যের বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রীপদর বেশ একটু প্রতিপত্তি জমিয়া গিয়াছে। ইহার উপর রেডিও-ব্রড্‌কাস্‌টিংয়ে সে গিয়া মাঝে

মাঝে উদয় হয় এবং কন্‌টিনেণ্টাল সাহিত্য সম্বন্ধে এমন সব নূতন তথ্য শুনাইয়া দেয় যে, 'লিস্‌নাররা' হতভম্ব হইয়া উঠে!

উজ্জলার প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। যাদের সঙ্গে সম্পাদক-সঙ্ঘের পরিচয় নাই, তারা এ দলটিকে ভয় করে। কারণ, এমন বেপরোয়া—উজ্জলা-দলের মতে নির্ভীক—মতামত চালাইতে তৎপর আর কেহ নাই! যাদের সঙ্গে এ-দলের ঘনিষ্ঠতা, তারা বলে, বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রাণ বহিয়া আনিয়াছে উজ্জলা! সমাজ-সাহিত্য এবারে একদম্ স্বর্গে না উঠুক, ও-পথে দু'চারি ধাপ যে ঠেলিয়া উঠিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই!

২

'উজ্জলা'য় কয়েকটি মহিলা-লেখিকার লেখা কবিতা ও সন্দর্ভ নিয়মিত ছাপা হয়। শ্রীমতী শিখরিণী দেবীর কবিতা, তপস্বিনী দেবীর সামাজিক আলোচনা, বিশ্বজিতা দেবীর গল্প এবং মার্কণ্ডেয়ী দেবীর সাহিত্যিক সন্দর্ভ—ইঁহাদের লেখা নহিলে 'উজ্জলা'র পাঠক-পাঠিকার দলে হাহাকার উঠে। এ আমাদের অনুমান নয়—'উজ্জলা'তেই মাঝে-মাঝে চিঠি-পত্রে পাঠক-পাঠিকার বিলাপ মর্ম্মরিয়া উঠে। কেহ লেখেন, এ সপ্তাহে শিখরিণী দেবীর কবিতা নাই কেন? বিশ্বজিতা দেবীর শরীর ভালো তো? তাঁর গল্প দেখিলাম না যে? আর মার্কেণ্ডেয়ী দেবী কি এখনো ট্রিচিনোপলি হইতে ফেরেন নাই? তাঁর লেখা 'ভঙ্গ-সমাজ' উপন্যাসের সমালোচনা উজ্জলায় এখনো ছাপা হইল না? ইত্যাদি।

ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী তপস্বিনী দেবী উজ্জলা-অফিসে মাঝে মাঝে আসিয়া উদয় হন। পরণে খদ্দর, পায়ে নাগরা জুতা—ভঙ্গিম দেহ-

নতা—ভারতীয় চিত্রের সঠিক মডেল না হোক, কতকটা তারি গা ঘেঁষিয়া যায়! বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম বলা চলে, পক্ষপাতিতার বলে! তবে দুই চোখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা! তিনি অনর্গল বকিতে পারেন। নিজের মত সুপ্রতিষ্ঠ করিতে, বিরুদ্ধ মতকে শ্লেষ-জর্জ্জর বাণে বিঁধিতে এতটুকু বাধে না! অবশ্য, বাঙলার নারী-পুরুষকে চিরদিনই তর্কে পরাস্ত করিয়া আসিতেছেন—এটা তপস্বিনীর পক্ষে খুব বড় সার্টিফিকেট নয়. তবে তাঁর তর্কে বহ্নি জ্বলিলে মিনতির অজস্র বর্ষণেও তা নিবিতে জানে না. তাঁর সম্বন্ধে এইটাই সব চেয়ে বড় কথা!

আলোচনা-সূত্রে শ্রীপদর সঙ্গে তপস্বিনী দেবীর ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। জন্মিলেও শ্রীপদ তাঁর পরিচয়-গ্রহণে কখনো সাহসী হয় নাই। অর্থাৎ তাঁর কে আছে, তাঁর জীবনের কি লক্ষ্য, এ সব উজ্জ্বলা-কোম্পানির অবিদিত ছিল। শ্রীপদ ভাবিত, সামাজিক আলোচনা লইয়া যতই মাতিয়া থাকুন, তপস্বিনী দেবীর পারিবারিক আদর্শ...

জানিবার জন্য মন উৎসুক হইয়া উঠিত; কিন্তু জানিবার উপায় ছিল না। অন্য লোককে বহু প্রশ্ন করিয়া শুধু এইটুকু জানিয়াছিল, তপস্বিনী দেবীর বাবার পয়সা-কড়ি আছে। তিনি থাকেন বালিগঞ্জ ষ্টেশনের পূর্ব্বে কশবা গ্রামে। ট্রেণে করিয়া তপস্বিনী উজ্জ্বলা-আফিসে আসেন। নারীর যে স্বাভাবিক কুণ্ঠা—স্বাধীন আব্‌হাওয়ায় যে কুণ্ঠা মারা যায় নাই, দেখে, সে কুণ্ঠা ইঁহার কোথাও নাই। এই জন্যই বুঝি সকলের শ্রদ্ধা তপস্বিনী দেবী একটু বেশী রকম আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় উজ্জ্বলা-কোম্পানির সকলে ম্যাচ দেখিতে গিয়াছিল। শ্রীপদ একা অফিসে বসিয়া 'কুটুস্-কামড়ে'র লেখনী-দংষ্ট্রা শাসাইতেছিল, অর্থাৎ প্রুফ দেখিতেছিল। তপস্বিনী দেবী আসিয়া ডাকিলেন,—শ্রীপদবাবু...

শ্রীপদ প্রুফ হইতে চোখ তুলিল, চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল,—আপনি! আসুন...

তপস্বিনী দেবী কহিলেন,—আপনার প্রুফ দেখতে কত সময় লাগবে আরো?

শ্রীপদ কহিল,—কেন বলুন তো...

তপস্বিনী দেবী কহিলেন,—আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল... মানে, আজ ভিড় নেই। ক'দিন থেকেই কথাটা বলবো-বলবো ভাবচি...খুব গোপন কথা! একেবারে মনের নিভৃত কোণের...

শ্রীপদর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এ-বয়সে তরুণীর মুখ হইতে এতখানি বিশ্বস্ততার আভাসে তরুণের বুক ছাঁৎ করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক! 'কুটুস্ কামড়' হইতে তার মন একেবারে কাব্যলোকে উধাও হইল। সে তপস্বিনীর পানে চাহিল।

তপস্বিনীর মুখে ও কি লজ্জার রক্তিম আভাস...না?

শ্রীপদ মুখ নামাইল; তার পর একটা ঢোক গিলিয়া কহিল,— থাকুক প্রুফ অনেক লাইন বদ্‌লাতে হবে। একটু চিন্তার কথা!...

তপস্বিনী দেবী প্রুফগুলার পানে চাহিয়া কহিলেন,—কাকে কামড় দিচ্ছেন এবার?

শ্রীপদ কহিল,—ঐ যে গবলিন্ থিয়েটারে নতুন নাটক খুলেচে, ঘটোৎকচ...

তপস্বিনী কহিলেন—সুখ্যাতি ক'রে ফেলেছিলেন বুঝি? এখন...

শ্রীপদ কহিল,—হ্যা। এখন দেখ্‌চি, নতুন লেখককে বড্ড বাড়িয়ে দেওয়া হয়েচে! চিনি না—খামোকা তাকে বাড়িয়ে দেবো? এ আমাদের পলিশির বিরুদ্ধে কি না...

তপস্বিনী হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—তা ব'লে বেচারীর প্রাপ্য সুখ্যাতি থেকে তাকে বঞ্চিত করবেন ?

শ্রীপদ হাসিয়া কহিল—দেখুন তপস্বিনী দেবী, আপনি আমাদেরি একজন। আপনার কাছে কথাটা গোপন করবো না। কাগজ বার করলেই তার একটা principle এবং policy থাকা দরকার। সঙ্ঘ-বদ্ধ না হলে শক্তি-সঞ্চয় সম্ভব নয়। কাজেই...অর্থাৎ জাইগ্যাণ্টিক থিয়েটার প্রতি সপ্তাহে আধ-পাতা বিজ্ঞাপন দিচ্ছে আমাদের কাগজে—তা ছাড়া যাকে পাশ দি, তাকেই শীট্ দিয়ে honour করে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হলো এই গবলিন্ থিয়েটার।...জাইগ্যাণ্টিকে নতুন বই খুলেচে, 'গন্ধমাদন'...তেমন জমচে না, আমরা তার বহুৎ তারিফ ছাপাচ্ছি। যদি এর মধ্যে এদের 'ঘটোৎকচ'টা জমে ওঠে, তা হলে গন্ধমাদন' একদম fail করবে, তাই...

—ওঃ! বলিয়া তপস্বিনী দেবী হাসিয়া মুখ ফিরাইলেন।

শ্রীপদ কহিল—চা আনতে বলি ?

—চা! আচ্ছা বলুন···কিন্তু আমার কথাটা...বেশ নিরিবিলি ছিল আজ। তপস্বিনী চারিদিকে চাহিলেন।

শ্রীপদর বুকটা আবার ছাঁৎ করিল। শ্রীপদ কহিল,—গোপনীয় কথা ?

—হুঁ। বলিয়া তপস্বিনী কেমন একটু দ্বিধা-জড়িত চিত্তে চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীপদর সর্ব্বাঙ্গে একটা শিহরণ ..! শ্রীপদ ডাকিল - রঘুয়া...

বেয়ারা রঘুয়া আসিল। শ্রীপদ কহিল—চা আন্ এক পেয়ালা।

তপস্বিনী কহিলেন,—এক পেয়ালা ? আপনি খাবেন না ?

—খাবো ? শ্রীপদ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তপস্বিনীর পানে চাহিল ; তার পর কহিল,—আচ্ছা...ওরে, দু-পেয়ালাই আন্ ..কথাটা বলিয়া একটা শ্লিপ টানিয়া, দু-পেয়ালা চা লিখিয়া তার তলায় নিজের নাম সই করিয়া তারিখ লিখিয়া শ্রীপদ রঘুয়ার হাতে শ্লিপখানা দিল। শ্লিপ লইয়া রঘুয়া চলিয়া গেল।

শ্রীপদর মন অধীর হইয়া উঠিল! কি কথা? গোপন কথা! গোপন ?...তার মনে একটা বাসনা ধীরে ধীরে সম্প্রতি উদয় হইতেছিল ...একটু আশা···কিন্তু থাব্ড়া দিয়া সে আশা, সে বাসনাকে সে বসাইয়া দেয়। তাই কি ?···

সিঁড়িতে দুপদাপ কতকগুলো শব্দ···জুতার শব্দ! কারা আসে না কি ?

তাই।

কবি বেচারাম নন্দী, চিত্রশিল্পী মনসাচরণ গুঁই, আর নবীন পাব্লিশার জনার্দ্দন সাধুখাঁ।

শ্রীপদ কহিল,—ব্যাপার কি হে ?

বেচারাম কহিল,—একটা বক্স আজ চাই আমাদের শ্রীপদ বাবু, ঐ জাইগ্যান্টিকে

শ্রীপদ কহিলেন,—বক্স কেন ? অন্য শীট নাও।

মনসা কহিল,—নীচের শীটে ঢের বসেচি। বক্সই চাই। মানে, একটি মহিলা-বন্ধুও যাবেন সঙ্গে।

মহিলা-বন্ধু! শ্রীপদ মনসার পানে চাহিল।

বেচারাম কহিল,—শ্রীমতী বিম্ববতী পাল ঐ যে ফিল্মে নামচেন ...ট্রান্স-গ্যাঞ্জেটিকদের নতুন ছবি উঠবে,—উর্ব্বশী ..তাতে উনি সাজচেন উর্ব্বশী। তিনি থিয়েটার দেখতে চান্। তাই···

মনসা গুঁই কহিল,—ওদের আর্ট-ডিরেক্টর হয়েচি আমি ..অবশ্য মাহিনা পাবো না—তবে একটা publicity...

শ্রীপদ তাড়াতাড়ি একখানা শ্লিপ লিখিয়া দিল। পাপগুলা বিদায় হইলে সে বাঁচে!

পাশ লইয়াও তারা নড়িল না। জনার্দ্দন সাধুখাঁ কহিল,—তপস্বিনী দেবী, দেখেচেন ওদের গন্ধমাদন?

তপস্বিনী কহিলেন,—না।

বেচারাম কহিল.—এসো। বিম্ববতী পালকে খবর দিতে হবে। তা হলে আজ আসি। নমস্কার তপস্বিনী দেবী, নমস্কার শ্রীপদ বাবু...

তারা বিদায় লইল। এদিককার আব্‌হাওয়াটুকুও যেন ও বদ্‌ হাওয়ায় ফাঁসিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে! তপস্বিনী চুপ! শ্রীপদ ভাবিল, আবার যেন নূতন করিয়া কথার খেই ধরিতে হইবে! কিন্তু কথা তোলা যায় কি করিয়া ..?

তপস্বিনীই কথা পাড়িলেন; কহিলেন,—এখানে সে-কথা সম্ভব নয় দেখচি। কখন্ কে আসে!...আপনি এক কাজ করতে পারেন?

—বলুন।

—কাল কোনো সময় আমার বাড়ী আসতে পারেন? সন্ধ্যার দিকে?

শ্রীপদর মন উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। সকালে যদি হয় তো সন্ধ্যা অবধি ধৈর্য্য ধরার কি প্রয়োজন? সে কহিল.—বেশ। কাল সকালেও .. না, কাজ কিছু ছিল না।

তপস্বিনী দেবী কি ভাবিতেছিলেন ..শ্রীপদ তাঁর পানে চাহিয়া... যেন সে ডকের আসামী আর তপস্বিনী দেবী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর মুখের কথা যেন ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়...তেমনি অধীরতা শ্রীপদর বুকে!

তপস্বিনী দেবী কহিলেন,—সন্ধ্যায় হলেই ভালো হয়...বুঝলেন! আলো-আঁধারি! আমার ওখানেই তা হলে নৈশ ভোজন সম্পন্ন করবেন!

শ্রীপদ কহিল,—এ মস্ত অনুগ্রহ···শিরোধার্য্য করলুম।··

সিঁড়িতে আবার জুতার শব্দ!···আঃ!

শ্রীপদ ভাবিল, ইহারা সকলে যেন ষড় করিয়াছে!

তপস্বিনী দেবী কহিলেন,—আজ তা হলে উঠি···এই কথাই রইলো তবে।

তিনি উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকিল এক তরুণ যুবা। সে কহিল,—একটি লেখা এনেচি, উজ্জ্বলার জন্য...

শ্রীপদ বিরক্ত হইয়া কহিল,—রেখে যান ঐ টেবিলে!

তপস্বিনী দেবীও দ্বিতীয় কথা না তুলিয়া বিদায় লইলেন।

৩

গর্বলিন্ থিয়েটারের 'ঘটোৎকচে'র ভাগ্য ভালো! শ্রীপদ তাকে হত্যা করিতে পারিল না, যেহেতু তার মাথায় এমন সব রকমারি ফুল ফুটিতে লাগিল···তার পাপড়িতে পাপড়িতে শ্রীমতী তপস্বিনীর মুখ সেই ফুলে সে পুষ্পাঞ্জলি দিলে ঘটোৎকচের শিরে! কল্পনা-নেত্রে শ্রীপদ দেখিল, ছোটখাটো ফুলের বাগান···তারি সঙ্গে এক কম্পাউণ্ডে ফ্লোরের উপর পরিচ্ছন্ন একখানি একতলা বাড়ী···ইলেকট্রিক ফিটিং, মোটর-গেরাজ্—সব আছে। বারান্দায় বেতের আর্মচেয়ার—তাহাতে বসিয়া শ্রীমতী তপস্বিনী দেবী কবিতা লিখিতেছেন; আর সে নামিল মোটর হইতে, তার হাতে প্রুফ!

প্রথম যৌবনে এমন ছবি অনেকে আঁকে—ঐ একতলা বাড়ী, বাগান, আলো, মোটর-গেরাজ সেই সঙ্গে...

নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীপদ ভাবিল, কি সাধে এমন নিঃসঙ্গ জীবন বহিয়া মরি! থিয়েটারে-বায়োস্কোপে ঘুরিয়া ফিরি...আমোদের জন্য নয়...কারো মন রক্ষা, কারো দফা রফা ..একটি চিন্তা সেই সঙ্গে বিজড়িত—অর্থ! ষ্টেজে অভিনয়, পর্দ্দায় ছবি চলে, মন তখন লাগ্‌সই টিপ্পনীর জন্য ভাষার গহনে দিশাহারা ঘুরিতে থাকে, ...এই থিয়েটার দেখিয়া, বায়োস্কোপ দেখিয়া তাকে পয়সা রোজগার করিতে হইবে। আমোদ আজ আর আমোদ নাই—সে সেই ট্রিগনমেট্রির অঙ্ক কষা। কর্ত্তব্য। ..

পরের দিন ..কি করিয়া কাটিল, বলিবার নয়। লিখিতে বসিলে ভাব-ভাষা কাঁপিয়া সরিয়া যায়...কি লিখিবে, শ্রীপদ ভাবিয়া পায় না।

উজ্জ্বলা অফিসের দিকে পা বাড়াইল না - কি জানি, কি ফরমাশ সাড়া দেয়. কি কাজে লিপ্ত হইতে হয়!

বেলা পড়িবামাত্র মুখে-হাতে সাবান ঘসিয়া, মাথায় ব্রশ চালাইয়া ফিটফাট সাজিয়া সে আসিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিল এবং নামিল বালিগঞ্জ ষ্টেশনে।

বুকটা বারেকের জন্য ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বাঁ-চোখটা নাচিয়া উঠিল না কি? না, কয়লা পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয় কর্-কর্ করে। তবু কে জানে...কেমন কুসংস্কার।

তপস্বিনীর গৃহে শ্রীপদ কখনো আসে নাই, তবে খুঁজিতে কষ্ট হইল না। তপস্বিনী বলিয়া দিয়াছিলেন, ষ্টেশনে নামিয়া সোজা পূব দিকে মিনিট পনেরো চলা, তার পরই একটা মন্দির; মন্দিরের গায়ে ফুলের বাগান, বাগানের লাগাও একতলা বাড়ী...ফটকে পাথরের ছোট ফলকে সোনালি অক্ষরে বাঙ্‌লায় লেখা 'তপোবন'। শ্রীপদ ফটকে ঢুকিল। তার কল্পনা ছলনা করে নাই! ফ্লোরের উপর

বারান্দা. বারান্দায় বেতের চেয়ার···এবং সে-চেয়ারে তপস্বিনীও! বাঃ! শ্রীপদকে দেখিয়া তপস্বিনী কহিল, – আসুন...

শ্রীপদ বারান্দায় উঠিয়া চেয়ারে বসিল। তপস্বিনী কহিল,— আমি ঘড়ির কাঁটার পানে চেয়ে ব'সে আছি।

এমন অধীর প্রতীক্ষা! শ্রীপদ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

তপস্বিনী কহিল.—বসুন. চা দিতে বলি। তার পর চা খাওয়া হলে সে-কথা বল্‌বো...

শ্রীপদ কহিল,– বেশ!...মোদ্দা, কি নতুন কবিতা লিখ্‌লেন? পড়াবেন?

তপস্বিনী কহিল,—কবিতা-টবিতার কথা রাখুন। ও-সব ছেলে-খেলা আর নয়। তপস্বিনী নিশ্বাস ফেলিয়া দ্রুত ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।...

শ্রীপদ ভাবিল, তাই! নিশ্চয়, তাই। কিন্তু সম্পাদক মারুতি-দা, অমন যে ব্যোম্ ভোলানাথ কবি মথুর রক্ষিত—তাদের টপ্‌কাইয়া তপস্বিনীর চিত্ত শ্রীপদকে বাছিয়া লইল!..'কুটুস-কামড়ের' 'হিটে' রস-বোধ তার কতখানি, তপস্বিনী সে পরিচয় পাইয়াছে, তাঁরও রস-বোধ আছে তো! সুতরাং ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে!...

চায়ের পেয়ালার শেষ হইলে তপস্বিনী কহিল,—ঐ ঘরে চলুন। ঘরে আসা হইল। শ্রীপদ কোনোমতে কুণ্ঠা কাটাইয়া প্রশ্ন করিল.—বলুন আপনার মনের গোপন কথা···

তপস্বিনী লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল! বলিবার বহু প্রয়াস··· তবু কোথা হইতে কি-লজ্জা আসিয়া যে কণ্ঠ চাপিয়া ধরে! মুখে সলজ্জ মৃদু হাসি! তপস্বিনী কহিল,—না—কি মনে ভাববেন আপনি! আমার ভারী লজ্জা করচে···না। আমি লিখে জানাই···

শ্রীপদর মনে কোনো সংশয় রহিল না, মনস্তত্ত্বের সংবাদ সেও বড় অল্প রাখে না! দেশী নাটক, বিদেশী ফিল্‌ম্ এ তো মনস্তত্ত্বেরই লীলা-ক্ষেত্র! আর সে লীলা-ক্ষেত্রে তার কি অবাধ অধিকার! অতএব...

তপস্বিনী উঠিয়া গেল। শ্রীপদ যোগ্য কি উত্তর দিবে, তরুণী তপস্বিনীর প্রণয়-নিবেদনে...ষ্টেজে-দেখা নাটকের পাতা হইতে সেই সব কথা-সংগ্রহে সে মত্ত হইল।...

কম্পিত হাতে চিঠি আসিল! চিঠি দিয়া তপস্বিনী কহিল,—দাঁড়ান, আমি স'রে যাই আগে। তার পর। আমার সাম্‌নে চিঠি খুলবেন না...

শ্রীপদর মনে হইল, তপস্বিনীর দুই হাত ধরিয়া তাকে একেবারে বুকে টানিয়া বলে, চিঠির প্রয়োজন কি, তপস্বিনী?...আমিও তোমার প্রণয়-তাপে তপস্বী! কিসের লজ্জা তোমার! কিন্তু কথাগুলা ঠিক করিয়া লইবার পূর্ব্বেই তপস্বিনী সরিয়া গেল। শ্রীপদ খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। চিঠি নেহাৎ ছোট নয়। উপরে কোন সম্বোধন নাই। চিঠিতে লেখা আছে,—

আমি মহা-বিপত্তি ঘটাইয়াছি—নিজের পায়ে হয় তো কুড়ুল মারিয়াছি। কবিতাকে বিদায় দিয়াছি। কিসের লোভে? হয় তো বলিবেন, এ আমার বাতুলতা! এ আশা দুরাশা। তবু এ দুর্ব্বার লোভ রোধ করা গেল না।

আমি উপন্যাস লিখিয়াছি। Sex-সমস্যা লইয়া। আপনি ক্রিটিক আপনার মত চাই। যদি বলেন, ছাপিলে নাম হইবে, তবেই ছাপিব।

'উজ্জ্বলায়' ছাপা যায় কি? যদি যায়, তবে ছদ্মনামে ছাপিতে চাই। সমালোচকরা পুরুষ—তাই বড় হৃদয়-হীন। আপনার লেখনীও অজ্ঞাতে পাছে নির্ম্মম আঘাত করে,—তাই আপনার কাছে

এ গোপন কথা প্রকাশ করিলাম। যদি বোঝেন, চলন-সই, তবে খুব দুন্দুভি-নাদ করা চাই···বন্ধু-কৃত্য। এ ঋণ শুধিতে আমি কৃপণতা করিব না!

খাতাখানি দয়া করিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু সাবধান, এ-সম্বন্ধে একটি কথাও এখন তুলিবেন না।..আপনাকে পাশে দাঁড়াইয়া আমার সহায় হইতে হইবে, সাহিত্যক্ষেত্রে আমার এই প্রথম প্রবেশ-মুখে।

উপন্যাসের নাম দিয়াছি—"প্রাণ-চক্র"। অথরের ছদ্মনাম লইয়াছি "শ্রীমতী উন্মত্তা দেবী"। ব্যবসা হিসাবে মন্দ? সাহিত্য আর ব্যবসা-বুদ্ধি একসঙ্গে মিশিলে তবেই বাঙ্‌লা-সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যে আসন পাতিতে পারিবে। নয় কি?

এই! উপন্যাস লেখা। প্রণয় নয়—তার আভাস-মাত্র না!

শ্রীপদ যেন দোতলা-বাশ্ হইতে দুম্ করিয়া পথে পড়িয়া গেল! ...চোখে তখন তবে কয়লা পড়ে নাই, বাম চক্ষু সত্যই নৃত্যই করিয়াছিল!.. সে তবে কুসংস্কার নয়!...

মন তিক্ত হইয়া গেল। তরুণ বয়সেও নারী স্বার্থ ভোলে না... হায় রে!

৪

'প্রাণ-চক্র' বাহির হইল। মহাদেব সতীদেহকে যেমন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, তেমন টুকরা-টুকরা ভাবে মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠা বহিয়া সে দেখা দিল না—দেখা দিল, একেবারে বিলাতী বাঁধাইয়ে-ঘেরা মোটা এ্যান্টীক কাগজে পাইকা অক্ষরে ছাপিয়া গ্রন্থাকারে।

প্রকাশকের নামও ছদ্ম-বেশে দেখা দিল। বই বাহির হইবামাত্র স্ব-নামে, বে-নামে বন্ধু-নামে, তার সমালোচনা ছাপাইয়া শ্রীপদ এমন কলরব তুলিল যে, বাঙ্‌লা দেশে নরনারীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অস্থির

হইয়া তারা ভাবিল. ভালো জ্বালা...কি এমন উপন্যাস রে বাপু, যে. যে-কাগজ খুলি, 'প্রাণ-চক্র' আর 'প্রাণ-চক্র'—লেখিকা শ্রীমতী উন্মত্তা দেবী!...বিরক্তি, কৌতূহল, সবগুলা যখন একসঙ্গে তাল-গোল পাকাইয়া বসিয়াছে, তখন 'উজ্জ্বলায়' সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইল,—

"এ কি শুনি ?—চোর, না, খুনী ?
বক্র করে 'প্রাণ-চক্র' ভাগ্য !
অশ্লীলতার আইনে, আদালতের ফাইনে
সাহিত্যের হবে বিচার ? দেশবাসী, তোরা জাগ্ গো !"

সম্পাদক মারুতি-দার ষ্টাইলের এইটুকুই বিশেষত্ব—এই ছড়ায় টিপ্পনী! এ টিপ্পনী তার শিষ্যেরা একত্র জড়ো করিয়া রাখিতেছে—ইচ্ছা আছে, এমনি হাজার ছড়া জমিলে "মারুতি-কথামৃত" নামে ছাপাইয়া মফঃস্বল হইতে দু'পয়সা কামাইয়া লইবে।

কিন্তু এ-কথা নিতান্ত অবান্তর। আমরা "মারুতি-চরিত" লিখিতে বসি নাই তো!

উজ্জ্বলায় এ টিপ্পনী বাহির হইবামাত্র 'প্রাণ-চক্র' হুড়-হুড় করিয়া বিক্রয় হইতে লাগিল।

শ্রীপদ আসিয়া সকালে তপস্বিনীর সঙ্গে দেখা করিয়া কহিল,—যে চাল চেলেছি,—কেমন বিক্রী বেড়েচে, বলুন...

তপস্বিনী কহিলেন,—আপনাকে ধন্যবাদ ! মোদ্দা বিপদও ঘটেচে একটু।

—বিপদ আবার কি ?

তপস্বিনী কহিল,—এমন অভদ্র হয়ে গেল বইখানা...যে, ও ছদ্ম-নাম থেকে নিজের নামকে উদ্ধার করতে পারবো না কোনো দিন।

শ্রীপদ কহিল,—ওটা বিজ্ঞাপনী চাল। একে স্ত্রীলোকের লেখা, তার উপর অশ্লীলতার ইঙ্গিত! ও বইয়ের বিক্রী কি বন্ধ থাকে! তা ছাড়া ভাববেন না। দ্বিতীয় সংস্করণের বেলায় আমি উজ্জ্বলায় বেশ খানিকটা Sex-pshychologyর নোট দেবো'খন।...অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকারা নিজেদের যত বুদ্ধিমানই ঠাওরান, আমরা জানি, তাঁরা ভোলেন শুধু কাঁশর-ঘণ্টার কলরোলে।* আমরা ফতোয়া দিয়ে যে-বইকে বলবো ভালো, সে-বই তারা শিরোধার্য্য করবে। তা যদি না হতো, তবে সাধ্য থাকতো আমাদের এই অনিন্দ্য দত্ত, মার্ত্তণ্ড বোস্‌দের মাথা তুলে দাঁড়াবার? রবিবাবুর বইয়ের চেয়েও এদের বই বিক্রী হয় বেশী, সে খোঁজ রাখেন?......

'প্রাণ-চক্র' লইয়া তপস্বিনীর সহিত শ্রীপদর অন্তরঙ্গতা ক্রমে এমন বাড়িয়া উঠিল যে, উজ্জ্বলার সম্পাদক-সঙ্ঘ তা লইয়া দু'চারিটা বক্র ইঙ্গিত করিতে ছাড়িল না। সে ইঙ্গিত শ্রীপদর ভালো লাগিল। মুখে সে বলিত,—কি ফাজ্‌লামি করো!

মারুতি-দাও শেষে গাম্ভীর্য্য ভাঙ্গিয়া কহিল,—পয়সা-কড়ি আছে ওঁর...যদি নিবিড়-ভাবে বাঁধ্‌তে পারো তো উচ্ছল প্রবাহে জীবন-তরী ভাসিয়ে যেতে পারবে!

শ্রীপদ তা বোঝে, কিন্তু 'প্রাণ-চক্র' লইয়া নানা আলোচনার মধ্যেও নিজের প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো পরিচয় সে তপস্বিনীকে দিতে পারিল না। তপস্বিনীর দিক হইতেও তেমন আভাস কোন দিন পাইল না। উদ্‌গ্রীব হইয়া তপস্বিনীর প্রতি কথা

---

* সুধী পাঠক-পাঠিকা ক্ষমা করিবেন। এ মন্তব্য শ্রীপদ চক্রবর্ত্তী ওরফে বৃশ্চিক শর্ম্মা ও তাদের 'উজ্জ্বলা' দলের। আমার নয়।—লেখক।

সে বিশ্লেষণ করিত, তার মধ্য হইতে এতটুকু ইঙ্গিত যদি পায়! কিন্তু কিছু না!...

সেদিন শ্রীপদ আসিলে তপস্বিনী কহিল,—জনার্দ্দন সাধুখাঁ নতুন পাব্‌লিশার,...তার পয়সা অনেক—না?

শ্রীপদ কহিল,—শুনেচি, কিন্তু সে-কথা...!

তপস্বিনী কহিল,—বেচারাম নন্দী তার ম্যানেজার...তারি কথায় জনার্দ্দন ওঠে বসে...

শ্রীপদ কহিল,—বটে! উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত।

তপস্বিনী কহিল,—ওরা প্রাণ-চক্রর দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপ্‌বে। আমায় একেবারে এক হাজার টাকা দেবে। বইয়ে আমার নিজের নাম দিতে হবে। ছদ্মনাম নয়।

শ্রীপদ কহিল,—নিজের নাম? কেন উন্মত্তা দেবী?

ঘাড় নাড়িয়া তপস্বিনী কহিল,—না,...একেবারে শ্রীমতী তপস্বিনী...

শ্রীপদ গম্ভীর হইয়া রহিল। তপস্বিনী কহিল,—বেচারাম বাবু নিত্য দু-বেলা আস্‌চেন। ওঁদের একান্ত সাধ, আমার 'প্রাণ-চক্রর' দ্বিতীয় সংস্করণ বার করেন—তার উপর বলচেন, সেকেণ্ড উপন্যাস যা লিখবো, তাও...

শ্রীপদ ফোঁশ করিয়া উঠিল, কহিল,—অমন কাজও করবেন না। এখন থেকে কেন বাঁধা-ধরার মধ্যে যাবেন! মোদ্দা 'প্রাণ-চক্র'র দ্বিতীর সংস্করণ ওদের দেবার আগে আমার সঙ্গে একবার পরামর্শ করলে পারতেন। বইখানার খ্যাতিপ্রচারে আমার কিছু হাত ছিল।

তপস্বিনী কহিল,—সে ঋণ শোধ হবার নয়!...

শ্রীপদ একটা নিশ্বাস ফেলিল, অজ্ঞাতে প্রাণের কোণে বুঝি কি বেদনা মাথা তুলিল। শ্রীপদ কহিল,—কত বড় ওস্তাদ! একে তো মেয়েদের লেখা বই ছাপানো ভারী নিরাপদ; যেহেতু তার কঠিন তীব্র সমালোচনা হবে না। সে বইয়ের কোনো গুণ না থাকলেও মুখ ফুটে তা বলা চলে না, বাধে। তার উপর আপনার 'প্রাণ-চক্র'র একটা খ্যাতি বেরিয়েচে···কাজেই আপনাকে পাশ-বদ্ধ করতে উদ্যত!... চট্ ক'রে ওদের কথায় ভোলা আপনার উচিত হয় নি। তপস্বিনী সে-কথার কোনো জবাব দিল না।

শ্রীপদ কহিল,—আপনার লেখা মোদ্দা 'উজ্জ্বলায়' অনেক দিন পাই নি।

তপস্বিনী কহিল,—তার মানে, কবিতা লিখবো না, ভেবেচি।

শ্রীপদ কহিল—বেশ, গল্প দিন্, উপন্যাস দিন্।

তপস্বিনী কহিল,—দেখি...লেখা হোক্।

তার পর চা আসিল, রুটী ও টোষ্ট সেই সঙ্গে...একালে আতিথ্যের যা প্রধান উপকরণ।

শ্রীপদ ফিরিল,—মনে তীব্র দাহ লইয়া। তার আড়ালে এমন করিয়া প্রকাশকের সঙ্গে এতখানি বন্দোবস্ত! অথচ বইয়ের এ-নাম, এ শুধু তারি জন্য। নিজে সে সমালোচনা লিখিয়াছে—এবং সাপ্তাহিক দল তারি উদ্দীপনামন্ত্রে...

হিংসা জাগিল ঐ সাধুখাঁ-কোম্পানির উপর! মনে হইল, তপস্বিনীকে সতর্ক করা উচিত ছিল—উহাদের সঙ্গে এ অন্তরঙ্গতা ঠিক নয়!

পরদিন অফিসে শ্রীপদ কাজ করিতেছে, বেচারাম আসিয়া হাজির; ডাকিল—শ্রীপদ বাবু···

শ্রীপদর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। শ্রীপদ কহিল,—কেন?

বেচারাম কহিল,—আপনাদের 'উজ্জ্বলার' পুরোনো ফাইলটা আমি একবার দেখতে চাই। কতকগুলো কবিতা টুকে নেবো।

কবিতা টুকিবে! শ্রীপদ বেচারামের পানে চাহিল।

বেচারাম কহিল,—তপস্বিনী দেবীর কবিতা কতকগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। উনি বললেন,—এখানকার ফাইল ঘেঁটে টুকে নিতে... চিঠিও দিয়েচেন...

বেচারাম চিঠি দিল।

শ্রীপদ পড়িয়া দেখে, তপস্বিনী লিখিয়াছে ..

একখানা কবিতার বই ছাপ্‌চি। নাম দিয়েচি, হৃদয়-শিখা। বেচারাম বাবুরা ছাপ্‌বেন। কতকগুলো কবিতা হারিয়েচে—ফাইল থেকে সেগুলো এঁদের কাপি ক'রে নিতে দেবেন। ধন্যবাদ!

শ্রীতপস্বিনী দেবী।

হুঁ! আবার কবিতার বই! বেচারাম খুব চাল চালিয়াছে!

নিশ্চয় কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে! চোখে অগ্নি-দৃষ্টি ভরিয়া শ্রীপদ বেচারামের পানে চাহিল। পৌরাণিক তেজ এ যুগে লোপ পাইয়াছে। থাকিলে সে দৃষ্টি-স্পর্শে বেচারাম নিশ্চয় ভস্মসাৎ হইয়া যাইত!

৫

শ্রীপদ ভাবিয়া সারা হইয়া গেল, তপস্বিনীকে ইহাদের হাত হইতে রক্ষা করে কি উপায়ে? তরুণ দলে শ্রীপদরাই প্রগতির অগ্রদূত। বেচারাম কোম্পানি বয়সে আরো তরুণ, এবং প্রগতির দৌড়ে নিজেদের অগ্রতর ভাবে! অতএব...কিন্তু কি করা যায়? তপস্বিনী

তার কেহ নয়…কি বলিয়াই বা সতর্ক করিবে ? তপস্বিনী যদি বলিয়া বসে যে, বাঃ, আপনাদের সঙ্গে মিশিব, আর ইহাদের আমোল দিব না,—তার কারণ ?…

এক অতি সহজ উপায় মাথায় উদয় হইল। তখনি সে বালিগঞ্জে ছুটিল।

তপস্বিনী কহিল,—আসুন। কি খপর, বলুন।

আসার উদ্দেশ্য ? একটা উত্তর সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল ; কহিল,—আপনার উপন্যাসের প্রুফগুলো আমার কাছে পাঠাবার কথা ব'লে দেবেন। তাই বলতেই আসা।

তপস্বিনী কহিল,—মিছে আর আপনাকে কেন কষ্ট দি। বেচারাম বাবুই দেখে দেবেন, বলেচেন।

এত দূর। শ্রীপুদ কহিল,—ওরা কায়দা-কানুন ঠিক জানে না। প্রুফ দেখা তো শুধু আকার কেটে ইকার, আর ক কেটে খ করা নয়। ওর মধ্যে একটা আর্ট আছে রীতিমত !…

তপস্বিনী কহিল,—তিনি আগ্রহ করেচেন, তাতে আপত্তি তোলা ভদ্রতা হবে কি ?

এদিকেও যে রীতিমত দরদ! এ মমতা! শ্রীপদ কহিল,—তবু…মানে. আপনার বই বলেই বলচি। ওদের ব'লে দেবেন, অন্ততঃ অর্ডার-প্রুফটা যেন আমায় দেয়। সাজানো ব্যাপারটা লেটেষ্ট আমেরিকান ষ্টাইলে করতে চাই।

—বলবো।…

তার পরই তপস্বিনী কহিল.—আপনি বসুন. আমি আসচি।

শ্রীপদ কহিল.—এম্পায়ারে যাবেন ? নতুন টকি এসেচে… splendid…দুখানা টিকিট পেয়েচি…

তপস্বিনী কহিল,—আজ?

—হ্যাঁ। শ্রীপদর কণ্ঠস্বরে কি আগ্রহ!

তপস্বিনী কহিল,—আজ আর হয় না।

শ্রীপদর হাসিভরা মুখ নিমিষে মলিন হইল।

তপস্বিনী কহিল,—আজ জনার্দ্দন বাবুরা নিমন্ত্রণ করেচেন, ব্যাকাশ্ থিয়াটারে "খোরাশান্" নাটক দেখতে যাবার জন্য।

হায় ভাগ্য!...

শ্রীপদ কহিল,—হুঁ...সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস।

তপস্বিনী কহিল,—বসুন, আমি এখনি আস্চি...

শ্রীপদ কহিল,—না, বস্তে পারবো না আমার কাজ আছে...উঠি।

তপস্বিনী কহিল,—কাজ থাকে তো বস্তে বলি কি ক'রে?

শ্রীপদ উঠিয়া দাঁড়াইল...ফটক অবধি চলিয়া গেল, তার পর ফিরিল, ভাবিল, স্পষ্ট বলিয়া যাই, ও-দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় যদি একটা কুৎসা ওঠে তো সে বিচিত্র হইবে না...

কিন্তু সাম্নেই দেখে, তপস্বিনী, চোখো-চোখি হইল।

তপস্বিনী কহিল,—ফিরলেন যে?

শ্রীপদ কহিল,—ছাতাটা?...না, কৈ দেখচি না তো. তা হলে ট্রেনেই ফেলে এসেচি. বোধ হয়। হারালো...

শ্রীপদ একদণ্ড দাঁড়াইল না...দ্রুত পায়ে 'তপোবন' ত্যাগ করিল।

তার ইচ্ছা হইল, বেচারাম-জনার্দ্দন কোম্পানিকে এই মুহূর্ত্তে...

ঐ বেচারামের কবিতার সে কত খ্যাতি গাহিয়াছে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথকেও টিট্‌কারী করিতে ছাড়ে নাই। ছাপার অক্ষরে বলিয়াছে, প্রাণের তাজা ভাব বেচারামের কবিতায় এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এ তাজা প্রাণ পাওয়া যায় না!

যাকে সে বড় করিয়াছে দশের সাম্‌নে—সে-ই আজ গোপনে রন্ধ্র রচিয়া শ্রীপদকে পাড়িতে চায়। বেইমান! অকৃতজ্ঞ!

শ্রীপদ ভাবিল, আচ্ছা এবার শিক্ষা পাইলাম, আসিয়ো আমার কাছে আবার কাজ বাগাইতে!

তপস্বিনীর উপর অভিমান হইল!...শ্রীপদকে তুমি চিনিলে না, নারী!...

চার দিন পরের কথা। জাইগাণ্টিক থিয়েটারে বসিয়া শ্রীপদ পৌরাণিক অপেরা 'ভানুমতীর খেল' দেখিতেছিল...একেবারে সাম্‌নের কুশন্ শীট। প্রেক্ষাগৃহের আলো নিবানো...হঠাৎ সাম্‌নে দিয়া একটা ভিড় চলিয়া গেল...পাঁচ ছ'জন। তারা গিয়া পাশের খালি কুশন অধিকার করিল।...

আলো জ্বলিলে শ্রীপদ দেখে, ঐ জনার্দ্দন সাধুখাঁ কোম্পানি। আর সে কোম্পানির সঙ্গে তপস্বিনীও আসিয়াছে! রাগে তার সারা অঙ্গ জ্বলিল। সে মুখ ফিরাইল। বেচারাম আসিয়া কহিল,—তপস্বিনী দেবী আপনাকে ডাকচেন, শ্রীপদ বাবু...

তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শ্রীপদ বেচারামের পানে চাহিল। মনে হইল, বলে—যাবো না। আমি কি ওঁর গোলাম? কিন্তু সে-কথা বলা গেল না; মুখে বাহির হইল,—বটে! কোথায়? চলো।

পাশের কুশন। তপস্বিনী কহিল,—একটা জরুরি কথা ছিল।

—কি কথা?

তপস্বিনী কহিল,—বেচারাম বাবুর বাহাদুরি আছে, এ থিয়েটারের প্রোপ্রাইটরের সঙ্গে কথা পাকা কয়েচেন। এঁরা আমার 'প্রাণ-চক্র'

নাট্যাকারে রূপান্তরিত করিয়ে প্লে করবেন। রিহার্শাল এই সোমবার থেকে সুরু হবে। আগাম টাকাও কিছু দেছেন...

শ্রীপদ কহিল,—কে ড্রামাটাইজ করলে?

তপস্বিনী কহিল,—এঁদের কে লোক আছে,—ঐ যে "পাঁচফোড়ন" সাপ্তাহিকের সম্পাদক...যিনি ঐ 'গজ-কচ্ছপ' পৌরাণিক নাটক লিখেচেন, দিব্যদাস বাবু।

শ্রীপদ কহিল.—আমায় একবার দেখালেন না?

তপস্বিনী কহিল,—আমি পড়েচি। হয়েচে ভালো। আর দিব্যদাস বাবুর খুব সুখ্যাতি, তাঁর নাট্য-রসজ্ঞতার প্রচুর স্তুতি আপনার 'উজ্জ্বলা' কাগজে আপনিই তো ছাপিয়েচেন।

শ্রীপদ কহিল,—যতই স্তুতি করি, ওদের এখনো শিখ্‌তে ঢের বাকী। ঐ 'গজকচ্ছপের' ক'টা দৃশ্য তো আমিই লিখে দিছি। বিদ্যে তো জানি সবার।

—বটে! তা বেশ, আমি ব'লে দেবো, আপনাকে দেখাবে'খন। ...কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। কাগজে এখন থেকেই 'বুম্' করা চাই...যাতে আগে থেকেই হৈ-চৈ পড়ে যায়! বুঝলেন...!

স্বার্থ! শুধু স্বার্থ! হায় রে! তবু শ্রীপদর অভিমান জল হইয়া গেল। আশা আবার কোন্ মেঘের পর্দ্দা সরাইয়া হাসে! বুঝি আবার চান্স্ আসিল! বাঃ!

শ্রীপদ কহিল,—বেশ।...

পর্দ্দা তুলিয়া 'ভানুমতীর' তৃতীয় অঙ্ক সুরু হইল। শ্রীপদ বিদায় লইয়া একেবারে প্রোপ্রাইটর বংশধর বাবুর ঘরে আসিয়া ঢুকিল। "প্রাণ-চক্র'র কথা পাড়িল। বংশধর কহিল—ভারী d...l বাজার। ঐ জনার্দ্দন সাধুর্খাঁ বইখানার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপ্‌চে। আমায় শ'পাঁচেক

টাকা দিয়েচে ও বইটা নাট্যাকারে করার দরুণ। অবশ্য, দিব্য-দাসকে কিছু দিতে হয় নি। তা ছাড়া তপস্বিনী দেবীকেও আমার হাত দিয়ে আড়াইশো আগাম দেওয়া হয়েচে...বাকী একটা বেনিফিট্ দেবো। আমার কি? দু'পয়সা নগদ হাতে পেলুম। দেখা যাক্, 'প্রাণ-চক্র'র নাম আছে তো...ওদেরও স্বার্থ আছে—'বুম' করবে। বেচারাম বলে—এ হলো আমেরিকান ষ্টাইল পাব্লিশিটির। নভেলটা এতে হুড়-হুড় ক'রে বিক্রী হবে।..তাই অন্য বিজ্ঞাপন না দিয়ে ষ্টেজে এই নাট্যরূপে publicity...বিজ্ঞাপনেও তো খরচ হয়।...ওদের আইডিয়া আছে হে...

শ্রীপদ শুধু গম্ভীরভাবে কহিল,—হুঁ!

এমন চাল চালিয়াছে! বই লইয়া যা খুশী করুক—কিন্তু এ চালে তপস্বিনী দেবীর চিত্তখানি যদি অধিকার করিয়া বসে? সে সুযোগ না দেওয়া হইবে না, এ মিল ভাঙ্গা চাই। তার কত বড় আশা... অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

এবার রীতিমত যুদ্ধ চাই! এ দলের টাকা আছে। টাকার বল মস্ত বল। কিন্তু তার হাতে কলম—'কুটুস-কামড়ে'র কলম! সে-কলমের শক্তি তুচ্ছ করিবার নয়। কত মহারথীকে কাবু করিয়াছে এই কলম। আজ সে কলমের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—'প্রাণ-চক্র।'

চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে!...সুযোগই!...

এ সুযোগে শ্রীপদর ঘন ঘন ডাক পড়িতে লাগিল, বালিগঞ্জের তপোবনে!...সেখানে শ্রীপদ যায়। বেচারাম-কোম্পানিও হাজির দেয় নিত্য। তা ছাড়া বেচারামদের দলে ভিড়িয়া 'রূপ-তরাসী', 'রূপ-পিয়াসী', 'রূপ-দখলি' প্রভৃতি রঙ্গ-জগতের আরো উদীয়মান অজাতশ্মশ্রু নবীন সমালোচক!

ষ্টেজে 'প্রাণ-চক্র'র রিহার্শাল চলিয়াছে পূরা দমে। সাপ্তাহিক কাগজগুলায় বিশ্বের খবর বিলুপ্ত। পাঠক-পাঠিকা কাগজ খুলিয়া দেখে এত-বড় দুনিয়ার কোথাও আর কোনো খবর নাই—শুধু জাইগাণ্টিকে 'প্রাণ-চক্র !' সারা দুনিয়া যেন হাঁ করিয়া আছে ঐ জাইগাণ্টিক থিয়েটারের যবনিকার পানে, 'প্রাণ-চক্র', 'প্রাণ-চক্র'! কবে ঐ 'প্রাণ-চক্র' যবনিকা ছিঁড়িয়া ঘর্ঘর-রবে ঘূর্ণন-লীলা সুরু করে। তপস্বিনীর উত্তেজনার অন্ত নাই. শ্রীপদর তেমনি পরিশ্রম। আর জনার্দ্দন-বেচারাম কোম্পানি। তারা রুখিয়া পথে চলে...পরিচিত কাহাকেও দেখিলে পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দেয়, ব্যাগ টানিয়া বাহির করিয়া বলে—দাও টাকা.--জাইগাণ্টিকে শীট রিজার্ভ ক'রে রাখবো. 'প্রাণ-চক্র'র প্রথমাভিনয় রজনীর মহা-উৎসবে।..

'প্রাণ-চক্র' অবশেষে এক সন্ধ্যায় ষ্টেজের পর্দ্দা ফাঁশাইয়া দর্শক-সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিল।...

শ্রীপদর কলম চলিল...পৃথিবীর মত বিরাম-হীন গতিতে!

সপ্তাহান্তে প্রায় পচিশখানা সাপ্তাহিক সংগ্রহ করিয়া শ্রীপদ তপোবনে আসিয়া উদয় হইল। তপস্বিনী ঘরের মধ্যে বসিয়া। ঘরে আলো নাই। তপস্বিনীর সে উৎসাহ যেন নিবিয়া গিয়াছে!

শ্রীপদ কহিল,—ব্যাপার কি?

তপস্বিনী দেবী কহিল,—মহা-বিপদে পড়েচি.

—কি বিপদ?

তপস্বিনী কহিল,—আটজন পাব্লিশার এসে আগাম টাকা দিয়ে গেছে। আর বারখানি নূতন মাসিক-পত্র চেক্‌ পাঠিয়েচে। সকলেই লেখা চায়—নিত্য তাগিদ। সকলকে বলেছিলুম, 'প্রাণ-চক্র' খোলা হয়ে গেলেই লেখা দেবো...

শ্রীপদ কহিল,—দিন্ লেখা...

তপস্বিনী কহিল,—কোথা থেকে লেখা দেবো ? কি লিখ্বো ? মাথায় কিছু আস্চে না। তা ছাড়া এতগুলো লেখা···আটখানা উপন্যাস, আর বারোটা গল্প !

শ্রীপদ কহিল,—তবে কি টাকা ফিরিয়ে দেবেন ?

—তা ছাড়া উপায় দেখ্চি না।

শ্রীপদ কহিল,—হুঁ !···

তপস্বিনী কহিল,—কিন্তু আমার এই খ্যাতি···এর লোভ প্রচণ্ড। অথচ লেখার কিছু পাচ্ছি না। একটা ইজ্জৎ...কোনো উপায় বলতে পারেন ?

শ্রীপদ কহিল,—পারি

ব্যগ্র কণ্ঠে তপস্বিনী কহিল,—কি উপায় ?

শ্রীপদ কহিল,—একটি মাত্র...যদি অভয় দেন তো বলি, ও: টাকাও ফেরত দিতে হবে না, অথচ ইজ্জৎ রক্ষা পাবে...সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখার উপর আপনার সাহিত্যিক খ্যাতি নির্ভর করচে। অবশ্য যদি বলেন, কি হবে এ খ্যাতিতে...

তপস্বিনী যেন অন্ধকারে বিদ্যুতের আলো দেখিল। কহিল,— কি উপায়, বলুন···এ খ্যাতি আমি রক্ষা করতে চাই, বাড়াতে চাই।

শ্রীপদ কহিল,—আমার ইতিহাস তবে বলি, শুনুন। এই 'কুটুস্-কামড়' লেখার আগে আমি দশখানি উপন্যাস লিখি, এবং প্রায় পচিশ-ত্রিশটে গল্প। কোন সম্পাদক তা ছাপেনি। ঢের খোসামোদ করেচি...তারা অটল চিত্তে আমার লেখা ফিরিয়ে দেছে। সেই দুঃখে আমি আজ ক্রিটিক। আমার সেই লেখাগুলি সব মজুত্ আছে···

আপনাকে দেবো। আপনার নাম রটে গেছে···তা ছাড়া মহিলা লেখিকা, ঐ লেখাই আপনার নামে তোফা চ'লে যাবে ..চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠ্‌বে।

তপস্বিনী কহিল,—কিন্তু আপনি...?

শ্রীপদ কহিল,—আপনার ঐ লেখার জয়ধ্বনি তোলায় আমি আপনার সহায় হবো!...এতে অবশ্য একটু স্বার্থ আমার আছে তপস্বিনী দেবী...আমি আপনাকে ভালোবাসি। ঐ লেখা আপনাকে দিচ্ছি, তার পর পাশে থাকবো বরাবর...সাম্‌নে মস্ত ভবিষ্যৎ...আপনি লিখবেন, আমি সে-লেখার সমালোচনা করবো...

তপস্বিনী কহিল,—লিখ্‌তে আমি পারবো ব'লে মনে হয় না। এতে বড় পরিশ্রম...আর এ খ্যাতিটুকুকে জাগিয়ে রাখ্‌তে হলে লেখাও চাই ..

শ্রীপদ কহিল,—ঠিক...always before the public gaze ...দেখুন, আমি···আমি আপনাকে যথার্থ ভালোবাসি। আমি গরীব হতে পারি...কিন্তু শক্তি আমার তুচ্ছ নয়! তবে অর্থ? আপনার যা আছে...আমায় আপনার একান্ত বিনীত স্বামী ব'লে জানবেন··· আপনার ব্যক্তিত্ব অক্ষুণ্ণ অটুট থাক্‌বে!...যেহেতু যুগ-মন্ত্রে আমি দীক্ষিত।

তপস্বিনী দেবী নিরুত্তর রহিল—কি ভাবিতেছিল। পরে কহিল, —কিন্তু অপরের লেখা নিজের ব'লে চালানো...

শ্রীপদ কহিল,—যে সম্পর্ক প্রস্তাব করেচি, তাতে তা বাধ্‌বে না। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখবেন, যে যশ, যে খ্যাতি আজ পেয়েচেন, তা রক্ষা করতে গেলে চুপ ক'রে থাকাও চলবে না। লেখার পর লেখা চালিয়ে যেতে হবে...

তপস্বিনী কহিল,—সেই লেখার শক্তি আর নেই। ঐ একখানি বইয়েই আমার পুঁজি নিঃশেষ হয়েচে!

শ্রীপদ কহিল,—এ দৃষ্টান্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যে আরো আছে। তা হলে...

তপস্বিনী কহিল,—কাল সকালে আমার চিঠি পাবেন.. একটু ভাব্‌তে দিন্‌ আমায়...

শ্রীপদ কহিল,—মোদ্দা, এক বিষয়ে সতর্ক করতে চাই আপনাকে। ঐ বেচারাম, কিম্বা জনর্দ্দন... they are fools. তাদের সঙ্গে...

তপস্বিনী কহিল,—ছি, ছি, তারা আমায় বড় বোনের মত দেখে।

পরের দিন

শ্রীপদ উজ্জ্বলা-আফিসে। বেয়ারা একখনা চিঠি আনিয়া দিল। চিঠি পড়িয়া শ্রীপদ তখনি ছুটিল এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসে ..এবং...

পরের দিন কাগজে-কাগজে ছোট একটু খবর ছাপিয়া বাহির হইল,...

'প্রাণ-চক্রে'র লেখিকা শ্রীমতী তপস্বিনীর বিবাহ। পাত্র আমাদের বন্ধু প্রসিদ্ধ ক্রিটিক্‌ শ্রীযুক্ত শ্রীপদ চক্রবর্ত্তী। আর্ট ও ক্রিটিকের শুভ-মিলনে বঙ্গ-সাহিত্য শ্রীসম্পন্ন হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মঞ্জুর

সে-রবিবারের বাঙ্‌লা দৈনিকগুলায় হঠাৎ এক মজার বিজ্ঞাপন বাহির হইল। দু-চারজন পাঠকের মারফৎ সে-বিজ্ঞাপনের কথা প্রচারিত হইবামাত্র বেলা আটটার মধ্যেই কলিকাতার পথে-ঘাটে বাঙ্‌লা দৈনিকগুলা এমন হু-হু বেগে বিক্রয় হইয়া গেল যে, ইউনিভার্সিটির "পরীক্ষার ফল" ছাপিয়াও বাঙ্‌লা দৈনিক কখনো তেমন বিক্রয়ের রেকর্ড তুলিতে পারে নাই।

বিজ্ঞাপনটুকু প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হইয়াছিল। হকারের মধ্যে যারা একটু সাহিত্য-রসিক, তারা এই বিজ্ঞাপনে বেশ একটু রসান্‌ দিয়া আসর জমাইয়াছিল; কাজেই, হুজুগ-প্রিয় বাঙালী...কিন্তু সে-কথা থাক্‌। বিজ্ঞাপনটুকু এই,—

পাত্র চাই

পাত্রী বিধবা, সুন্দরী, গৃহসুখ-পিয়াসিনী, বয়স সাতাশ বৎসর মাত্র। হাতে নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও তিন হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার; এবং মফঃস্বলে পৈতৃক জমি-জমা আছে। সাত বৎসর নিষ্ঠাভাবে বৈধব্য-ব্রত পালন; ও সেই সঙ্গে সাহিত্য সাধনা করিয়া আসিতেছেন; ছদ্মনামে বহু কবিতা লিখিয়া মাসিকে ছাপাইয়াছেন। সম্প্রতি নিঃসঙ্গ জীবন ভার বোধ হওয়ায় বিবাহে অনুরাগিণী হইয়াছেন। পাত্র চাই দরিদ্র বেকার; কিন্তু সুশ্রী, শান্ত, দরদী হইবেন। বয়স ৩০ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে। পাত্রের বিষয়-বুদ্ধি এবং

বৈষয়িক কার্য্যে পারদর্শিতা থাকা চাই। নামধাম ও পরিচয়-সমেত পত্র লিখিলে বিশেষ বিবরণ মিলিবে। যাঁহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইবে, তাঁহাদিগের সঙ্গে পত্রযোগে আলোচনান্তে পাত্র নির্ব্বাচন হইবে। আবেদনের সহিত চার পয়সার ডাক-টিকিট সংলগ্ন থাকা চাই। অন্যথায় আবেদন গ্রাহ্য হইবে না।

"একাকিনী"

কেয়ার-অফ্ সম্পাদক।

এইটুকু বিজ্ঞাপন। কিন্তু এই বিজ্ঞাপনটুকুই গৃহে গৃহে যে আন্দোলন তুলিল, তার ফলে বাঙালী আহার-নিদ্রা, পিকেটিং, রাউণ্ড টেবল্—সব ভুলিয়া গেল। প্রবীণের দল দুই চোখ কপালে তুলিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁদের চোখের সম্মুখে বাঙলার সমাজ বিপ্লবের অগ্নি-শিখায় দাউ-দাউ জলিতে লাগিল; যাঁদের মুখের কথা একেবারে লোপ পাইল না, তাঁরা চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—এ ঐ বিদেশী সাহিত্যের হাওয়া, আর তরুণ দলের আধুনিক সাহিত্য...এই দ্বিবিধ আঘাতে বাঙালীর সব গেল!

তরুণ দলে উৎসাহের সঞ্চার হইল। তারা দম্ভ-ভরে বলিতে লাগিল,—এত দিনে জাতির জীবনে প্রাণের স্পন্দন জাগিল! জয় গাও একাকিনী অপরিজ্ঞাতার! সনেট ও বিবিধ ছন্দ বহিয়া ভাবের বান ডাকিল। দৈনিক কাগজগুলার অফিসে তদ্বির-তদারকের অন্ত নাই। কিন্তু সম্পাদকের সঙ্গে 'একাকিনী'র কঠিন সর্ত্ত—তাঁর নাম-ঠিকানা কোনোমতে যেন প্রকাশ না হয়! এজন্য বিজ্ঞাপনের কায়েমি হারের উপর অনেক বেশী দক্ষিণা দৈনিকের মালিকের হাতে অর্পণ করা

হইয়াছে। লোকেরও কৌতূহলের সীমা নাই, কিন্তু সে কৌতূহল নিবৃত্ত হইবার নয়। তখন রাগিয়া কেহ বলিল,—জুচ্চুরি! ঐ বিজ্ঞাপন দিয়ে ডাক-টিকিট হাতিয়ে যা-কিছু রোজগার হয়!

কেহ বলিল,—ধেৎ! সে তো আরো পঞ্চাশ রকম বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে ডাক-টিকিট আদায় করতে পারতো! এ নারীর নারীত্ব... নারীর প্রাণ নিয়ে কথা!...

এই বিজ্ঞাপন লইয়া বাগবাজারের 'অগ্রদূত সভার' এক বিশেষ অধিবেশন অবধি হইয়া গেল। সভাপতি 'সবভাঙ্গো' সাপ্তাহিকের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিচক্ষণ বক্শী মহাশয় জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—চাঁদা দাও! এই মহীয়সী অগ্রগামিনী একাকিনী কামিনীর শুভোদ্বাহ-দিনে আমরা তাঁর প্রশস্তি লিখিয়া রৌপ্য-নির্ম্মিত চোঙে ভরিয়া তাঁকে অভিনন্দন দিব। তরুণ বাঙ্‌লা এই প্রাণের জাগরণে পুলকানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া ধন্য হোক্।

সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থলে সাত টাকা স-বারো আনা চাঁদা অবধি সংগ্রহ হইয়া গেল।

তারপর বাঙালী নর-নারী কৌতূহলে উদগ্র চিত্ত লইয়া বাঙ্‌লা দৈনিক কিনিয়া প্রত্যহ তার পৃষ্ঠায় চোখ বুলায়,—কোন্ পাত্র একাকিনীর বেদনা বহিবার জন্য নির্ব্বাচিত হইল, তারি সন্ধানে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিল, কিন্তু পাত্র-প্রসঙ্গে একটি ছত্রও কোনো কাগজে ছাপা হইল না!

কেহ ইহাতে ব্যথা পাইল, কেহ বিদ্রোহে ফুঁশিল। কেহ রাগিয়া বলিল,—ঐ কাগজগুলোর চক্রান্ত! ষড় ক'রে 'বোগাস্' বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে একটা 'নাম্বার' খুব বেচে নিলে!

তরুণ-দলের কবিতায় উৎসাহ-ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়া ক্রমে তাহাতে বেদনার সুর ফুটিতে লাগিল; এবং যশস্বী কবি শ্রীমক্ষিকালাল মৌলিক এক মাসিক-পত্রে কবিতা ছাপাইয়া দিলেন,—

একাকিনী সঙ্গীহারা সপ্তবিংশতিয়া,
জানি না তোমার ওই প্রীতি-কামী হিয়া—
সপ্ত বরষের দীর্ঘ বিরহ-বেদন
ঢালিতে পেলে কি পাত্র—রসিক, সুজন!
হায় নারী, বুঝি নাকো, এ কেমন সাধ,—
তিরিশের নীচে যুবা কেন দিলে বাদ?
সে কি বুঝিত না তব হৃদয়ের দাম?
নিঃসঙ্গ জীবন চাহে প্রেম অভিরাম,
কি সোহাগ, কি আদর, ললিত-বচন?
ব্রত যার প্রণয়ের নন্দন রচন!
প্রীতি, প্রেম, লভ্—সব তিরিশের নীচে!
প্রবীণে প্রণয় যাচা, সে আশা যে মিছে!
বলো সখি, ভুল সে যে, চাহিছ তরুণ,
তীব্র দাহে ভরা বুক। প্রবীণ, সরুন্।

শ্রীমক্ষিকালাল মৌলিক

বাহিরে এমন ঘনঘটা-সত্ত্বেও একাকিনীর চিত্ত-বার্ত্তা কিন্তু রহস্যান্তরালেই রহিয়া গেল।

২

বিলাস নিজের ঘরে বসিয়া চিঠি-পত্র ঘাঁটিতেছিল,—চিঠির পাহাড়! অনন্ত আসিয়া বলিল,—চিঠির তাড়া ফুরোয় না যে!

রহস্যটুকু এবার প্রকাশ করো। ভয় নেই হে, আমি গেজেটে ছাপ্‌বো না।

হাসিয়া বিলাস কহিল,—এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই...

অনন্ত কহিল,—সত্যই সঙ্গীহারা একাকিনী মহিলা কেউ আছেন ?—না,...

বিলাস কহিল,—নিশ্চয় আছেন। না হলে কাজটা ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্ভূত হবে যে!

অনন্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বিলাসের পানে চাহিল।

বিলাস কহিল,—কালের হাওয়া ফিরেচে! সাহিত্য আজ আমাদের মনে-প্রাণে যে সাড়া জাগিয়ে তুলেচে, তাতে মনের বৃত্তিকে আর ঐ সংস্কৃত শ্লোক কিম্বা ভুয়ো বার-ব্রতর পয়ারের নীচে দাবিয়ে রাখা যাবে না। তুমি একজন ঔপন্যাসিক তো। তোমাদের বাণীর সার্থকতা দেখে গৌরব বোধ করচো না ?

অনন্ত কহিল,—কিন্তু তোমার এই আকস্মিক মাথাব্যথা... নিজেও লেখক নও।

বিলাস কহিল,— জানোই তো .. পাটের কাজ করছিলুম। তা, সে বাজার একদম্ ঢিলে...অথচ, .. হঠাৎ মাথায় এই আইডিয়া...

অনন্ত কহিল,—Inspiration বলো...

বিলাস কহিল, তোমাদের হলে inspiration হতো। আমরা অ-সাহিত্যিক, আমাদের আইডিয়া।

অনন্ত কহিল—এ মহিলার পরিচয় আমার কাছেও গোপন রাখ্‌বে ?

বিলাস কহিল,—সিদ্ধিলাভের ব্যাপারে মন্ত্রগুপ্তি হলো প্রথম কথা। বন্ধু-প্রীতির উপরে ব্যবসা-প্রীতির ঠাঁই !

অনন্ত কহিল,—তা হলে তুমি চিঠির তাড়া নিয়েই থাকো, আমি বিদায় নি। কিন্তু আমারো যোগ ছিল এ ব্যাপারে—ঐ বিজ্ঞাপন লিখে দেওয়া...ভাষা আমার...

বিলাস কহিল,—তা মানি এবং আর একখানা বিজ্ঞাপন লিখে দিতে হবে। তোমার হলো লেখকের কলম—ষ্টাইল আছে। বিজ্ঞাপন খুলবে ভালো।

অনন্ত কহিল,—আমার লভ্যাংশ? বলিয়া সে হাসিল।

বিলাস কহিল,—মিল্‌বে। এবং এই টুকরো বিজ্ঞাপন লিখে যা পাবে, বোধ হয় উপন্যাসের কপি-রাইট বেচেও পাব্লিশারের কাছে তেমন পাওনি কখনো।

অনন্তর দুই চোখ আবার বিস্ফারিত হইল।

বিলাস কহিল,—এই ত্মাখো খাতা, সাতাশ হাজারের উপর আবেদন এসেচে। এই ত্মাখো, সাতাশ হাজার ন'শো পঞ্চান্ন। সবাই ডাক-টিকিট পাঠিয়েচে। তা হলে, ২৭৯৫৫ আনা, তার মানে, প্রায় আঠারোশ' টাকা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়—still they come—অতএব টাকা···আরো দেড় হাজার টাকা ধরতে পারি। সব-শুদ্ধ তা হলে তিন হাজারের উপর হচ্ছে। তুমি নিয়ো তিনশো টাকা। তার পর নন্দরাণী দেবীকেও কিছু দিতে হবে—

অনন্ত কহিল,—নন্দরাণী দেবী!

বিলাস কহিল,—হ্যাঁ। তবে খবর্দার, নাম যেন প্রকাশ না হয়।

অনন্ত কহিল,—ইনি মহিলা? না, ফিল্‌মে নাম্‌তে-নাম্‌তে হঠাৎ এই inspiration বা, idea, যা বলো···

বিলাস কহিল,—ফিল্‌ম্ নয়।...ইনি মিড-ওয়াইফ। বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের তিন বৎসর পরে বিধবা হন। তার পর এই

মিড-ওয়াইফের কাজ নিয়ে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কোনো কথা বল্‌তে পারবে না...

অনন্ত কহিল,—তিনি যে রাজী হলেন, তোমার সহায় হতে ?

বিলাস কহিল,—আমার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যালোচনা হয় খুব। তোমাদের কৃপায় আধুনিক সাহিত্যে আমার ব্যুৎপত্তি সামান্য নয়। তোমাদের রামতারক বাবুর উপন্যাস আমার সব পড়া। কেবলকান্তর ঐ কবিতাগুলো, বিশেষ, তার ঐ নতুন বই 'আল্‌তা গোলার' কবিতা ...আমার সব মুখস্থ। আমি এখন তাঁরি ভাড়াটে। তাঁর বাড়ীতে একতলায় একটা ঘর খালি পড়েছিল, ভাড়া নিয়ে সেখানে বাস করচি ...ভাড়া দি মাসে সাত টাকা ; আর খোরাকী-বাবদ দি মাসে আঠারো টাকা। আমায় তিনি ভারী স্নেহ করেন, সত্যি।

অনন্ত একটু বক্র হাসি হাসিয়া কহিল,—বুঝেচি...লভ্‌ !

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিলাস কহিল—দূর ! আমার চেয়ে বয়সে বড়, তা ছাড়া সামনের দাঁত উঁচু, রঙ ময়লা ..তবে প্রাণে দরদ আছে। প্রাণ তাঁর গল্প-কবিতায় দোলে। না, না, তুমি সে-সব কিছু ভেবো না। She is pure gold. দুশ্‌মণেও তাঁর দোষ দিতে পারবে না। ভদ্র ঘরের মেয়েদের অসুখ হলে তিনি এ্যাটেণ্ড করেন।

অনন্ত কহিল,—কিন্তু তিনি রাজী হলেন হঠাৎ ?

বিলাস কহিল—রাজী ! কৈ, তা মনে হয় না। তবে আমার ঐ আইডিয়া...সাহিত্যের রস তাঁর মাথায় দেওয়া গেছে...কাজেই, অর্থাৎ তাঁকে আমি বাঙ্‌লা বইগুলো পড়তে দিতুম—এখন নিজেই চেয়ে নিয়ে পড়েন। তোমাদের প্রলয় মহান্তির বই ওঁর খুব ভালো লাগে, বিশেষ করে তার ঐ ছোট গল্পের বইখানা—"বস্তীর পাঁক"। উনি বলেন, ভারী জোরালো লেখা। নৈতিক বলেরও পরিচয় পাই প্রত্যেক গল্পে !...

—বটে! বলিয়া অনন্ত একটা নিশ্বাস ফেলিল।

বিলাস কহিল,—Jealousy হচ্ছে? তার কারণ নেই। তোমার লেখাও উনি পড়েন হে...তোমার সে গল্পটা কি? সেই যে এক মজুরণী ইট বয়ে ভারায় উঠতো...আর পাশেই মেশের বাসায় থাকতো ভামিনীচরণ ..

অনন্ত কহিল,—ওঃ—সে গল্পের নাম তো "বাঁশের সুর"...

বিলাস কহিল,—ঠিক! ঠিক! আজকাল তোমাদের লেখায় কিসের সুর যে না চালাও! 'আগুনের সুর,' 'বিয়ের সুর',—বুঝতে পারি না। মোদ্দা বাঁশের সুর, ইটের সুর, কাঠের সুর—এ একেবারে সুরের টেক্কা!

অনন্ত কহিল,—ও গল্পটা তাঁর ভালো লেগেচে তা হলে! বেশ! তা, তোমার আবার কি বিজ্ঞাপন চাই?

বিলাস কহিল,—অর্থাৎ 'একাকিনী' বহু আবেদন পেয়েচেন কি না! কাজেই তিনি চান এখন, যারা যথার্থ বিবাহ করতে চায়, তারা যেন ফটো পাঠায় এবং ফটোর সঙ্গে চার আনার ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। ছবি দেখে তিনি মনোনীত পাত্রদের সঙ্গে দেখা করবেন। দেখা করার স্থান এবং সময় বিজ্ঞাপনে জানানো হবে। তার পর...

অনন্ত কহিল,—বুঝেচি। বেশ...লিখি।

অনন্ত বিজ্ঞাপনের মুশাবিদায় মগ্ন হইল, এবং বিলাস চিঠি-পত্র বাছিয়া খাতায় নাম-ঠিকানা টুকিতে লাগিল।

৩

এক সপ্তাহ পরে বাঙলা দৈনিক কাগজওয়ালারা পাঁচ হাজার বেশী কাগজ ছাপাইয়া বাহির করিল। এই সংখ্যায় সম্পাদকীয়

কলমের ঠিক নীচে 'একাকিনীর মর্ম্ম-কথা' বলিয়া খুব বড় অক্ষরে আবার নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন ছাপা হইল।

একাকিনীর মর্ম্মকথা

একাকিনী বহু আবেদন পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। বাঙ্‌লা দেশে প্রবীণের প্রাণে দরদ যে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান, এই আবেদনের সংখ্যা হইতে তার প্রমাণ পাইয়া তিনি কৃতার্থ। কে বলে, বাঙালী মরণোন্মুখ জাতি!

যাঁহারা যথার্থ একাকিনীর দুঃখ-বিমোচন করিতে চান, তাঁহাদের আন্তরিকতার পরিচয় পাইব আর একটি কাজে। যথা,—তাঁরা যেন ফটো পাঠান। ফটোর সঙ্গে চার আনার ডাক-টিকিট পাঠানো চাই। অমনোনীত পাত্রদের ফটো ফেরত দেওয়া হইবে। মনোনীতদের দরদ পরখের জন্য একদিন স্থান-কাল নির্দ্দেশ করা হইবে; তখন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্ধারিত সময়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক সাক্ষাৎ করিলে বিবাহ-অনুষ্ঠান-সম্পাদনের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইবে। আজ হইতে দুই সপ্তাহ-কাল-মধ্যে ফটো পাওয়া চাই। নহিলে একাকিনীর মানসিক নিঃসঙ্গতা যেমন বাড়িয়া বেদনাকর হইতেছে, বৈষয়িক অব্যবস্থাও সেই অনুপাতে বাড়িয়া তাঁহাকে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে। ইতি

দরদ-কামিনী কৃতার্থিনী একাকিনী।

ইহার ঠিক নীচে বড় অক্ষরে পুনশ্চের জের,—

পুনশ্চ। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় বহু তরুণ একাকিনীর দুঃখে বিগলিত হইয়া দরদ জানাইয়াছেন, এবং তাঁর পাণিও প্রার্থনা করিয়াছেন। মানসিক নিঃসঙ্গতা ঘুচাইবার যোগ্যতা প্রবীণ দলের চেয়ে তাঁহাদের বেশী লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিতে বিচক্ষণতা কেমন, তাহা বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের আবেদন সাদরে বিবেচিত হইবে। অতএব, তাঁহারাও যেন ফটো পাঠাইতে কার্পণ্য না করেন— একাকিনীর ইহাই বিনীত নিবেদন।

এ বিজ্ঞাপন ছাপা হইলে একখানি স্বরাজী বাঙ্‌লা সাপ্তাহিকে খুব কড়া মন্তব্য বাহির হইল। সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্পাদক লিখিলেন,—

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে মানিলাম, চাল-ডাল, তরী-তরকারী, ঘী-তেলের দাম শস্তা হইয়াছে। বস্তা-বস্তা কিনিয়া আরামে ভোজন করিয়া শরীরে-মনে বল লাভ করিয়া বাঙালী কোথায় দ্বিগুণ বলে মাতৃ-মন্ত্র উচ্চারণ করিবে, কারাগারকে জীবনের লক্ষ্য করিবে, তা নয়, কোন্ একাকিনীর ব্যক্তিগত দুঃখে গলিয়া তরুণ-প্রবীণ উভয় দলই এ কি অমানুষের পরিচয় দিতে উদ্যত! একাকিনী তো একজন— কিন্তু তাঁহার পাণি-লাভের জন্য ত্রিংশ সহস্র বাঙালী উন্মত্তের ন্যায় সাধন-রত! মনের বনে এ কি ফুল ফুটাইবার সময়? কণ্টকে মন ছাইয়া ফ্যালো, কুসুম-শয্যায় বিলাস-স্বপ্নে

রাত্রি কাটাইলে চলিবে না—রাত্রে এখন খপরের কাগজের টাইপ সাজানো চাই; চাঁদার কাজে হিম্‌শিম্ হওয়া চাই। শুধু চাঁদা, চাঁদা—চাঁদার সাধন-সমরে বিউগ্‌ল্ বাজাইয়া চলিতে হইবে। রুদ্র পীড়নের দ্বন্দ্ব-মাতনে মাতোয়ারা হও,—নহিলে স্বরাজ ছু'শো বছর পিছাইয়া যাইবে!

কিন্তু এ মন্তব্যে কেহ বিচলিত হইল না। মানব-চিত্তে সাহিত্যের প্রভাব কি অমোঘ, সে-সম্বন্ধে বহু চিন্তাশীল মনীষী বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন; সে-সব বাজে কথার জাল-বুনানি নয়। কাজেই, দুই সপ্তাহ পরে অনন্ত ও বিলাস আবার যখন বিলাসের গৃহে মিলিত হইল, তখন বিলাসের চিত্ত-সাগরে আনন্দের বান ডাকিয়াছে!...

অনন্ত কহিল,—কত ফটো এলো?

বিলাস কহিল,—প্রায় বত্রিশ হাজার!...

অনন্ত কহিল,—তার মানে, বত্রিশ হাজার ইন্‌টু চার আনা, ইকোয়াল্‌-টু একলক্ষ আটাশ হাজার আনা, অর্থাৎ...

বিলাস কহিল,—আট হাজার টাকা...

অনন্ত কহিল,—তা হলে...

বিলাস কহিল,—নন্দরাণী দেবীর luck...

অনন্ত কহিল,—হুঁ! তার মুখ গম্ভীর।

বিলাস কহিল,—কিন্তু তিনি এক ফ্যাসাদ বাধিয়েচেন...

অনন্ত কহিল,—ফ্যাসাদ!...

বিলাস কহিল,—হ্যাঁ, তিনি জানিয়েচেন, এত ফটো ঘাঁটার প্রয়োজন নেই।

অনন্ত কহিল,—কেন?

বিলাস কহিল,—তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন, রবিবাবু কি গানই লিখেচেন—

রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয়-মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি !

অনন্ত কুতূহলী দৃষ্টিতে বিলাসের পানে চাহিল।

বিলাস কহিল,—একজন তরুণের আবেদন তাঁর মর্ম্ম স্পর্শ করেচে !

অনন্তর দৃষ্টি পলকহীন ! বিলাস কহিল,—নন্দরাণী বললেন, হৃদয়ের যে একটা আবেগ আছে, তা তিনি জানতেন না, মানতেন না ; এবং শুধু উপন্যাসে-গল্পেই ও-জিনিষের যা অস্তিত্ব, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস ! কিন্তু আবেদন পড়তে পড়তে একজনের করুণ নিশ্বাস তাঁর মনে ঝড় তুলেচে !

অনন্ত কহিল,—তার পর ?

বিলাস কহিল,—তার সঙ্গে নন্দরাণীর দেখাও হয়েচে...নন্দরাণী তার চিত্ত-দ্বারে অতিথি। কিন্তু...

—কিন্তু ? অনন্তর স্বর গাঢ়।

বিলাস কহিল,—লোকটা দরদী হলে কি হবে ! সে বলেচে, নগদ আড়াই হাজার টাকা পেলে সে তার চিত্তদ্বার মুক্ত করে নন্দরাণী দেবীকে সে চিত্ত-কক্ষে বসবাসের জন্য গ্রহণ করতে পারে !...বাজারে নাকি তার আড়াই হাজার টাকা দেনা !

অনন্ত মৌন নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল।

বিলাস কহিল,—আড়াই হাজার টাকা তাঁকে দিতেই হবে। ভেবেছিলুম, পাঁচশো টাকায় তাঁকে খুশী করবো। তা, আড়াই হাজার চাইলেন ! সেই হতভাগা পাত্র...একে কি দরদ বলে ? তোমায়

তিনশো, আর ওঁকে পাঁচশো দিয়ে বাকী টাকা নিয়ে আমি সরবো, ভেবেছিলুম...

—সরবে কেন ?

—সরবো না ? বল কি ! এই বত্রিশ হাজার নিরাশ পাণিপ্রার্থী কি ছেড়ে কথা কইবে ? যদি কেশ্ করে দেয় ? তা না করলেও ধরে যদি প্রহার...

অনন্ত কহিল,—তোমার ঠিকানা কি করে পাবে ?

বিলাস কহিল,—বলে, সাধনায় ধ্রুব-প্রহ্লাদ ভগবানকে পেয়েছিল, আর এই বত্রিশ হাজারের সাধনায় আমার নাম-ঠিকানা অজ্ঞাত অবলুপ্ত থাক্‌বে !

– তা বটে !

সে দিন ঐ পর্য্যন্ত।

বারো দিন পরে সন্ধ্যায় আবার সাক্ষাৎ।

বিলাস বাক্স গুছাইতেছিল, দ্বারে ট্যাক্সি ; আর একখানা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে নামিয়া অনন্ত ঘরে ঢুকিল, কহিল,—কোথায় যাচ্ছ হে ?

বিলাস কহিল,—নেপালে।

—নেপাল !

—হ্যাঁ। সেখানে কাঠের কারবার করবো।...কাল ছু'জন এসে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়ে গেছে, এ জায়গা মোটে নিরাপদ নয়।

অনন্ত বিলাসের পানে চাহিল।

বিলাস কহিল,– এখনো...দেখচো না, এই কপাল ফুলে আছে ! কাজেই অপেক্ষা করা চলে না। না হলে নন্দরাণী বলেছিলেন, তাঁর বিবাহ সুসম্পন্ন হওয়া অবধি যেন থাকি ! কিন্তু উপায় নেই, বন্ধু।

অনন্ত কহিল,—তাই তো! আমিও যে তোমায় নিমন্ত্রণ করতে এসেছিলুম...

—কিসের নিমন্ত্রণ?

—বিবাহের।

—কার বিবাহ?

—আমার।

বিলাস অবাক! অনন্ত? নানা তত্ত্বের কথা পাড়িয়া বিবাহ অসঙ্গত প্রমাণ করিতে যে পঞ্চমুখ হইত, সাহিত্য-সেবার দোহাই তুলিয়া যে সকলকে বুঝাইত, ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বদ্ধ থাকিলে কল্পনার গতি-পথ রুদ্ধ হইবে, সংসারের সংঘর্ষে কাব্য-বধূ প্রাণে বাঁচিবে না, সেই অনন্ত ..?

অনন্ত কহিল,—অবাক্ হয়ো না। মফঃস্বলে বধূর বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে, তাঁর নিজের উপার্জ্জনও আছে ব্যবসার ক্ষেত্রে···তা ছাড়া নগদ আড়াই হাজার যৌতুক যখন হাতে পাওয়া গেছে···

বিলাসের বিস্ময় সীমা ছাপাইয়া উঠিল। বিলাস কহিল,- এ কি বলচো···

হাসিয়া অনন্ত কহিল—আমিই নন্দরাণীকে বিবাহ করচি।

—তুমি..!

অনন্ত কহিল—হ্যাঁ। গোপনে আমি আবেদন পাঠিয়েছিলুম। তার পর তোমার খাতা থেকে তাঁর ঠিকানা নিয়ে দেখা করেচি তাঁর সঙ্গে—নিত্য দেখা হয়েচে। কথা কয়েচি বিস্তর—সাহিত্য এবং হৃদয়-তত্ত্ব নিয়ে বহু কথা। তাঁকে বুঝিয়েচি, আমি তাঁর ভক্ত! একান্ত অনুরাগী ভক্ত! তিনি নিজের জীবনের নিঃসঙ্গতা অনুভব করে যেমন কাতর, আমিও তেমনি···

বিলাস কহিল,—ও আড়াই হাজার টাকা চেয়েছিলে তুমিই !

—হ্যাঁ, এবং তা পেয়েচি।

বিলাস কহিল,—কিন্তু চেহারা⋯ তোমাদের গল্প-উপন্যাসের নায়িকারা যে সব রূপসী ! এলো খোঁপা, তা ছাড়া শাড়ী পরেন নানা কায়দায় কন্‌টিনেন্টাল সাহিত্যের বুক্‌নি ছাড়া তাঁরা কথা কন্ না ! আর শ্রীমতী নন্দরাণী দেবী...

অনন্ত হাসিল. হাসিয়া কহিল,—রবিবাবু একটা ভারী খাঁটি কথা লিখেচেন—'কাব্য দেখে যেমন ভাবো, কবি তেমন নয় গো !' কাব্যের নায়িকা কাব্যেই খাপ্ খায় ! স্ত্রী ? বহু দুর্ভাবনা, দারিদ্র্যের বহু অভাব যে-স্ত্রীর কল্যাণে ঘুচবে. রূপশ্রী তাঁর যেমনই হোক্, গৃহ-কল্যাণীরূপে চিরদিন তিনি শিরোধার্য্য। তা হলে সাহিত্য-সেবা নিরুপদ্রব হয় অন্ততঃ !

—হুঁ ! বলিয়া বিলাস বাক্সটা লইয়া ট্যাক্সিতে চাপাইল এবং ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিয়া অনন্তর পানে চাহিয়া কহিল,—তোমাদের সাহিত্য পড়িয়ে নন্দরাণীর মনকে ভাগ্যে উর্ব্বর করে রেখেছিলুম⋯ তাই ! দাঁড়াতে পারচি না, ভাই। বেলা তিনটে বেজেচে... স'তিনটেয় তোমাদের কবি মৃণালভূষণ আসবেন, শাসিয়ে গেছেন ; এবং তিনি মৃণালভূষা ছেড়ে বংশভূষায় ভূষিত হয়েই আস্‌বেন। তাঁর সে ললিত স্বর ছেড়ে তিনি যে রুদ্রভৈরব ছন্দের কশরৎ দেখিয়ে গেছেন, তাতে আর তিলার্দ্ধকাল অপেক্ষা করতে ভরসা হয় না। তুমি সাবধান, তিনিও নন্দরাণীর হৃদয়-প্রার্থী ছিলেন⋯তোমার পথ শুভ হোক, বন্ধু, ঐ মফঃস্বলের বিষয়-সম্পত্তি প্রভৃতি এবং আড়াই হাজার টাকা সম্বল করে নন্দরাণীর সঙ্গে জীবন-পথে তুমি পাড়ি দাও...নেপালের পথই আমার কাম্য !

বিধবা-বিবাহ

১

সে-দিন সকালে খবরের কাগজে ছোট্ট একটু খবর ছাপিয়া বাহির হইল,—

চল্লিশ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত ভূপতি চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক বিধবার পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন। বিধবার বয়স, শুনিতেছি, ৪৫ বৎসর উত্তীর্ণ-প্রায় এবং তিনি চার-পাঁচটি সন্তানের জননী! পাত্রীটি বারো বৎসর বৈধব্য-যাতনা ভোগ করিতেছিলেন! সবুজ সাহিত্যের জয়-জয়কার বলিব? না, পঞ্চশরের শরের লীলা?

সম্পাদকের টিপ্পনী যেমনই হোক, এবং পাঠক-পাঠিকার দল এ-খবর পড়িয়া হাসিয়া খুন্ হোন বা রাগে জ্বলিয়া উঠুন, আমি জানি, এ বিবাহের অন্তরালে বেচারী পঞ্চশর বা সবুজ সাহিত্যের কোনো ইঙ্গিত নাই! একটা দারুণ উদ্বেগ বা আতঙ্কের মধ্য দিয়াই এ বিবাহ…

ভূমিকা রাখিয়া আসল কথা খুলিয়া বলি।

বহু-বাজারের এক গলির মধ্যে ছোট্ট দোতলা বাড়ী। বাড়ীর মালিক নিমাই ভটচাজ বারো বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া অনেককে বাচাইয়াছে। তার বিধবা পত্নী ছেলে-মেয়ে লইয়া এই বাড়ীর এক তলায় বাস করেন, দোতলার তিনটা ঘর ভাড়া দিয়া অর্থ-সমস্যা ঘুচান। এমনি ধারা

ঘটিয়া আসিতেছে দীর্ঘকাল ধরিয়া। নিমাই বাঁচিয়া থাকিতে ঘরের ভাড়া সে আদায় করিত; তার মৃত্যুর পর বিধবা পত্নী সে ভাড়া আদায় করিবে, ইহাতে নূতনত্ব নাই!

চার বৎসর পূর্ব্বে ভূপতি চক্রবর্ত্তী আসিয়া এ-বাড়ীর দোতলা অধিকার করে! একা মানুষ—ঘরের ভাড়া ও খাই-খরচার টাকা নিমাইয়ের বিধবা স্ত্রী বিমলা দেবীকে ফেলিয়া দেয়; বিমলার তাহাতে লাভ ছাড়া লোকসান নাই।

কিন্তু এই ভূপতি পাড়ায় আসিয়া পাড়ার লোকের বিস্ময় জাগাইয়া তুলিল অনেকখানি। বেশে-ভূষায় সৌখীন, মাঝে মাঝে গান-বাজনার আসর বসায়. যাচিয়া পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ করে, গাঁটের পয়সা ব্যয় করিয়া লোক-জনকে খাওয়ায়, থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখায়. এবং রেশে গিয়া বাজী খেলিতে তৎপর; অথচ চাকরি-বাকরি নাই! তার কি জমিদারী আছে? না···?

আমার সঙ্গে সহসা তার আলাপ জমিল। কথায় কথায় সংসারের অভাব-অভিযোগের আলোচনা উঠিতে ভূপতি বলিল,—তার এক খুড়া থাকেন রাওলপিণ্ডিতে; খুড়ার অনেক পয়সা; স্ত্রী নাই, ছেলে-মেয়ে নাই। তিনি ভূপতির জন্য মোটা মাসহারার ব্যবস্থা করিয়াছেন···

আমি কহিলাম,—খুড়ো তো অনেকেরই আছে, কিন্তু এমন দেখিনি!

ভূপতি কহিল,—শুধু একটু কৌশল চাই, ভাই।

আমি কহিলাম,—কৌশল?

ভূপতি কহিল,—তাই। এই সংসার আর তার দায়িত্ব—এ দুটি বস্তু আমার খুড়োর বুকে এমন অব্যর্থ appeal তুললো সে এক কাহিনী

ভূপতি সে-কাহিনী বলিল, প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে সে একবার রাওলপিণ্ডিতে গিয়া উদয় হয়, খুড়ার কাছে সাহায্য-প্রার্থনায়। খুড়া একটি পয়সা দেন নাই। বলেন, একা মানুষ, সংসার-ধর্ম্ম নাই, পয়সায় তার কি প্রয়োজন? এই ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া একবৎসর পরে ভূপতি খুড়াকে চিঠি লিখিয়া জানায়, আপিসে সে চাকরি করিতেছে এবং বিবাহ আসন্ন; কিন্তু অন্ততঃ হাজার-খানেক টাকা না হইলে স্ত্রীকে গহনাই বা কি দেয়, এবং দায়িত্বই বা বহন করে কি সাহসে?—মাহিনা সামান্য। খুড়া ফেরত-ডাকে দেড় হাজার টাকা পাঠাইয়া দেন। তার পর হইতে স্ত্রীর অসুখ, ছেলে-মেয়ের জন্ম, অন্নপ্রাশন, অসুখ-বিসুখ—এমনি নানা দায় জানাইয়া মোটা টাকা আদায় করিতেছে। বৃহৎ সংসার, অভাব আরো বৃহৎ, এমনি কথা জানাইতে মাসহারার ব্যবস্থা পাকা হইয়া গিয়াছে। তার ফলে চাকরি-বাকরির প্রয়োজন ঘটে নাই। গায়ে স্বাধীন হাওয়া লাগাইয়া এমন স্বচ্ছন্দ মনে দিন কাটাইয়া চলিয়াছে!

আমি কহিলাম,—কিন্তু এ তো ধাপ্পা! যদি কোনো দিন ধরা পড়ো?

ভূপতি কহিল,—ধরা পড়বো কেন?

আমি কহিলাম,—ধরো, তিনি যদি কখনো এখানে আসেন? বা স্ত্রী-পুত্র-সমেত তাঁর কাছে তোমায় যাবার জন্য লেখেন?

ভূপতি কহিল,—আমায় যেতে বললে জানাবো, আপিসে ছুটী মিল্‌চে না, না হলে সম্পূর্ণ বাসনা, সপরিবারে আপনার পায়ে গিয়ে পড়ি।

আমি কহিলাম,—এ-জুয়াচুরির আমি সমর্থন করি না, তা যাই বলো তুমি!

ভূপতি কহিল,—দোষ কি ? খুড়োর পয়সার অভাব নেই, সৎকার্য্যে ব্যয় হচ্ছে !

—তুমি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই ?

—আছে। তারা ঠিক appealটুকু দিতে জানে না। তাই চেয়ে টাকা পায় না ! তা ছাড়া, খুড়ো যদি উইল-টুইল করেন…

—তোমাকেই সব দিয়ে যাবেন, তার ঠিক কি ?

ভূপতি কহিল,—আমার স্ত্রীর চিঠিও দু'বার গেছে, আমার ভারী অসুখের সংবাদ জানিয়ে।

—স্ত্রীর চিঠি ?

—তাই।

—কি করে সে ব্যবস্থা হলো ?

ভূপতি কহিল,—একটি বন্ধুকে কুড়ি টাকা ধার দিয়েছিলুম। সে টাকা তাকে শোধ দিতে হয় নি। টাকার বদলে দু'খানি চিঠি তার স্ত্রীকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলুম। আমার draft দেখে মহিলাটি লিখে দিয়েছিলেন…

আমি কহিলাম,—তোমার স্থান জেলে হওয়া উচিত ছিল !

ভূপতি কহিল,—খুড়োর দয়া না জাগলে হয়তো সেইখানেই যেতে হতো।…যেহেতু, পরিশ্রম করে অর্থ-উপার্জ্জনের কোনো হদিশ আমার জানা নেই। তার উপর ভবঘুরে মানুষ—হেফাজতী আমার মনে দস্তুরমত বেঁধে !

সবিস্ময়ে ভূপতির পানে চাহিয়া রহিলাম, মুখে কোনো কথা ফুটিল না।

ভূপতি কহিল,—কি ভাবচো ?

আমি কহিলাম,—খাশা আছো !

২

তিন-চার মাস পরের কথা। বেলা প্রায় ন'টা বাজে। বাহিরের ঘরে আইনের কেতাব খুলিয়া বসিয়া আছি, একটা বড় মকর্দ্দমা হাতে, আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা খুঁজিতেছিলাম, সহসা ভূপতি আসিয়া ডাকিল—ওহে···

আমি কহিলাম,—ভূপতি! কি খপর?

ভূপতি কহিল,—বিপদ।

হাতে ছিল মোল্লার Contract Act; সেখানা টেবিলে রাখিয়া কহিলাম,—কি বিপদ?

ভূপতি কহিল,—যা বলেছিলে ··

—কি বলেছিলুম?

ভূপতি কহিল,—সেই যে! অর্থাৎ খুড়ো মশায় আসচেন। দেশের বাড়ীতেও যাবেন, শেষ বিদায় নিতে আসচেন।

—তা চিন্তা কিসের?

—চিন্তা হবে না?···তুমি তো আগাগোড়া সব জানো!···আজ এই মাত্র চিঠি পেলুম। এই সে চিঠি···খুড়ো মশায় রবিবার সকালে এসে পৌছুবেন,—পাঞ্জাব মেলে!···কি যে করি!···

আমি তার পানে চাহিয়া রহিলাম।

ভূপতি কহিল,—এত short notice-এ একটি স্ত্রী আর চারটি ছেলে-মেয়ে সংগ্রহ করি কি উপায়ে, বল তো? খুড়ো আমার বাসায় এসে উঠবেন। তিনি জানেন, এ বাসায় স্ত্রী-পুত্র-সমেত আমি পরমানন্দে বাস করচি!···ধাপ্পা ধরা পড়লে জন্মের মত যাবো!

ব্যাপার বুঝিলাম, কহিলাম,—হুঁ!

ভূপতি কহিল,—কোনো ফিল্ম্ কোম্পানি-টোম্পানির সঙ্গে তোমার আলাপ নেই? তারা তো টাকা দিয়ে আর্টিষ্ট সংগ্রহ করে নানা ধরণের···

হাসি পাইল; হাসিলাম না। কহিলাম,—তেমন কোনো কোম্পানির সঙ্গে আমার আলাপ নেই!

—উপায়? অথচ, এ গোপন কথা আর কাকেও বলতে পারিনে। মানুষের মন! হয়তো সে হিংসায় সব রহস্য প্রকাশ করে দেবে!···আমার সঠিক পরিচয় তুমিই শুধু জানো!···এ দায়ে তুমি রক্ষা করো ভাই···বন্ধুভাবে না পারো, professionally...

আমি ভাবিতে লাগিলাম।...

কিন্তু এ যে অকূল পাথার! কে আসিয়া তার স্ত্রী সাজিয়া বসিবে? আর ছেলে-মেয়ে? থিয়েটারের অভিনয়েও, রীতিমত রিহার্শাল চালাইতে হয়, পাঁচ মাস, ছ'মাস ধরিয়া! এ থিয়েটার নয়, লেখা বুলি নাই, যে অবস্থা বুঝিয়া আওড়াইয়া যাইবে! এবং ষ্টেজে ক'ঘণ্টার পালা অভিনয় নয়; ঘরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা থাকিয়া অভিনয় করিতে হইবে!

সহসা একজনের কথা মনে জাগিল। কহিলাম,—আমাদের রাধানাথকে ধরলে কি হয়?

ভূপতি আমার পানে তাকাইয়া রহিল।

আমি কহিলাম,—সংসারের চাপে বেচারা হিম্‌সিম্ খাচ্ছে। তার স্ত্রীটিও শুনেচি লেখাপড়া জানে, বুদ্ধিমতী···রাধানাথের ছেলে-পিলে শুনেচি আট-দশটি, তার মধ্যে থেকে বাছাই করে···

দুই হাতে আমায় চাপিয়া ধরিয়া ভূপতি কহিল,—তোমায় উপায় করতেই হবে ভাই···

আমি কহিলাম,—কিন্তু সে তো এখানে থাকে না, সে থাকে রাণাঘাটে···

ভূপতি কহিল,—তোমায় আমি নিয়ে যাবো সেখানে, ওঠো···

আমি কহিলাম,—আমার কোর্ট রয়েচে...

—কত টাকা রোজগার করবে ? আমি পুষিয়ে দেবো...

—না, না। তা ছাড়া এত অধীর হচ্ছো কেন ? আজ বুধবার, বেশ,—কোর্টের ফেরত যাবো। শনিবারের মধ্যে এদিককার গোছ-গাছ সারা হলেই তো হলো !

—ঠিক না হওয়া ইস্তক আমি যে নিশ্চিন্ত হতে পারচি না ! একবার ভেবেছিলুম, ঐ যে আজ-কাল ষ্টেজে impressionist এ্যাক্‌ট্রেশের উদয় হয়েচে...তাদেরই কাউকে...কিন্তু সে ভারী vulgar হবে। হাজার হোক...

আমি কহিলাম,—আরে ছি ! এ হলো জীবন নিয়ে কথা ! উপন্যাসের পৃষ্ঠা নয় ! রীতিমত scandalous দাঁড়াবে যে !

কোর্টের পর রাণাঘাটে রওনা হইলাম। রাধানাথকে রাজী করাইতে বেগ পাইতে হইল না। তার পয়সার একান্ত অভাব। স্ত্রীটিও লক্ষ্মী ! সেকালের লক্ষহীরার গল্পের সেই লক্ষ্মী স্ত্রীর আদর্শে বুক ভরা ! দারিদ্র্যের এমন চাপ ..একালের সাহিত্যের হাওয়াও গায়ে লাগে নাই ! তা ছাড়া রাধানাথ নিজে পাশাপাশি থাকিবে ! ভূপতি লোকটা খেয়ালী হইলেও তার চরিত্র সম্বন্ধে কেহ কোনো অপবাদ দিতে পারে নাই—quite harmless !

তা ছাড়া সত্য কথা বলিব, ওকালতিই করিতেছি, কোনো দিন উপন্যাস লিখি নাই এ ব্যাপারের বৈচিত্র্য আমায় কেমন অভিভূত

করিয়া ফেলিয়াছিল! যদি দায় কাটে, জীবনের একটা পৃষ্ঠা অন্ততঃ স্মরণীয় করিয়া তুলিতে পারিব! কেমন নেশা লাগিল...

স্থির হইল, রাধানাথ নগদ একশো টাকা লইবে। তার ছোট চারটি ছেলে-মেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আসিবে। স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল, কিন্তু সর্ত্ত থাকিবে, ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া ঘাড় নাড়িয়া অভিনয়ের পালা যতটুকু সারা যায়। তা ছাড়া রাধানাথকে সে কয়দিন এই গৃহে থাকিতে হইবে! স্বামী কাছে থাকিলে সুন্দরবনের জঙ্গলও নারীর কাছে গৃহ-সংসারের তুল্য নিরাপদ! কাজেই...

৩

শনিবার ভূপতি একখানা বড় খাট কিনিয়া আনিল, বিছানা এবং কিছু বাসন-পত্রও সেই সঙ্গে। খুড়াকে বুঝাইবে, বড় ঘরে ছেলে-মেয়েদের লইয়া স্ত্রী শয়ন করে, সে শোয় পাশের ঘরে। ছেলে-মেয়েদের কলরবে ঘুমের ব্যাঘাত হয়, অফিসে সারাদিনের পরিশ্রম, অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে—তাই এ ব্যবস্থা!

রাত্রি নটা তিন মিনিটে (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) রাধানাথের সপরিবারে শেয়ালদা-ষ্টেশনে পৌছিবার কথা। আমায় লইয়া ভূপতি ষ্টেশনে চলিল।

সে ট্রেন যথাসময়ে আসিয়া পৌছিল। কিন্তু কোথায় রাধানাথ? কোথায় বা তার স্ত্রী মোক্ষদা দেবী?...

ভূপতি কহিল,—এলো না তো! পরের ট্রেণ..?

দেওয়ালে-আঁটা টাইম-সূচীর উপর ভূপতি গিয়া পাগলের মত পড়িল। পরের ট্রেণ?...এই যে রাত্রি ১১-৫৫ মিনিটে আসিবে।

ভূপতি কহিল,—তোমায় ছাড়বো না ভাই। চলো, খাইয়ে আনি।...ট্যাক্সিতে কতক্ষণই বা লাগবে! ইম্পীরিয়ালে...

নাছোড়বান্দা! ইম্পীরিয়ালে গেলাম, ট্যাক্সিতে চড়িয়া।

আহারাদি সারিয়া ষ্টেশনে ফিরিলাম রাত্রি সাড়ে দশটায়। তার পর প্রহর জাগা!...

১১-৫৫ মিনিটে ট্রেণ আসিল। বহু লোক নামিল, কিন্তু এ ট্রেণেও রাধানাথ বা মোক্ষদা দেবীর দেখা নাই!

ভূপতি কাঁদিয়া কহিল,—সর্ব্বনাশ হলো দেখচি। কাল ওদিকে পাঞ্জাব মেলে খুড়ো মশায়...

আমি কহিলাম,—রাণাঘাটের ট্রেণ আর নেই?

—জানি না! ভূপতি আবার ছুটিল সেই টাইম-সূচীর দিকে। বহুক্ষণ ধরিয়া তার উপর চোখ বুলাইয়া ফিরিল, কহিল,—অসম্ভব! Next train রাত চারটেয় আসবে। তাতে আসা সম্ভব নয়। তার চেয়ে...

আবার সেই টাইম-সূচীর উপর সে দৃষ্টি বুলাইতে প্রবৃত্ত হইল।

তার মুখ বিবর্ণ! আমার পানে ফিরিয়া কহিল,—Hopeless! একটা লোকাল ট্রেণ শেয়ালদা ছাড়বে রাত বারোটার পর...কিন্তু সেটা যায় কাঁচড়াপাড়া অবধি। কাঁচড়াপাড়া থেকে রাণাঘাট...ওঃ! (টাইম-সূচীতে দৃষ্টিপাত) ১৮ মাইল! রাত্রে লাইন ধরে কোথায় বা হাঁটবো!..

আমারও দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না, ব্যবস্থা করা গেল, অথচ...

আমি কহিলাম,—ট্যাক্সি করে রাণাঘাটে যাওয়া সম্ভব নয়। না হলে...

ভূপতি কহিল,—এক কাজ করবো? তার স্বর ক্রন্দন-জড়িত।

আমি কহিলাম - কি ?

ভূপতি কহিল,—কাঁচড়াপাড়ায় গিয়ে রাত্রে প্লাটফর্ম্মে পড়ে থাকি। তার পর সাড়ে ছ'টার ট্রেণে কাঁচড়াপাড়া ছেড়ে সাড়ে সাতটায় রাণাঘাটে পৌছুবো এবং পৌছেই এদের নিয়ে আস্‌বো।

ভূপতি টাইম-সূচীর পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—এই যে... সাড়ে সাতটায় রাণাঘাটে পৌছে ওদের নিয়ে আটটা দশের ট্রেণে চড়লে সাড়ে দশটায় এসে শেয়ালদায় পৌছুবো...

আমি কহিলাম,—তার পর খুড়ো মশায়...?

—হুঁ !

ভূপতি চিন্তা করিতে লাগিল : চিন্তা করিয়া কহিল,—খুড়োকে বল্‌বো,—হাঁ...ঠিক ! বল্‌বো, শ্বশুরবাড়ী রাণাঘাটে, শাশুড়ীর অসুখের জন্য স্ত্রী সেখানে গেছলেন। তাঁকে নিয়ে এলুম, আপনাকে না হলে দেখবে কে !..খুড়ো খুশী হবে !

ব্যাপারে নিজের যোগ না থাকিলে হয়তো কৌতুক অনুভব করিতাম! কিন্তু নিজের যোগ থাকায় তা পারিলাম না। শিহরিয়া কহিলাম,—তাই যাবে ?

ভূপতি কহিল,—যাবো। তোমাকেও ছাড়বো না।. কষ্ট হবে ? একদিন আমার জন্য কষ্ট করো। সে কষ্টের দাম আমি পুষিয়ে দেবো, ভাই। লক্ষ্মীটি, দয়া করো...ভাবো, মক্কেলের কাজে চলেছো...

নিস্তার পাইলাম না। ভূপতির সঙ্গে যাইতে হইল। সেই গভীর রাত্রে কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন...

৪

রাধানাথের আসা ঘটিল না। তার ছোট ছেলেটির প্রবল জ্বর ; বুকে সর্দ্দি বসিয়াছে। স্ত্রী মোক্ষদা কাঁদিয়া রাত্রি জাগিয়া দুই চক্ষু রক্তবর্ণ

করিয়াছে। রাধানাথ কপালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিল, সে রাজী ছিল ছেলের পরিচর্য্যা করিতে—এতগুলা টাকা! কিন্তু অবুঝ স্ত্রী সে কথা শুনিবে না! কাজেই...ভগবান্ বরাতে পয়সা দেন নাই, নহিলে এমন দুর্ঘটনা ঘটে!

শ্মশানে প্রিয়জনকে বিসর্জ্জন দিয়া ফিরিবার কালে মানুষের মুখের যে-ভাব হয়, ভূপতির মুখের ভাব ঠিক তেমনি!

শেয়ালদায় নামিয়া সে শুধু জানাইল, আমায় আর মিথ্যা কষ্ট দিবে না। তার অদৃষ্টে যা ঘটিবার, তা সে বুঝিয়াছে! গ্রহের ফের, নিশ্চয়! তার বিসর্জ্জনের বাজনা সে স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে!

তার পরে যা ঘটিল, ভূপতির মুখে শুনিয়াছি। অর্থাৎ শূন্য মনে ভূপতি যখন বাসায় ফিরিল, বেলা তখন এগারোটা। গৃহে ঢুকিতে নিমাইয়ের তেরো বছরের মেয়ে উমা কহিল,—দাদু এসেচেন।

ভূপতির বুক কাঁপিয়া উঠিল। কোনো মতে দম্ লইয়া সে গিয়া দোতলার ঘরে পৌছিল। ঘরের মধ্যে খাটের উপর খুড়া চক্রবর্ত্তী তখন তন্দ্রামগ্ন!

ভূপতি ভাবিল, তবু ভালো! খুড়া জাগিয়া নাই, একটু হাঁফ ছাড়িবার সময় মিলিবে!

মরিয়া হইয়া সে স্নানাদি সারিল, তার পর রান্না-ঘরের পাশে গিয়া ডাকিল—উমার মা...

রান্না-ঘর হইতে উমা কহিল,—কেন বাবু?

ভূপতিকে তারা মনিবের মত খাতির করে, বাবু বলিয়া ডাকে!

ভূপতি কহিল,—দুটো টাকা নাও। উনি আমার কাকা। ওঁর খাওয়া-দাওয়াটা...

উমার মা চাপা গলায় মেয়েকে কি বলিল ; মেয়ে উমা কহিল,—মা সে ব্যবস্থা করেচে। দাদু তোমায় খুঁজ্ছিলেন। দাদা বলেচে, কাল বেরিয়েচেন, এখনো ফেরেন নি। তার পর দাদু চান করে জলটল খেয়ে শুয়েচেন। বল্লেন, ট্রেণে ভালো ঘুম হয় নি।

নিমেষের জন্য একটা কথা ভূপতির মনে উদয় হইল। যদি ঐ বিমলা দেবীকে তার স্ত্রী বলিয়া...?

কথাটা পাড়িয়া দেখিবে? বিমলা দেবীর ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের সব ভার নিজের হাতে তুলিয়া লইবে!...কিন্তু কি করিয়া এ কথা পাড়া যায়?...

হিন্দু নারী, তায় বিধবা! স্বামীর স্মৃতি ধ্যান করিয়াই শেষ দিনটুকুর প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন...

তবু উপায় নাই!.. যেমন করিয়া হোক, কথাটা পাড়া দরকার। নহিলে এ-যাত্রা রক্ষা পাইবার কোনো আশা নাই!

কাশিয়া গলা সাফ করিয়া ভূপতি কহিল,—তোমার মা কোথায় উমা-রাণী?

উমা কহিল,—রান্নাঘরে। মা জিজ্ঞাসা করচে বাবু, দাদু নিরামিষ খান? না, মাছ খান?

—মাছ খান বৈ কি! মাছ খান, মাংস খান। পশ্চিমে থাকেন কি না! তা, তোমার মা'র সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা ছিল...

বলিতে বলিতে ভূপতি রান্নাঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মেয়ে উমার একখানা ডুরে শাড়ী পরিয়া বিমলা দেবী হেঁশেলে ঢুকিয়াছেন। নিত্য তাই করেন। সারাদিন মেয়েদের কাপড় পরিয়া কাজ-কর্ম্ম করেন, শুচি-রক্ষার উদ্দেশ্যে! পরে স্নান সারিয়া থান পরেন...

ওবেলাতেও তাই, শুইতে যাইবার সময় থান পরা হয়! এমনি করিয়া বসনের শুচিতা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

ভূপতিকে রান্নাঘরে দেখিয়া বিমলা দেবী এক কোণে সরিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভূপতি তাঁর সে কুণ্ঠা-জড়িত মূর্ত্তি দেখিয়া অপ্রতিভ হইল। এত কাল এ বাড়ীতে আছে, বিমলা দেবী কোনো দিনই তার সম্মুখে বাহির হন নাই! আর আজ...তাই তো, তাঁর সাম্‌নে এমন ইতর প্রস্তাব কি বলিয়া করে? সে ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল।

মা'র কাছে প্রেরণা পাইয়া উমা কহিল.—মাকে কি বলবে বলছিলে, বাবু?

ভূপতি কহিল,—হ্যাঁ...মানে, তোমরা ওঁকে নিজের দাদুর মতই মনে করো। উনি ছেলে-মেয়ে ভারী ভালোবাসেন।

উমা কহিল,—এক ঝুড়ি ডালিম, নাসপাতি, আপেল এনেচেন। দোতলার ঘরে সে-সব আছে। মা গুছিয়ে রেখেচে।

ভূপতি কহিল,—দোতলায় কেন উমা-রাণী? সেটা নিয়ে আসি—তোমরা খাও। তোমার দাদারা কোথায়?

উমা কহিল,—ও-পাড়ায় বারোয়ারি হচ্ছে, সেখানে গেছে।

ভূপতি কহিল,—তোমায় দাদু কি বললে?

উমা কহিল,—দাদু এলো; এসেই তোমার নাম করে বললে, এটা তার বাসা? আমি গিয়ে বললুম. হাঁ। তার পরই আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি মেয়ে? আমি বললুম, হাঁ। বললেন, সবার বড়? আমি বললুম, না, ছোট। বললেন, আর-গুলি ভাই? আমি বললুম, হাঁ। দাদা বেরুচ্ছিল; দাদা বললে, তুমি কাল থেকে বাড়ী নেই। বলে, দাদা চলে গেল। মা ঘোমটা দিয়ে এক কোণে

দাঁড়িয়েছিল, মাকে বললেন, একটু চা করে দিয়ো বৌমা।...মা চা তৈরী করে দিলে।...

দ্বিধাভরা কণ্ঠে ভূপতি কহিল,—শুধু এই কথা হলো ?

উমা কহিল,—হাঁ। আমি চা নিয়ে গেলুম—আমায় বললেন, তোমার নাম কি ? কি পড়ো ? স্কুলে পড়ো, না, বাড়ীতে পড়ো ? আমি তার জবাব দিলুম। উনি স্নান করে চা খেয়ে বললেন, একটু ঘুমোই···রাত্রে ট্রেণে ঘুম হয় নি।

ভূপতি নিশ্বাস ফেলিল, আরামের নিশ্বাস ! এ পর্য্যন্ত কিছু বেফাঁস হয় নাই ! খুব রক্ষা পাইয়া গিয়াছে !...কিন্তু এর পর...ঘুম ভাঙ্গিলে ? এই সব ছেলে-মেয়ে লইয়া নিজের বলিয়া চালানো...এঃ !.. অদৃষ্টে কি যে ঘটিবে ! তবু যতক্ষণ ধরা না পড়ে, কোনো মতে চালাইয়া যাওয়া...খুড়া এখন কদিন এখানে থাকিবেন, কে জানে !

ভূপতি নিঃশব্দে পাশের ঘরে গিয়া খাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া কড়িকাঠের পানে চাহিয়া রহিল...বুকের মধ্যে যা হইতেছিল, তা শুধু অন্তর্য্যামীই বুঝিতেছিলেন !

ওদিকে খুড়ার কণ্ঠস্বর শুনা গেল। খুড়া হাঁকিলেন,—ওগো উমা দিদি···

ভূপতি ছুটিল। খুড়া উঠিয়া বসিয়াছেন। ভূপতি প্রণাম করিল।

খুড়া কহিলেন,—কোথায় ছিলে ?

একটা ঢোক গিলিয়া ভূপতি কহিল,—ভারী বিপদ ঘটেছিল ! মানে, আমাদের আপিসের বড় বাবু আছেন এক জন...অর্থাৎ তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ গেল...সেই হালিসহরে। লোক-জন খাওয়ানোর গোল-মালে last ট্রেণটা miss হলো, ধরতে পারলুম না। প্লাটফর্ম্মে সারা

রাত মশার কামড়ে পড়েছিলুম, তার পর সকালের ট্রেণে ফিরচি...

খুড়া কহিলেন,—হুঁ। তা ভালো!...লৌকিকতা রক্ষা ভালো আজ-কাল এ-সব উঠেই যাচ্ছে! ভালো করেচো! বিশেষ, আপিসের বড় বাবু...যখন তার হাতেই ভবিষ্যৎ নির্ভর করচে!

ভূপতি মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিতেছিল, খুব রক্ষা করিয়াছ, ঠাকুর!

খুড়া কহিলেন,—একটা জিনিষ দেখে খুশী হলুম...

ভূপতি উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

খুড়া কহিলেন,—তোমার নবাবী চাল নেই! বামুন-চাকর রাখো নি, এ খুব ভালো। বৌমা রান্না-বান্না করচেন। মানে, রোজগার বুঝে ব্যবস্থা। ভেবেছিলুম, খুড়োর মাথায় আরামে কাঁঠাল ভাঙ্গচো বুঝি! তা এসে দেখি, না, আমার ভুল! বৌমাটিও একেলে হাওয়া পান নি...লজ্জা-সরম বেশ...ঘোমটা দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন! মুখখানি দেখা যায় না! আমি তাতে খুশী হয়েছি। না হলে যা গল্প শুনি, কলকাতার মেয়েরা নাকি একদম ধিঙ্গী হয়েছে, মাথায় ঘোমটা তো দেয়ই না, গুরুজনদের সাম্‌নে বুরুচ এঁটে আঁচল ঘুরিয়ে বেড়ায়, ফড়ফড়িয়ে কথা কয়...ছি।

ভূপতি ভরসা পাইল, কহিল,—না, সে সব চাল এঁর নেই। তবে লজ্জা খুব অতিরিক্ত! এর জন্য পাড়ার লোক কত কি বলে...

খুড়া কহিলেন,—বলুক! ও-সব সাহেবদের নকল। ওরা জ্বলে মলো মেয়েদের ধিঙ্গী বানিয়ে। মানেও না আর। স্বামী রোগে বিছানায় পডে রইলো, পরিবার চল্‌লো ক্লাবে গল্‌ফ্‌ খেলতে।

শুধু তাই ? হুঁঃ, রাওলপিণ্ডিতে সাহেব-মেমে ঘুঁষোঘুঁষি অবধিচললো সেদিন ! রাম বলো ! মেয়ে মেয়ে, পুরুষ পুরুষ ! ঘোমটাই যদি বিসর্জ্জন দিলে মেয়ে-মানুষ, তা হলে তার মেয়েমানুষত্ব রইলো কোথায় ? যাও না তা হলে রান্না ছেড়ে আপিসে, কাছারিতে !... লজ্জা-সরমই হলো মেয়েদের আসল ভূষণ !

ভূপতি দুর্গা-নাম জপ করিতেছিল, উমা আসিয়া বাঁচাইল, কহিল,—ভাত আনবো, দাদু ?

—আনো দিদি...

উমা চলিয়া গেল। খুড়া বলিলেন,—মেয়ে তো ডাগর হয়ে উঠলো...

চক্ষু মুদিয়া ভূপতি কোনো মতে কহিল,—তা হলো বৈ কি !

—কত বয়স হলো ?

—তেরো চলেছে...

—এইটিই ছোট ?

—হ্যাঁ।

খুড়া কি ভাবিলেন, তার পর কহিলেন,—তবে যে দু'বছর আগে কার অন্নপ্রাশন বলে চিঠি লিখেছিলে...

সর্ব্বনাশ ! ভূপতির চক্ষুস্থির ! তখনি সে ভাব সারিয়া বলিল— ওঃ ! হ্যাঁ ! বলেন কেন ? সেটা রইলো না ! হঠাৎ একদিন আপিস থেকে ফিরে দেখি, ডিপ্‌থিরিয়া। ডাক্তার আনতে তর সইলো না !... মারা গেল। ছ'মাস পেরোয় নি এখনো...

—হুঁ !...তা লেখোনি তো আমায় ?

—ভূপতি খুড়ার পানে চাহিল,—সন্ধানী দৃষ্টি ! সন্দেহ ? খুড়া সন্দেহ করিতেছে না কি ?...তাড়াতাড়ি সে বলিল,—কত দুঃখের

কথা বলবো ? এ বয়সে একটু শান্তিতে বাস করছেন, সংসারের জঞ্জাল সরিয়ে··· তাই লিখি নি।

—বটে !

উমা দু'খানি আসন পাতিয়া জলের গ্লাস রাখিল। বিমলা দ্বারপ্রান্তে থালা বহিয়া আনিলে সে থালা হাতে লইয়া উমা আসনের সাম্‌নে ধরিয়া দিল। খুড়া ভোজনে বসিলেন। উমা তদ্বির করিতে লাগিল।

খুড়া কহিলেন,—ছেলেরা গেল কোথায় ?

ভূপতি কহিল,—কোথায় বারোয়ারি হচ্ছে, গিয়ে জুটেছে।

খুড়া কহিলেন,—ভালো নয়। এত বেলা হলো ! শাসন দরকার।

ভূপতি কহিল,—তাই দেখচি।···

এইটুকু বলিয়া ভূপতি তাড়াতাড়ি উমার পানে চাহিয়া কহিল,—একটু নুণ আনো তো মা···

উমা নুণ আনিতে গেল। নুণের নামে টাল সাম্‌লাইয়া ভূপতি কহিল,—আপনার শরীর এখন কেমন ?

—ভালোই। তোমার খুড়ীমা যে রুটিন বেঁধে দিয়ে গেছেন, সেই রুটিন মেনে চলছি যে একটু এদিক্-ওদিক্ করি না, বুঝলে ! সুগৃহিণী ছিলেন,—কি ব্যবস্থাই ছিল তাঁর···

খুড়ার কণ্ঠস্বর গাঢ় আর্দ্র হইয়া উঠিল।

ভূপতি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—চোখে দেখা হলো না, এ দুঃখ জীবনে যাবে না !···

উমা নুণ লইয়া আসিল। ভূপতি কহিল,—তুমি যাও মা, স্নান করে নাও গে, ঢের বেলা হয়েচে।

উমা কহিল,—আমি চান করেচি।

ভূপতি কহিল,—তা হলে খাও গে..যাও...

উমা কহিল,—খাবো'খন।...তোমাদের হোক, দাদারা আসুক...

ভূপতি ভাবিল, আচ্ছা মেয়ে! বলিতেছি চলিয়া যাইতে, যা না...শেষে কি-কথায় কি-ফ্যাসাদ বাধিয়া যাইবে!...উমা নড়িল না।

ভূপতি কহিল,—আপনার ওখানে একটি পাত্র দেখুন না উমার জন্য...

খুড়া উমার পানে চাহিলেন, কহিলেন,—হুঁ।...কি বলো, দিদি? তবে ত্যাখো দিকিন্, আমায় পছন্দ হয়? বরটি ভালো···হাঃ হাঃ হাঃ ...না?

—য্যাঃ! বলিয়া উমা এক পাক ঘুরিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি কহিল,—এখানে বিয়ের পাত্র...যার নাম, নগদ পাঁচটি হাজার। কাজেই, ও-চিন্তা করি না!

খুড়া কহিলেন,—তা বললে তো চলবে না। মেয়ে ডাগর হলো, পাত্র ত্যাখো। পাঁচ-হাজারে জজের বাজারে সন্ধান না নিয়ে আপিসে চাকরি-বাকরি করে, এমন একটি ছেলে ত্যাখো...

ভূপতির বুকটা নাচিয়া উঠিয়াছিল, যদি এই উমার দৌলতে পাঁচ হাজার মিলিয়া যায়!

খুড়ার কথায় বুক আবার দমিয়া পড়িল। ভূপতি কহিল,—তাদের দরও তিন হাজারের কম নয়।

—বটে! আচ্ছা, ওখানে আমি একটি পাত্র দেখবো। শস্তায় হবে। থাকবে ভালো···খাশা জল-হাওয়া! শরীর যা জুৎসই হবে, ওঃ, কহতব্য নয়।

আহারাদি চুকিল। সঙ্গে সঙ্গে নীচে কলরব উঠিল, ছেলেরা ফিরিয়াছে—ঘনু, মনু, জনু। মা বকিতেছিলেন, ছেলেরাও চুপ করিয়া বকুনি সহিবার পাত্র নয়...কলরবও তাই প্রচণ্ড!

ভূপতি গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল, উচ্চকণ্ঠে কহিল,—ছি অন্যায় করে ওঁর সঙ্গে তর্ক করচো!...লজ্জা হচ্ছে না? যাও, সব স্নান করে খেয়ে দেয়ে নাও...

৫

বেলা চারিটায় এক-ঘুমের পর উঠিয়া খুড়া কহিলেন,—ছেলেরা গেল কোথায়?

ভূপতি তাদের পয়সা দিয়া বালী-ব্রিজ দেখিতে পাঠাইয়াছে—গৃহে থাকিলে...ডাগর ছেলে...সব ফাঁশ হইয়া মুস্কিল বাধা বিচিত্র নয়!

খুড়ার কথায় সে কহিল,—তাদের স্কুল থেকে আজ কি পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করেছে, এ-বেলায়···তাই গেছে।

—ও!···তা উমা? উমা দিদি?

ভূপতি কহিল,—দেখি···

বুক কাঁপিতেছিল। এ-ভাবে এক দিনও কাটে না! খুড়া এখন ক'দিন থাকিবে, কে জানে!

ভূপতি বাহিরে গেল। উমা কলতলায় বসিয়া বাসন মাজিতেছিল! বেচারী ভূপতির মায়া হইল। সে কহিল,—তোমার কষ্ট হচ্ছে, উমারাণী। তোমার মাকে বলো, যে ক'দিন আমার খুড়ো মশায় আছেন, একটা ঠিকা দাসী আনাতে। আমি তার মাহিনা দেবো।

উমা কহিল,—কি দরকার, বাবু? বড় স্নেহ-ভরা স্বর!

ভূপতি কহিল,—আজ না হয় করো, কিন্তু কাল থেকে তোমার বাসন মাজা বন্ধ! বুঝলে?

ভূপতি উপরে আসিল, খুড়াকে কহিল,—উমা ঘুমিয়ে পড়েচে...

—ছেলেমানুষ !...আমি ও-মেয়েটির ভার নেবো, ভূপতি! পাঠাবে আমার সঙ্গে ?

আবার প্রমাদ! ভূপতি কহিল,—ওর মা কি ছেড়ে থাকতে পারবে ? বিশেষ কোলেরটি সেদিন গেছে...

—হুঁ ! খুড়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

ভূপতির মনে স্বস্তি নাই ! কোনো মতে খুড়াকে এ বাসা হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইতে পারিলে সে বাঁচে !

সে কহিল,—বায়োস্কোপ দেখতে যাবেন ?

হাসিয়া খুড়া কহিলেন,—সেই নড়া ছবি? না বাপু, তোমার খুড়ীর সঙ্গে-সঙ্গে ও-সব আমোদ-আহ্লাদও বিসর্জ্জন দিছি !...আমি বাড়ীতেই থাকি—তোমার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে সময় কাটবে...তাতে ভালো থাকবো।...

ভূপতি কিন্তু হুঁশিয়ার রহিল; জনু মনু আসিবামাত্র তাদের হাতে টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল,—বায়োস্কোপ দেখে এসো। ভারী চমৎকার ছবি আছে।

তার পর রাত্রি হইবামাত্র খুড়াকে খাওয়াইয়া বিছানায় পাঠাইয়া সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।...

একটি উপায়...শুধু ঐ বিমলা দেবী !...কিন্তু এমন অভদ্র প্রস্তাব কি বলিয়া করে !...বিধবা...বয়স হইয়াছে...ডাগর ছেলে-মেয়ে... সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিলেও দয়া হইবে না? শুধু একটু পরিচয় দেওয়া,—ভূপতির সঙ্গে তাঁকে কথা কহিতেও হইবে না...যেমন ঘোমটা দিয়া আছেন, অমনি থাকিবেন...! নারী চিরদিন করুণাময়ী... এ করুণাটুকু না করিলে ভূপতিকে পথে দাঁড়াইতে হইবে, সে-কথা শুনিলে...

তবু বলা গেল না! বলা সম্ভব হইল না! রাত্রিটা দুঃস্বপ্নে আর অনিদ্রায় কাটিল।

পরের দিন সকালে চা...চায়ের পর ছেলেদের আটকাইয়া রাখা গেল না।

খুড়া তাদের বিদ্যার পরিচয় লইয়া অবাক্ হইলেন। ভূপতি কহিল,—কিছু হবে না, সেই কথাই ওদের গর্ভধারিণীর সঙ্গে কাল হচ্ছিল। একটি মাষ্টার ঠিক করেচি। দু'এক দিনের মধ্যেই...

খুড়া কহিলেন,—উচিত। এ্যাদ্দিন অবহেলা করা ঠিক হয় নি।

—হুঁ। তা, আচ্ছা, তা হলে জনু, মনু তোমরা যাও, পড়তে বসো গে, সকাল বেলায় গল্প-গুজব ঠিক নয়। যাও...

সহসা ভূপতি বাবুর এ মনোযোগিতায় জনু, মনু, ঘনু বিস্মিত হইল। কাল পয়সা দিয়া বালী ব্রিজে পাঠাইয়াছেন, তার উপর বায়োস্কোপ! হঠাৎ এমন...অর্থ নাই—কিন্তু কৃতজ্ঞতা আছে। তাই তারা বিনা-বাক্যে নীচে চলিয়া গেল।

খুড়া কহিলেন,—একবার বৌমাকে ডাকো তো...

ভূপতি শিহরিয়া ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর কহিল,—জানেন তো খুড়োমশায়, তাঁর লজ্জা কি রকম! তা নিয়ে আমার সঙ্গে সারা জীবন খিটিমিটি চলেছে! সে কি মানুষ···!

—আঃ! বারান্দায় দাঁড়াবেন। আমার একটু কথা আছে...

অগত্যা!...হতাশ-নয়নে ভূপতি আকাশের পানে চাহিল। এবং...

উমাকে ধরিয়া বিমলা দেবীকে আনানো হইল।

খুড়া ডাকিলেন,—মা...

মা ওদিকে জড়ো-সড়ো হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভূপতির সারা দেহ বায়ু-কম্পিত পল্লবের মত কাঁপিতে লাগিল।

খুড়া কহিলেন,—তোমার উমারাণীকে আমি নিয়ে যাবো, ভাবচি। ওর সব ভার আমার। পারবে মা ছেড়ে দিতে ?

কে উত্তর দিবে ? খুড়া ভূপতির পানে তাকাইলেন, কহিলেন,— বেশ, আমার সঙ্গে কথা না কন, তুমি যাও...ওঁর জবাবটুকু নিয়ে এসো...

ভূপতিকে উঠিতে হইল। সে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইতে বিমলা দেবী দু'পা হঠিয়া গেলেন।

ভূপতি তাঁকে বুঝাইল, খুড়া মশায় উমাকে লইয়া যাইতে চান... খুড়ার অনেক টাকা...উমার সব ভার···অর্থাৎ...

বিমলা দেবী লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

তাঁর বিস্ময় সীমাহীন ! সহসা এক অপরিচিত বিদেশী আসিয়া মেয়েকে লইয়া যাইতে চায়—কোনো সম্পর্ক নাই !...তিনি কি উত্তর দিবেন ? ব্যাপারটা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিলে হয়তো উত্তর মেলে—কিন্তু খুড়া সাম্‌নে বসিয়া...উগ্র রকমের ইচ্ছা থাকিলেও আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার ভূপতি তাঁকে কি করিয়াই বা বুঝায় ?...

খুড়া কহিলেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, থাক মা...দু'দিন আরো থাকি, আমায় চেনো আগে, তোমার মেয়ের সঙ্গেও পরিচয় হোক—তার পর জবাব দিয়ো···

সর্ব্বনাশ ! ভূপতি বুঝিল, খুড়া তাহা হইলে দু'চারি দিন আছেন !...

সংসারের নানা অভাব-অভিযোগের কথা তুলিয়া, খুড়াকে ভুলাইয়া রাখিতে বেলা ন'টা বাজিয়া গেল।

খুড়া কহিলেন,—আপিস আছে তো ?

ঠিক ! সেদিকে ভূপতির হুঁশ ছিল ছিল না। ভূপতি কহিল,—হ্যাঁ, তবে আমি সাড়ে দশটার পর বেরুই। এগারোটায় হাজরে।...

নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা গেল না। ভূপতি নীচে নামিয়া জন্থ মন্থ কোম্পানিকে তোয়াজ করিতে লাগিল, তাদের ভালো কথায় ভুলাইয়া স্নান করাইল, তার পর আহার। আহারান্তে তাদের স্কুলে পাঠাইয়া সে আবার দোতলায় উঠিল। খুড়া তখন খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

ভূপতি কহিল,—আজই একজন মাষ্টার আন্‌চি

খুড়া কহিলেন,—হাঁ।...

ভূপতি কহিল,—মাইনে চায় মাসে পনেরো টাকা—দিই কোত্থেকে!...অথচ এর জন্য আবার আপনাকে জ্বালাতন! আপনার আরো পাঁচটা ভাইপো-ভাইঝী আছে...

খুড়া কহিলেন,—এ হলো মস্ত কর্ত্তব্য! এর জন্য অন্য দিক্‌কার খরচ কমাতে হয় যদি, কমাবে...

ভূপতি কহিল,—কমাতেই হবে! নিশ্চয়!

দশটা বাজিয়াছে, অফিস যাইবার উদ্যোগ না করিলে নিস্তার নাই। ভূপতি স্নান করিতে গেল; স্নানের পর খুড়াকে কহিল,—আপনার আহারাদি...

খুড়া কহিলেন,—বেলা বারোটার আগে নয়। উমা-দিদি আছে, ভাবনা কি!

ভূপতি কহিল,—আমি দুটোর মধ্যেই ফিরবো...

—কেন ?

—মানে, আপনি একলাটি থাকবেন...

খুড়া প্রতিবাদ তুলিলেন,—না, না,—আপিসের কাজে অবহেলা নয়। আমি আছি, তাতে কি ? তুমি তো মাহিনা কম নেবে না, বাপু...

না, নিস্তার নাই ! খুড়া ভক্তিতে টলিবার পাত্র নন ! কিন্তু কতখানি আতঙ্ক বহিয়া যে তাকে বাড়ীর বাহিরে বিচরণ করিতে হইবে ! এ সময়টুকুর মধ্যে সব যদি ধরা পড়িয়া যায়...

ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া ভূপতি সজ্জিত বেশে গৃহ ত্যাগ করিল। গৃহ ত্যাগ করিয়া সে গেল কালীঘাটে। সেখানে দেবীর পায়ে পূজা দিয়া প্রাণের আবেদন জানাইল, যেন ধরা না পড়ে...এবং খুড়া যেন কালই বিদায় লন...

বেলা পাঁচটায় সে গৃহে ফিরিল। খুড়া বিছানায় শুইয়া আছেন, উমা তাঁর মাথার পাকা চুল তুলিতেছে।

খুড়া কহিলেন,—যাও দিদি, তোমার বাবু আপিস থেকে ফিরেচেন...

উমা উঠিয়া গেল।

ভূপতি মুখ-হাত ধুইয়া চোরের মত আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। খুড়ার মুখের পানে চাহিবার ভরসা নাই !

খুড়া উঠিয়া বসিলেন, ডাকিলেন,—ভূপতি ..

স্বর গম্ভীর। ভূপতির হাড়-পাঁজরাগুলা সে স্বরে ঝন্‌ঝনিয়া উঠিল।

খুড়া কহিলেন,—একটা জিনিষ আজ আবিষ্কার করলুম আমি... এবং আবিষ্কার করা অবধি আমার মনে শান্তি নেই।

যাঃ ! সব ফাঁশ হইয়া গিয়াছে ! সারা পৃথিবী পায়ের নীচে দুলিয়া উঠিল ! চোখের সাম্‌নে রাজ্যের কালো পতঙ্গ ধোঁয়ার মত ঘুরিতে লাগিল !

ভূপতির চেতনাও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত-প্রায় !

খুড়া কহিলেন,—তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনের মিল তেমন নেই...এ আমি বেশ বুঝেচি। কার দোষ, জানি না। তবে বৌমাকে অপরাধী করতে পারি না। তিনি স্ত্রীলোক, তাঁর মাথার উপর মস্ত ভার...! স্বামীর উচিত স্ত্রীকে আদর করা, মিষ্ট কথা বলা...মেয়েমানুষ অবুঝও হয়ে থাকে, মানি। তা বলে স্বামীও অবুঝ হবে, তার হেতু দেখি না !...কেমন, যা ধরেচি, ঠিক নয়?

এই কথা! ওঃ!...ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়ার কথা সর্ব্ববাদিসম্মত ! বুঝি, ভূপতিরও ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

খুড়া কহিলেন,—বলো আমায়...

ভূপতি কহিল,—তা দেখুন, মানে, আপনি...

ছু'চারিটা ঢোক গিলিয়া ভূপতি জানাইয়া দিল, বৃহৎ সংসার, অভাব-অভিযোগ প্রচুর, আয় সামান্য ; কাজেই, মনকে সব সময়ে বশে রাখা কঠিন হয়...

খুড়া কহিলেন,—হুঁ

ভূপতি সন্তর্পণে খুড়ার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। খুড়া কি ভাবিতেছিলেন। খুড়া বলিলেন,—মেয়েমানুষ বড় দুঃখী। তার মন সর্ব্বক্ষণ কাঙাল হয়ে আছে।...

খুড়া নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে কহিলেন,—তোমার খুড়ীমা বলতেন, নারীর মনের কোনো সন্ধানই তো রাখি নি···তাঁর প্রসাদেই একটু-আধটু যা বুঝেচি।···এই জন্যই কোনো সংসারী লোক দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছে শুনলে আমার মনে বেদনা লাগে এই ভেবে, পুরুষ তো ছট্‌ফট্ করে, ঘুরে বেড়ায়, রাগ করে. গর্জ্জন তোলে। দুঃখ-কষ্ট ভোলবার তার সহস্র উপায় আছে ! কিন্তু মেয়েরা ? সংসারের এই দুঃখ-কষ্টে তার নীরব যাতনা

খুড়া আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পর কহিলেন,—মেয়েরা কতখানি দুঃখ নীরবে সহ্য করে, তা ক'জন বোঝে! অথচ আমাদের দেশে আইনও মেয়েদের নিঃস্ব করে রেখেচে চিরদিন!... তা-ছাড়া কাল রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেছলো...বারোটা রাত...নতুন জায়গা...তাই। উঠে বারান্দায় পায়চারি করছিলুম। হঠাৎ দেখি, কলতলায় আলো, বৌমা বাসন মাজ্‌চেন! দেখে কষ্ট হলো। তুমি আরামে ঘুমোচ্ছ, তিনি কখন্ শোবেন, সেদিকে হুঁশও নেই!...তার উপর আজ সকালেও দেখলুম, আপিস যাবার সময় তুমি বেরিয়ে গেলে, বৌমার সঙ্গে দেখা করলে না...আপিস থেকে ফিরেও না—এ তো দস্তুরমতন অবহেলা! এ অবহেলায় মেয়েমানুষের প্রাণ বলো, মন বলো...সব ছেঁচে পিষে যায়!...

খুড়া থামিলেন, পরে কহিলেন,—আমাদের জীবনে এমনটি কখনো ঘটে নি। অবসর যা মিল্‌তো, তোমার খুড়ীমা আর আমি মিলে তার সদ্ব্যবহার করতুম। বেড়াতে যাওয়া, গল্প করা...একটি বাগানও নিজেদের হাতে তৈরী করেছিলুম, পাখী পুষেছিলুম, দু'জনে একসঙ্গে বসে তাদের খাওয়াতুম, অর্থাৎ আপিসের কাজ বাদে আর সমস্ত কাজ এক সঙ্গে না হলে করাই হতো না!...কত লোক বলতো, স্ত্রৈণ!...তাতে এসে যেতো না। আমরাই যাদের একমাত্র আশ্রয়, নির্ভর,—তাদের ছেঁটে স্বর্গও আমি কামনা করি নি কোনো দিন—করা গর্হিত!...

ভূপতি কিছু বলিল না; বলিবার কিছু ছিল না। স্ত্রী থাকিলে তার সঙ্গে কি ভাবে মিশিতে হয়, কিরূপ ব্যবহার উচিত, এ তার সম্পূর্ণ অবিদিত!.. তবু, অভিনয় যখন করিতে নামিয়াছে, তখন তার চতুর্দ্দিকে এতখানি খুঁত...এ যে ঠিক হইতেছে না, এটুকু সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল।

কিন্তু উপায় কি ? উপায় ?…

নাই। তাই দায়ে পড়িয়া জন্‌-কোম্পানিকে ক্রমাগত ঘুষ দিয়া মাঠে-বাটে ঘুরাইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। উমা ?…ভূপতি তাকে সাফ বলিয়া বসিল,—আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে…পুষ্যি মেয়ে কেমন ?

এ-কথার যাথার্থ্যও সে প্রমাণ করিয়া দিল, ভালো ছ'খানি শাড়ী এবং এক জোড়া কাণের দুল কিনিয়া দিয়া। মেয়েটি ভালো… বাপের আদর দূরের কথা, বাপ কি-বস্তু তা জানে না !

উমা হাসিয়া কহিল,—আচ্ছা !

ভূপতি কহিল,—ও-দাদুকে নিজের দাদু বলেই জেনো।

উমা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহাই হইবে…

আরো চার দিন এমনি আতঙ্কে-উদ্বেগে কাটিবার পর ভূপতির শনি ছাড়িল, অর্থাৎ খুড়া মহাশয় স্বগ্রাম-দর্শনে প্রস্থান করিলেন। ভূপতির খাতির-যত্নে ত্রুটি রহিল না। খুড়া বলিয়া গেলেন,—যাবার সময় তোমার বাসা হয়েই যাবো। উমা দিদি আমার ট্রেণের টিফিন তৈরি করে দেবে—কেমন ?…

খুড়া ফিরিলেন পাঁচ দিন পরে বৈকালে। সেই রাত্রেই রাওলপিণ্ডি প্রত্যাগমন ! খুড়া বলিলেন,—তোমার বাউণ্ডুলেগিরি নেই, এতে আমি খুশী হয়েচি। তবে বৌমার সঙ্গে প্রীতির অভাব কাঁটার মত বিঁধেচে—এর প্রতিকার চাই !…

খুড়া উইল করিবেন—স্থির করিয়াছেন ; খুলিয়া বলিলেন, তাঁর সম্পত্তি ভূপতির একার নামে না দিয়া বধূ-মাতা ও তাকে এক-যোগে তুল্য স্বত্বে দিয়া যাইবেন !…হিন্দু নারীর দুর্দ্দশা তাঁর মনকে চিরদিন

তারাদাসের বৈরাগ্য

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশে একরাশ নক্ষত্র। চারিদিক্ নিস্তব্ধ।

তারাদাসের চোখে ঘুম আর আসে না। বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিল; উঠিয়া জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। জানলার নীচে ছোট বাগান। বাগানে একরাশ হাস্নাহানা ফুটিয়াছে; তার গন্ধে বাতাসেরও নেশা লাগিয়াছে

বিছানার পানে তারাদাস তাকাইল; গৃহিণী শশীবালা নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অচেতন—পাশে ছেলে-মেয়েরাও গাঢ় ঘুমে মগ্ন।

একটু আগেকার কথা তারাদাসের মনে জাগিল। কি বিরোধ, কি কলরব জাগিয়াছিল! অথচ কি-বা কারণ? সন্ধ্যায় সে গিয়াছিল হরিশের বাড়ী অফিসের একটা জরুরি প্রয়োজনে। সেখানে পাঁচ জনের কথায় একটু তাস পাড়িয়া বসা। মানুষের অমন সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—ভারী তো কাজ,—একটু তাস খেলিয়া কৃতার্থ করা—তাদের দলে লোক ছিল কম,—একটি পয়সা ব্যয় করিতে হইবে না,—তাই। এবং ঐ খেলা সহসা খুব জমিয়া উঠার দরুণ তারাদাসের গৃহে ফিরিতে একটু দেরী হয়! তাও এমন দেরী নয়! রাত এগারোটা। শীত-কালের রাত্রি নয়—চৈত্র মাস—এগারোটা রাত্রিকে কি আর রাত্রি বলা চলে! ঐ তা বায়োস্কোপই ভাঙ্গে সাড়ে এগারোটায়!

এই তুচ্ছ ব্যাপার—তা লইয়া শশীবালার কি তিরস্কার...চাক[illegible]র-বাকরের সাম্‌নে! তারাদাস বাড়ীর কর্ত্তা—তার একটা [illegible] ইজ্জৎ তো আছে! শশীবালা তর্জ্জনের স্বরে বলিয়া ব[illegible]ল,—রাঁধিয়া খাওয়াইয়া কাজ চুকাইয়া একটু যে গড়াইয়া বিশ্রাম লইবে, তার উপায় নাই!

বাসুকির মত সংসারটাকে সর্ব্বদা মাথায় বহিয়া বেড়ানো—শরীরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। মানুষের কি আরাম নাই, বিশ্রাম নাই,—বাঁদী পাইয়াছ, বটে! এত রাত্রি অবধি আমোদ করিয়া বেড়াইবে, আর বাঙালীর ঘরের স্ত্রী বলিয়া তার বুঝি গতর নয়, পাথর!

এমনি দু'চারি কথায় সুরু হইয়া তর্ক গিয়া দাঁড়ায়, পুরুষ এবং নারীর সাম্যের ব্যাপারে! প্রথমটা তারাদাস প্রাণপণে যুক্তি পাড়িয়া বুঝাইতেছিল, কিন্তু পত্নীর প্রচণ্ড বচন-বন্যায় যুক্তির টিঁকিয়া থাকিবার শক্তি ছিল না; এবং রোষাগ্নি, অশ্রু-বর্ষণ প্রভৃতিতে পূরা এক ঘণ্টা ধরিয়া ছোট গৃহে রীতিমত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলিতে থাকে! সে যুদ্ধের ফলে তারাদাসের তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন এবং শশীবালার ভাত বাড়িয়া স্বামীর সাম্‌নে থালা ধরিয়া দিয়া শয্যা-গ্রহণ; জলস্পর্শ করিবে না পণ প্রভৃতি আনুনাসিক বিবিধ উপসর্গের অন্ত ছিল না!

তারাদাসের ধৈর্য্য আজ কিন্তু বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল। গৃহিণীর এমন মান-অভিমান নিত্য চলে; কাজেই, সে সেটাকে গায়ে মাখে নাই; নিঃশব্দে ভোজন শেষ করিয়া শশীকে মিনতি করিয়া বলিল,—যাও গো, খেয়ে নাও। আর মিছে রাত করো না...

গৃহিণী সঝঙ্কারে উত্তর দিল,—থাক, আর সোহাগে কাজ নেই। আমি বাঁদী, আমার জন্য ভেবে মাথা খারাপ করে লাভ? আমি তো বলেচি, দাঁতে ছোলা কাট্‌বো না, রাত্রে।

ঈষৎ কৌতুক-রস-অবতারণা-কল্পে তারাপদ বলিল,—ছোলা কাটবে না—বেশ, সে-কথা নয় রেখো—ছোলা কেটো না। কিন্তু ভাত মুখে দিতে ক্ষতি কি! তেমন প্রতিজ্ঞা তো করো নি!

গৃহিণী বলিল,—এখন আমার ব্যথা তোমার রঙ্‌তামাসার বস্তুই তো হবে। আর কি আমার সে বয়স আছে? না, আমার গালে

গোলাপ ফোটে ? চোখে বিদ্যুৎ চমকায় ? হাতে মৃণালের মালা গাঁথা হয়...? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনুনয়-বিনয় তারাদাসকে প্রচুর ব্যয় করিতে হইল, কিন্তু শশীর আজ সত্যই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা !...টলিবার নয়—গলিবার নয় !

বিরক্ত হইয়া তারাদাস পাশের ছোট খাটে শুইয়া পড়িল।...কিন্তু চোখে ঘুম আসে না ! বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ দশ বৎসরের রোমান্স-ভরা পাতাগুলা বুকের মধ্যে কে যেন উল্টাইয়া চলিল। প্রীতি-ভালোবাসার কি বিচিত্র উজ্জ্বল ছবি,—ব্যথা-বেদনায় মলিন কত স্মৃতি !...ঐ আকাশের পানে চাহিয়া, এই জানালায় দাঁড়াইয়া কত সে স্বপ্ন-রচনা, কত বিহ্বল-করা গানের সুরে মন ভাসানো..

ইহারি মধ্যে সব ফুরাইল ? জীবন একেবারে তিক্ত বিরস ! একটা ভালো কথা, দু'টা মিনতি, তার কি এমনি অভাব ঘটিয়াছে ? না, তাহাতে প্রাণের কোনো কোণে বাধা জাগে ?

দীর্ঘনিশ্বাসে তারাদাসের বুক ভারী হইয়া উঠিল...তাই সে জানলার ধারটুকু আর ছাড়িতে চাহিল না।

ঐ হাস্নাহানা—এ দীর্ঘ দশ বৎসরে তার গন্ধ এতটুকু ম্লান হয় নাই ! ঐ নক্ষত্রের দলে আজো সে কাণাকাণি তেমনি চলিয়াছে ! শুধু তার ভাগ্যেই...হায় রে !

কিসের জন্য সংসার ? কার মুখ চাহিয়া কিসের লোভে সে এখানে পড়িয়া থাকিবে ? অরণ্য কি এ সংসারের চেয়েও ভয়ঙ্কর..

অথচ একদিন···ঐ শশীবালাই প্রণয়ের সহস্র লীলায় তাকে বুঝাইয়াছিল, এ সংসার বশোরার গোলাপ-বাগ—ফুলের বর্ণে, গন্ধে, পাপিয়ার পানে, ঝর্ণার ধারায় আর ফাগুন হা[illegible]ওয়ায় ভরা রঙীন ফানুষ !..

ঐ শশীবালাই একদিন তাকে উদ্দেশ করিয়া কত কবিতা লিখিয়াছে, তারাদাসের মুখে একটু হাসি ফুটিবে, সেই লোভে কি না দিয়াছে!

মন বলিল, জীবনের সব রসটুকু যদি শুকাইয়া মরিল তো জীবনে আর কি কাজ! কেন এ সংগ্রাম? কেন এ ছুটাছুটি? যদি বিরাম-শয়নের জন্য দু'খানি কোমল বাহুর উপাধান এতই দুর্লভ হয়!...

তারাদাস বিছানায় বসিল। শশীবালা অঘোরে ঘুমাইতেছে—তারাদাসের অন্তরে কি দাহ...তার কোনো উদ্দেশ না লইয়া!...

কিন্তু একদিন...অতীতের ক'টা পরিচ্ছেদ জল্ জল্ করিয়া চোখের সাম্‌নে জাগিয়া উঠিল। সেই সেবার কলতলায় পড়িয়া তারাদাসের পায়ে চোট লাগে, শশীবালার কি সেবা—দিন নাই, রাত্রি নাই,—সেবার লোভে তারাদাস বলিয়াছিল, রোজ রোজ এমনি যেন পড়ি, আর পায়ে এমনি যেন চোট্ লাগে! তাহাতে শশীবালা...

সে একদিন! আর আজ?

তারাদাসের বুক বেদনায় ভারী হইয়া উঠিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে মনে-মনে কহিল,—ঘুমাও, ঘুমাও নারী...তারাদাস কাল এ অবহেলার চূড়ান্ত শোধ লইবে! এ তাচ্ছল্য...উঃ সে যা করিবে.! সারা দুনিয়া তাহাতে শিহরিয়া উঠিবে!...

পরের দিন।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে তারাদাস চাহিয়া দেখে, ঘড়িতে আটটা বাজে। ঘরে কেহ নাই। টেবিলের উপর এক পেয়ালা চা। প্লেটটা উপুড় করিয়া ঢাকা,– পাছে জুড়াইয়া ঠাণ্ডা শরবতে পরিণত হয়—পাছে চায়ের পেয়ালায় মাছি বসে!

তারাদাস জানালা দিয়া পেয়ালার চা ফেলিয়া দিল, দিয়া নিঃশব্দে গিয়া মুখ-হাত ধুইল ; স্নান করিল ; স্নানান্তে ধোপদোস্ত কাপড়-জামা বাহির করিয়া পরিল ; পরিয়া ড্রয়ার খুলিয়া পার্শ লইল ; পার্শে এক, দুই, তিন—পাঁচ, সাত, দশখানা নোট ভরিল...দশ টাকার নোট। খুচরা টাকা-পয়সা হাতে ঢালিয়া গণিয়া দেখে, সতেরো টাকা এগারো আনা এক পয়সা ! ..

আকাশের দিকে চাহিয়া তারাদাস কি ভাবিল,—কাশী ? ঠিক। তার পর কাশী হইতে বৃন্দাবন, হরিদ্বার, বদরীনারায়ণ, রামেশ্বর, দ্বারকা—যে-কোন একটা দুর্গম তীর্থে...

বানপ্রস্থ ? তাই। শঙ্করাচার্য্যের বাণী মনে জাগিল, ছেলেবেলায় স্কুলে পড়িয়াছিল,—এত দিন মনে করিবার প্রয়োজন ছিল না, আজ হইয়াছে ! মনে মনে সে উচ্চারণ করিল—কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ...

তার পর ঘরের পানে শেষবার করুণ নেত্রে চাহিয়া উদ্যত একটা নিশ্বাস সবলে রোধ করিয়া তারাদাস নীচে নামিল। রান্না-ঘরের সাম্‌নের বারন্দায় শশীবালা তখন ভৃত্যকে বলিতেছে,—ওজন দেখে ঠিক দু'সের মাংস আনবি। আর বড় চিংড়ী ষোলটা—কাটলেট হবে। বুঝলি ?

ছেলে-মেয়েরা কলরব তুলিল,—চপ খাবো, মা, চপ...

শচীবালা কহিল,—বেশ ! তা হলে মাংস আরো সের খানেক আনিস্ রে। বেশ থুড়িয়ে আলাদা করে আনবি...

তারাদাস নিশ্বাস চাপিতে পারিল না...মনে মনে কহিল,—খাও তোমরা পরম পুলকে চপ্, কাটলেট, কালিয়া, পোলাও !...সে ?... তার পানে চাহিবার কোনো প্রয়োজন নাই ! সংসারের সাধ তার মিটিয়াছে !...

ভাগ্যে দিনটা ছিল রবিবার—অফিসের ভাবনা ছিল না!... তাই মুক্তির পথ অবাধ...শুধু চলিবার ওয়াস্তা!...

বন্ধু-বান্ধবের কাছে বিদায় লওয়া চাই। সেই সঙ্গে একবার... সকলকে একবার বলা, ছেলে-মেয়েগুলাকে একবার দেখিয়ো, ভাই।

হায় রে মনের এমনি দুর্ব্বলতা! সব ছাড়িতে চাহিলেও মায়া কোথায় বুকের এক কোণ আঁকড়িয়া বসিয়া থাকে! সত্য, হরিশ, হেম, আশু, ননী, বিনোদ, ভূপাল, পরেশ...কাহাকেও সে বাদ দিল না—সকলের সঙ্গে দেখা করিল। ট্রেণ রাত্রে···পঞ্জাব মেলে যাত্রা করিবে!···

তার পর অফিসের বন্ধু ক'জন। সকলের গৃহে শুধু চা... পেটটা চা খাইয়া জয়ঢাক হইয়া উঠিয়াছে...সকলেই বলে,—সাজ-সজ্জা করে কোথায় হে?

মুখ ফুটিয়া তারাদাস বলিতে পারিল না, বানপ্রস্থে! শুধু বলিল, একটু বাইরে যেতে হবে...বৈষয়িক কাজ!...

শুধু হরিশের সঙ্গে দেখা হইতে হরিশ কহিল,—বেলা দশটা বাজে। কোথায় চলেছ সেজে-গুজে?

মুখে মলিন হাসি, তারাদাস কহিল,—এক পিশি আছেন কাশীতে —তাঁর অসুখ। যেতে হবে।

হরিশ কহিল,—ট্রেণ তো রাত্রে!

তারাদাস কহিল,—তাই। এর পর গোছগাছ করতে হবে কি না! ওবেলায় আসতে পারবো না। তাই বল্‌তে এসেছিলুম, ওরা রইলো—একটু খবরাখবর নিয়ো। কবে ফিরবো, ঠিক নেই।

হরিশ কহিল,—অফিসে ছুটী নেছ?

তারাদাস কহিল,—না।

হরিশ কহিল,—তবে ?

তারাদাস কহিল,—যাবো একবার বড় বাবুর কাছে...?

হরিশ কহিল,—নিশ্চয় যাবে। সাহেব নতুন...কেমন temperament...

তারাদাস কহিল,—যা বলেছো।

তারাদাস উঠিল। হরিশ কহিল,—একটু চা খেয়ে যাও হে...এত বেলায় আর কিছু খাবার কথা বলতে পারি না। বাড়ীর গুলো নষ্ট হলে গৃহিণীর মুখ ভারী হয়ে উঠবে, বুঝি তো!

চা আসিল—চা পান করিয়া আধ ঘণ্টা পরে তারাদাস যাত্রা করিল, বড় বাবুর গৃহের অভিমুখে!

ভাবিল, বানপ্রস্থে চলিয়াছি,—ফিরিবার কথা নয়, মানি। তবু বলা যায় না, যদি শেষ অবধি টিঁকিয়া থাকিতে না পারি? এত টাকা মাহিনার চাকরি—বিশেষ এই বয়স! ছুটির একখানা দরখাস্ত পেশ করিয়া সেটাকে যদি আবদ্ধ রাখা যায়, লাভ ভিন্ন লোকসান হইবে না, নিশ্চয়!

বড় বাবু গৃহে ছিলেন না—তারাদাস ভাবনায় পড়িল। তক্তাপোষে গা গড়াইয়া সে খপরের কাগজে মনঃসংযোগ করিল। এক ভৃত্য আসিয়া কহিল,—চা খাবেন?

চা?...তারাদাস কহিল—দে এক পেয়ালা...

চাকর চা আনিল। আরও এক ঘণ্টা পরে বড় বাবু আসিলেন। একটা মিথ্যা ওজর দেখাইয়া ছুটির প্রার্থনা জানাইয়া তারাদাস একখানা দরখাস্ত লিখিয়া বড় বাবুর হাতে গুঁজিয়া দিল। বড় বাবু কহিলেন,—এক মাসের বেশী দিতে পারবো না, কিছুতেই...এই সময় ...বুঝলে তো!

সন্ধ্যার মুখে তারাদাস হাওড়ার দিকে চলিল।

পুলের উপর দিয়া হু-হু শব্দে মোটর আর বাস ছুটিয়াছে। তারা-দাসের মনে হইল, তার গৃহে এখন কি হইতেছে? তার সন্ধান? উদ্বেগ? কলরব? কৈ, কোনো বন্ধুর গৃহে সন্ধান লইতে কেহ তো আসে নাই! তবে?

হয়তো তার সন্ধানই হয় নাই! কোথায় গেল—কি ঘটিল, না ঘটিল! এমনি সংসার!...এখন সে অপ্রয়োজনীয়, বাতিল—সংসার-চক্রে রবারের ছিন্ন টায়ারখানা বৈ আর কিছু নয়! টায়ার গেলে একটু বাধে—চাকার চলা তাহাতে বন্ধ হয় না। একটা নিশ্বাস বুক হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া চৈত্রের বাতাসে মিশিল!...

ষ্টেশনের টিকিট-ঘর...ঐ। টিকিট কিনিলেই হয়...কিন্তু সে ভাবিতে বসিল।

ছেলেগুলা আজো মানুষ হয় নাই। মেয়ে দুটার বিবাহ!...স্ত্রী যেন ভুলিয়াছে—তাকে স্ত্রীর প্রয়োজন নাই। কিন্তু ছেলেমেয়েদের প্রতি তার কর্ত্তব্য...?

তা ছাড়া বলিয়া আসা উচিত ছিল! দেনা-পাওনার কতকগুলা হিসাব-নিকাশ বাকী রহিয়া গেছে! কে ফাঁকি দিবে! কে ঠকাইবে!

ভাবিতে ভাবিতে ভাবনা বাড়িয়া চলিল এবং এমনি ভাবনার মধ্যে সহসা কে ডাকিল,—তারাদাস···না?

তারাদাস চাহিয়া দেখে, শ্রীনাথ।

শ্রীনাথ কহিল,—ষ্টেশনে যে?

তারাদাস কহিল,—এমনি...

শ্রীনাথ কহিল,—কারো আসবার কথা আছে?

কোনো চিন্তা না করিয়াই তারাদাস কহিল,—হ্যাঁ, পিশিমা আসচেন...কাশী থেকে। তাই।

শ্রীনাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল,—রাত নটা বেজে গেছে—এখন কাশীর ট্রেণ পাবে না কি! হুঁঃ! তার চেয়ে চলো, বড়বাজারে দোকান খুলেছি—বিশুদ্ধ ঘৃত—'স্বরাজ' মার্কা। কাল থেকে দোকান বসবে—দেখে যাও...ঘীটা ভাই, আমার ওখান থেকেই নিয়ো। দরে সুবিধা পাবে—জিনিষ খাঁটী। কান্দাহার থেকে আনাচ্ছি। যেন মেওয়া!

তারাদাসকে উঠিতে হইল। চিন্তার ঝোঁকে টিকিট কেনার কথা ভুলিয়া গিয়াছে—মেলও ছাড়িয়া দিয়াছে বহুক্ষণ। তাইতো!

শ্রীনাথের দোকান ছাড়িয়া আবার সেই পথে ঘোরা এবং এমনি ঘুরিতে ঘুরিতে এক সময় সচকিত হইয়া তারাদাস দেখে, নিজের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে! পাশের বাড়ীর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া এগারোটা বাজিতেছে।...পথে লোকের চলাচল নাই বলিলেই হয়! চারিদিক নিঝুম হইয়া আসিয়াছে—শুধু মিত্তিরদের বৈঠকখানায় তাসের আড্ডায় ক্ষণে ক্ষণে রুদ্র গর্জ্জন!...

সেই গৃহ। কোথাও কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নাই! তার মনের উপর দিয়া এতখানি প্রলয়ের ঝড় বহিয়া চলিয়াছে, অথচ!...একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিরুপায় তারাদাস গৃহে প্রবেশ করিল; প্রবেশ করিতে কাণে গেল, শশীবালা বলিতেছে,—রান্নাঘর ধুয়ে ফ্যাল্···বাবুর খাবার ওপরে এনে ঢাকা দিয়ে রাখচি। আমার পিণ্ডি এখনি গিল্‌চি। গেলা হলে শকড়িটা পেড়ে নিয়ে তোরা শুয়ে পড়্! বাবু এসে ডাকে, উঠে দরজা খুলে দিবি...

তারাদাস ভাবিল, সারাদিন কিসের দুঃখে হায়, সে পথে-পথে ঘুরিয়া মরিয়াছে! সংসার তার চাকা গড়াইয়া ঠিক চলিয়াছে।

উপরে উঠিতে গৃহিণী শশীবালা কহিল,—বাড়ী ফেরা হলো যে! কেউ ঠাঁই দিলে না?···সকাল হোক, তার পর হয় তুমি অনাথ-আশ্রমে আস্তানা নেবে, নয় আমি আস্তানা নেবো। এক দিনের জন্য স্বস্তি নেই! ভ্যালা সংসারে ঢুকেছিলুম...

তারাদাসের পেটের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল। তারাদাস নিঃশব্দে মুখ-হাত ধুইয়া খাইতে বসিল।

শশীবালা আসিয়া কহিল,—রোসো,—মাংসটা ও-বেলার—গরম করে আনি...

গম্ভীরভাবে তারাদাস কহিল,—থাক্, ওতেই হবে।

শশীবালা কহিল,—জানি। তবু যতক্ষণ আছি, কর্ত্তব্য করি। না হলে যে নরকেও স্থান হবে না! দু'বেলা খেতে দিচ্ছ, তার জন্য একটা কৃতজ্ঞতাও আমার থাকবে না? এমন বেইমানের পেটে সত্যি জন্ম নিই নি!

মাংসর বাটি লইয়া শশীবালা গিয়া ষ্টোভ জ্বালিল—তারাদাস সেই দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সে কি ভাবিতেছিল?...সংসার অরণ্য?...না, সেই বশোরার গোলাপ-বাগ?

—

থার্ড ইয়ারে পড়ি। বাণী দেবী মনের আসনে চরণ-পাত করিয়াছেন—তাঁর নূপুরের ধ্বনি স্পষ্ট কানে শুনি! বিশ্ব-জগৎ দীঘির জলে স্নান করিয়া যেন সবুজ পদ্মপাতায় চাপিয়া বসিয়াছে! সেই পাতার রঙে আকাশে অবধি সবুজ ছোপ্!

কবিতা লিখি, গল্প লিখি। কোথা হইতে কাব্য-কুঞ্জ গড়িয়া উঠিল—সে এক পরম বিস্ময়!

তখন যা বয়স, তাহাতে দুনিয়ার কোনো ব্যাপারের তোয়াক্কা রাখিবার কথা নয়! সাম্‌নে রঙীন ভবিষ্যৎ। দুনিয়ার মসৃণ পথে জীবনটাকে মার্ব্বেলের মত গড়াইয়া চলিয়াছি!

সমাজ, সমাজের বিধি-নিষেধ, মানুষের গৃহ-সংসারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী—সব কাটিবার জন্য লেখনীর কুঠার ধরিয়াছি! পরশুরামের মত সে কুঠার হানিয়া সব বিরোধ কাটিয়া যে বিশ্ব রচনা করিব, তাহাতে নর-নারীর মন মুক্তির বাতাসে মাকালের মত দুলিতে থাকিবে।

সেদিন সকালে পল্লব আসিয়া একটা কবিতা শুনাইয়া গেল। কবিতার প্রতি ছত্রে জ্বলন্ত আগুন! সে আগুনে বিবাহের বাঁধনকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া পল্লব লিখিয়াছে,—

বাধাহীন মুক্ত পথে এসো নারী,—এসো তুমি নর—
প্রাণের বাসনা যত পূর্ণ করি হও হে অমর!

ঠিক কথা! বাসনা যদি না মিটিল, মনকে যদি প্রতিপদে বাধা-নিষেধই দাবিয়া রাখিল, তবে তার বিকাশ হইবে কি করিয়া?

অব্যক্তকুমার কহিল,—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেমন ঘটলো, অমনি জীবনে এলো বাঁধন,—মনের দ্বারে শান্ত্রী-পাহারা বসলো...বিধি-

নিষেধের ভিড় জমলো !…বিশেষ ওই নারীর মন! কুণ্ঠায় ভয়ে সে মরণের দিন গুণতে থাকে !

মুক্তিলাল কহিল,- নারী অবলা, অসহায়—তাই চিরদিন ক্রন্দিতা। আমরা সেই ক্রন্দিতা নারীকে বিশ্ব-বন্দিতা করে তুলতে চাই! নারীর মুক্তি-চিন্তা আমাদের ব্রত !

আমাদের মাসিক-পত্র ছিল। অফিস আমারি গৃহে এক-তলার ঘরে। গৃহ পটলডাঙ্গায়, এক গলির মধ্যে। সকালে, বিকালে অফিসে মস্ত দল জড়ো হয়। সভা বসে—বিবিধ আলোচনায় আগুন ঝরিতে থাকে। রাত দশটা-এগারোটায় সভা ভাঙ্গে।

সেদিন সভা ভাঙ্গিলে উপরে আসিলাম। আহারাদির পর খড়খড়ির ধারে গিয়া দাঁড়াইলাম। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন! আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না। সে-জ্যোৎস্নায় মন বিহ্বল হয়! আকাশের পানে চাহিয়া আছি,—জগতের নর-নারীর কথা মনে জাগিল! কবে ঐ আকাশের মত সকলের অন্তর মুক্তির জ্যোৎস্নায় ধপ্‌ধপে হইয়া উঠিবে !

বড় রাস্তায় মোটরের হর্ণ, ছ্যাকরা গাড়ীর কর্কশ চক্র-রব...প্রাণের সুরে সে-সব ধ্বনি নির্ম্মম আঘাত তুলিতেছিল। অদূরে একটা বাড়ীতে প্রচণ্ড কলরব জাগিল—পুরুষের তর্জ্জন, সেই সঙ্গে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ। নিশ্চয় দর্পিত স্বামিত্ব অসহায় স্ত্রীর উপর আস্ফালন তুলিয়াছে—বেচারী স্ত্রী তাই…

দলিত নারীত্বের বেদনায় আকাশের অমন জ্যোৎস্না নিমেষে মলিন, ম্লান হইয়া গেল !

বিরক্ত চিত্তে সরিয়া আসিতেছি, দৃষ্টি পড়িল গলির ও-পারে যে-গৃহ, তার দ্বিতলের ঘরে। ছোট বাড়ী—গৃহস্থ ভাড়াটিয়ার বাস।

দোতলার ঘরে একটা প্রদীপের আলো জ্বলিতেছে। প্রদীপের সাম্‌নে বসিয়া এক তরুণী নিবিষ্ট মনে কি-একখানা বই পড়িতেছে! চাঁদের জ্যোৎস্না তার বসনে, অবয়বে শুভ্রতার ঢেউ বহাইয়া দিয়াছে! তরুণীর মাথায় কাপড় নাই—কালো চুলে বাঁধা এলো খোঁপা......বিশ্বের মাধুরী মূর্ত্তি ধরিয়াছে? না, তরুণীর বেশে নিশীথিনী অলস কৌতুকে মানুষের লেখা বই পড়িতেছে?

দৃষ্টি ফিরিতে চায় না। ঘরের বাকী অংশও চোখে পড়ে না! তন্ময় চিত্তে ঐ নিশীথিনীর পানে চাহিয়া রহিলাম!...বুকের মধ্যে সমাজ-সংসার, বিধি-নিষেধ প্রচণ্ড কলরবে মাতন জাগাইয়া দিয়াছিল—সে-মাতনের পিছনে মুক্তির সবুজ পতাকা!

পাষাণ প্রতিমা? না। মাঝে-মাঝে বইয়ের পাতা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া অদূরে ভূমি-তলে প্রেরণ করিতেছে! কি দেখিতেছে? কি...?

কৌতূহল হইল। এ-ধারে-ওধারে নড়িয়াও কিছু দেখিলাম না!...

মানুষ কখনো এমন দাঁড়াইতে পারে! ঘুমে চোখ ভারী হইয়া উঠিয়াছে। তরুণী তেমনি স্থির, অচঞ্চল...দৃষ্টি কোনো দিকে ফিরিতে জানে না! রাত্রি-ভরা এমন জ্যোৎস্না...সেদিকে তার খেয়াল নাই!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানায় আসিয়া শুইলাম!...

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে খড়খড়ির ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ও-বাড়ীর খড়খড়ি বন্ধ। পথের ধারে ঐ একখানি মাত্র ঘর—সে-ঘরে দুটি মাত্র খড়খড়ি। দুটিই বন্ধ। অস্বস্তি জাগিল।

ছুটিয়া ও-বাড়ীর দ্বারে গিয়া দাঁড়াইব? প্রশ্ন করিব,—কে? তুমি কে...? রাত্রি জাগিয়া বই পড়িতেছিলে...কোন্ ভাগ্যবানের কি এমন লেখা...?

দিনের আলো চারিদিকে জল্জল্ করিতেছে। পথে লোকের ভিড়, ফিরিওয়ালার চীৎকার...কলরবের অন্ত নাই! জ্যোৎস্না-নিশীথের স্বপ্ন-বিভ্রম সে কলরবে নির্জীব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে!

নীচে অফিস-ঘরে দু-একটি করিয়া বন্ধু জড়ো হইতেছে। সে ঘরের এক প্রান্ত হইতে ও-বাড়ীর খড়খড়ি দেখা যায়। সেই জায়গাটিতে গিয়া বসিলাম এবং সকলের অলক্ষ্যে খড়খড়ির পানে মাঝে মাঝে দৃষ্টি তুলিয়া...

ভারী সাবধানে! আমার বুকে যে-পাখী কাল আসিয়া বসিয়াছিল, সেটি আর কাহারো চোখে না পড়ে! যদি তাদের লোলুপতা জাগে...কাজেই মনের আনন্দ গোপন রাখিলাম।

কোরক গল্প লিখিয়াছে—শুনাইতে আসিয়াছিল। হিমশেখর কহিল,—শোনো হে,, এ গল্প সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

কোরক গল্প পড়িল। গল্প শোনার ফাঁকে ফাঁকে আমার দৃষ্টি অলস ছিল না! হঠাৎ এক সময়ে দৃষ্টি মেলিতে দেখি, দুটি খড়খড়িই খোলা—সাম্নে কেহ নাই!

বাড়ীর নীচের তলায় চাহিলাম। বাহিরের ঘরে এক স্যাকরার দোকান। নিত্যকার মত সেই ঠুক্ঠাক্ শব্দ, সেই জটলা, সেই হাসি ও গল্প চলিয়াছে। যেন আরব্য-রজনীর এক-টুকরা কাল রাত্রে ও-বাড়ীর দোতলার ঘরে কোন্ স্বপ্নময়ী কন্যাকে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছিল, হাতে তার গুলেস্তাঁ..দিনের আলোয় সে-স্বপ্ন-কন্যা অন্তরালে মিলাইয়াছে!

অমোঘ আসিয়া দেখা দিল। কোরকের গল্পের রসভঙ্গ করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া অমোঘ গর্জ্জন তুলিল—এর মীমাংসা চাই······

সবিস্ময়ে তার পানে চাহিলাম। কিসের মীমাংসা?

অমোঘ ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। কথায় কাজে তার অমোঘ প্রতাপ। সমাজকে ঠোক্কর মারিয়া হঠাইতে সর্ব্বক্ষণ উদ্যত—শুধু সেই ঠোক্কর মারার তিথি ও লগ্নের ওয়াস্তা! তর্ক তোলে সকল বিষয়ে—কিন্তু শেষ মীমাংসার ভার নিজের হাতে কখনো রাখে না!

অমোঘ কহিল,—আমারি মামাতো বোন্ তড়িতা। সেকেণ্ড ক্লাশে পড়চে। পাড়ায় থাকে অরিন্দম...অঙ্কে চমৎকার মাথা। আমার সঙ্গে ভাব; আমার কাছে আসে-যায়। তার কাছে তড়িতা অঙ্ক কষে। দু'জনে লভ্ হয়েচে। কাল এক বিহ্বল মুহূর্ত্তে অরিন্দম তড়িতার হাত ধরে তার মুখের পানে চেয়ে বসেছিল! বুঝি, গভীর আবেগে একটি চুম্বন...! মামীমা হঠাৎ সে-ঘরে আসেন, দেখে জ্বলে ওঠেন। তা নিয়ে বাড়ীতে মহা-কলরব বাধে। আমি বলেচি, দুটি হৃদয় মিশে যখন এক হতে চায়, তখন বাধা দিয়ো না! তড়িতারও সেই মত। মাঝে থেকে মামীমার ভাই—কোথায় প্রফেশর ছিলেন, কখানা নোট্ ছাপিয়েচেন...তিনি এলেন মধ্যস্থতা করতে। তিনি বলেন, হৃদয়-বৃত্তির আবেগ, বেশ কথা—মানি। কিন্তু তা নিয়ে সংসার চলবে না। অরিন্দমের চাল নেই, চুলো নেই, থাকে পরের বাড়ীতে; মাষ্টারী করে। তার হাতে তড়িতাকে দেওয়া চলে না। বাপের একটিমাত্র মেয়ে...সুন্দরী, পয়সা-কড়ি আছে... অমোঘ হাঁফাইতে লাগিল। আমি কহিলাম,—তার পর?

অমোঘ কহিল,—তড়িতা গুম হয়ে বসে আছে। অরিন্দমকে কুকুরের মত বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হলো। আমি আশ্বাস দিয়েচি, ভয় নেই—এর বিহিত আমি করবো!...সেই বিহিত কি ভাবে করি, তার পরামর্শ তোমরা দাও।

কোরক কহিল,—অরিন্দমের উচিত, তড়িতাকে নিয়ে সরে পড়া।

বিশাল পৃথিবী—ছুটি তরুণ হৃদয়ের জন্য আশ্রয়ের জায়গা পৃথিবীতে প্রচুর মিলবে!

অমোঘ কহিল,—কিন্তু তড়িতা minor যদি পুলিশ-কেশ হয়?

হিমশেখর কহিল,—এমন ছুটো-একটা আঘাত বুক পেতে নিতে হবে। তাছাড়া বহু-দূরে গেলে পুলিশ নাগাল পাবে কেন?—তারপর বিবাহ হয়ে গেলে...শুনেচি, হিন্দু বিবাহ indissoluble!

কোরক কহিল,—কিন্তু বিবাহ তো হবে না!

—ও!

আমি চুপ করিয়া ছিলাম। অমোঘ কহিল,—তুমি কি বলো?

আমি কহিলাম,—বিশাল মুক্ত পৃথিবী আছে, সত্য! কিন্তু আহারাদির ব্যবস্থা, দূর-দেশে যাবার পয়সা—এগুলোও সমস্যা। বিশেষ যা শুনচি,—অরিন্দম...তার আর্থিক অবস্থা সুবিধের নয়...

কোরক কহিল,—আমরা চাঁদা তুলবো...noble cause!

অমোঘ কহিল,—আমার কাছে বারো টাকা আছে—তা থেকে দশ টাকা দিতে এখনি রাজী।

কোরক কহিল,—আমি দেবো পাচ টাকা।

হিমশেখর কহিল,—আমিও পাঁচ। তুমি? হিমশেখর আমার পানে চাহিল। আমার মুখে চট্ করিয়া কথা সরিল না। গৃহ হইতে তরুণী কন্যাকে উপ্‌ড়াইয়া লইয়া যাওয়া...

কোথাকার প্রাচীন সংস্কার মরিচা-পড়া শিকলে মনকে বুঝি টানিতেছিল! কহিলাম,—সব ঠিক হয়, বেশ, আমিও পাঁচ টাকা দেবো!

অমোঘ কহিল,—তাহলে ব্যবস্থা করি?

কোরক কহিল,—এখনি।

দুপুর বেলায় ও-বাড়ীর পানে চাহিয়া দেখি, ঘরে রৌদ্র, খড়খড়ির দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া সেই তরুণী. পিঠ বহিয়া কালো চুলের রাশি ঝরিয়া পড়িয়াছে! তরুণী কার দুখানি পায়ে হাত বুলাইতেছে। তরুণীর পরণে কালা-পাড় ধুতি!

আধুনিকী...নিশ্চয়!...

কিন্তু কার ঐ শীর্ণ পা ?...নিশ্চয়, স্বামীর!...এমন সেবা! এমন পরিচর্য্যা! দিনের আলো কেমন ঘোলাটে বোধ হইল!...

সন্ধ্যার দিকে আবার অমোঘ আসিয়া হাজির--তেমনি হাঁফাইতেছে। একটু দম্ লইয়া সগর্জ্জনে কহিল,—Rascals!

আমি কহিলাম,—খপর কি ?

অমোঘ কহিল,—ঐ অরিন্দম...! কাওয়ার্ড!

—কেন ?

অমোঘ কহিল,—মেশ্ ছেড়ে তল্পী গুটিয়ে চম্পট দেছে!... Brute!

—এঁ্যা!

—তাই! আর মামীমার ভাই তড়িতাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেছে।...তড়িতাকে একটা এশরাজ কিনে দেবে বলেচে, সে গলে গেছে অমনি! দিব্যি চলে গেল!

নিশ্বাস ফেলিয়া কোরক কহিল,--এ-দেশে স্বরাজ আকাশ-কুসুম!

হিমশেখর কহিল,—লেখায় আরো আগুন ছিটোও...!

কোরক কহিল,—একটা গান বেঁধেচি। রবিবাবুর গান আছে—'ফাগুন জেগেছে বনে বনে'—জানো ?

—জানি।

কোরক কহিল,—ঐ সুরে, ওরি আদর্শে আমি লিখেচি,...

আগুন জ্বালাবো ঘরে ঘরে
বাঁশে খড়ে কড়িকাঠে, বাতায় বাতায় রে···

হিমশেখর কহিল,—সাবাস!

এ-সব আলোচনা আমার ভালো লাগিতেছিল না—মনে জাগিতেছিল, সেই নিশীথিনীর কথা! যদি আলাপের সুযোগ থাকিত!

সুযোগ ঘটিয়া গেল—তিন-চারিদিন পরে।

রাত্রি এগারোটা। খড়খড়ির ধারে তেমনি দাঁড়াইয়া আছি, দৃষ্টি ও-বাড়ীর সেই ঘরে। সহসা কেমন একটা চাঞ্চল্য! নীচের তলায় স্যাকরার দোকান বন্ধ···নিশুতি পল্লী।

একটি আট বছরের ছেলে...দ্বার খুলিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি কি ভাবিয়া দ্রুত নামিয়া আসিলাম। ছেলেটিকে কহিলাম,—তোমাদের বাড়ী কি হয়েচে?

ছেলেটি কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল,—বাবা...

—বাবার কি হয়েচে?

—বড্ড অসুখ। কেমন করচেন। আমাদের ঝী গেছে আমার পিসে মশায়কে খপর দিতে—এখনো ফেরেনি।

—চলো, দেখি...

ছেলেটির সঙ্গে দোতলার সেই ঘরে আসিলাম। শয্যায় এক শীর্ণ রুগ্ন বৃদ্ধ মূর্চ্ছিতের মত..আর তরুণী তাঁর পরিচর্য্যায় রত! বুকে কি মালিশ চলিতেছে! ছেলেটি ডাকিল,—দিদি...

তরুণী চাহিল—কি করুণ, কাতর দৃষ্টি!

আমি কহিলাম,—কি হয়েচে, বলুন তো ?

তরুণী সংক্ষেপে কহিল, বাপের অসুখ। চিকিৎসার জন্য এখানে আনা হইয়াছে। মাসে একবার দুবার এমনি অজ্ঞান হইয়া যান্—কিন্তু ঘণ্টা-খানেকের জন্য !...আজ তিন ঘণ্টা কাটিয়াছে, তবু জ্ঞান নাই।

পাল্‌স্ দেখিলাম। তরুণী কহিল,—পাল্‌স্ আছে। ওগুলো জানি—দেখেচি। কিন্তু বেশীক্ষণ এমন অজ্ঞান থাকলে...

স্বর গাঢ়। তরুণীর কথা বাধিয়া গেল।

আমি কহিলাম,—কোন্ ডাক্তার দেখচেন ?

তরুণী কহিল,—কবিরাজী হচ্ছে। পিসেমশায় জানেন তাঁর ঠিকানা। তাই ঝীকে পাঠিয়েচি পিসেমশায়ের কাছে...

আমি কহিলাম—আপনার পিসেমশায়ের নাম-ঠিকানা তাহলে বলুন। আমি যাই, সন্ধান করি।

নাম-ঠিকানা মিলিল—ছুটিলাম।...

সেখানে গিয়া শুনি, তিনি পনেরো মিনিট আগে গিয়াছেন ; বাড়ী ছিলেন না, যখন ও-বাড়ীর ঝী আসে—তাই দেরী।...

ফিরিলাম।...

এখানে দেখি, রোগীর জ্ঞান হইয়াছে—কবিরাজ বিদায় লইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশায় শ্রীযুক্ত মহীন্দ্র বাবুও।

আমায় দেখিয়া মহীন্দ্র বাবু কহিলেন,—আপনি গেছলেন আমার ওখানে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি এই সামনের বাড়ীতে থাকেন ?

—হ্যাঁ।

—দয়া করে এঁদের উপর একটু নজর রাখবেন। কেউ নেই। ঐ মেয়েটি আর ছোট্ট ছেলেটি। আমার নানা কাজ—অথচ আমার ওখানে উনি থাকতে রাজী নন্। কাছাকাছি তেমন বাড়ীও পাইনি ...কম ভাড়ার বাড়ী কি সহরে সহজে মেলে!...

নজর রাখিলাম। নিত্য দুবেলা যাতায়াত। মাসিক পত্রের কাজে ঢিলা পড়িতেছিল। বন্ধুরা অনুযোগ তুলিল। কহিলাম,—হৃদয়-বৃত্তির চর্চ্চা করচি···

বাপ দেবনাথ বুড়া—দু' বছর আগে মা মারা গিয়াছেন, তরুণী বিধবা হইবার এক মাস পরেই। তরুণীর নাম সুধা। ছেলের নাম মণি।

দেবনাথ বাবুর সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে আলোচনা হইত। কালেক্টরীর কেরাণী ছিলেন। জ্ঞানটুকু ঐ কালেক্টরীর প্রাচীরগুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভালো লাগিত না; তবু শুনিতাম। কারণ·

সুধা অনেক কথা বলিত। তার জন্য বই সংগ্রহ করিয়া আনিতাম। ফরমাশ করিত; কাজেই লেখক-নির্ব্বাচনে আমার স্বাধীনতা খর্ব্ব হইত। নিজেদের লেখাও চালাইয়া দিতাম; নারীর চিত্ত-মুক্তির কথাও পাড়িতাম। সুধা বসিয়া শুনিত। কোনো দিন এতটুকু বিরক্তি লক্ষ্য করি নাই!..

সেদিন দেবনাথ বাবু বলিলেন,—মেয়েটার ভাগ্য খারাপ। জামাই ছিল কৃতবিদ্য—কিন্তু বিবাহের পরই বদ-সংসর্গে পড়িয়া মদ ধরে, আরো নানা উপসর্গ...মেয়েটার ভাগ্যে সুখ ঘটে নাই!..

আমাদের মাসিকের আসরে তর্ক-স্রোত তেমনি বেগে প্রবাহিত হইত। আমি লক্ষ্য করিতাম, ওধারের বাড়ীতে খড়খড়ির পাখী তোলা।...

সুধা বলিত,—আপনারা কি যুদ্ধই করেন ! বাব্বা ! কি চীৎকার…

কহিলাম,—তুমি ছাখো বুঝি ?

সুধা কহিল,—দেখি বৈ কি ! কিন্তু যাই বলুন, আপনাকেই শুধু শান্তভাবে কথা কইতে দেখি। না হলে অন্যদের…উঃ…মার-মূর্ত্তি ! কিসের তর্ক হয় ?

আমি কহিলাম,—নর-নারীর মনের উপর থেকে সকল বাধা-নিষেধ তোলার জন্য আমরা সমর ঘোষণা করতে চাই সমাজের বিরুদ্ধে…

সুধা কহিল, - তার মানে ?

আমি অর্থ বুঝাইতে বসিলাম। সুধা নিবিষ্ট মনে শুনিল—বিরক্তি নাই, চাপল্য নাই !

কথার শেষে শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল।…

আমার উৎসাহ তাহাতে বাড়িয়া চলিল।…সুধা ক্রমে এ-তর্কে যোগ দিত ; এবং আমাদের মতে সায় দিয়া একদিন বলিল,—সে-কথা ঠিক। মন যে কি বস্তু ! এই মন সম্বন্ধে সারাক্ষণ সচেতন না থাকলে মানুষের দুঃখ কোনোদিন কেউ ঘোচাতে পারবে না।

পরের দিন দেবনাথ বাবুর কাছে গিয়া বসিলাম। একটু ভালো আছেন। কহিলেন,—তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় একটু ভালো থাকি, বাবা।

সুধা আসিয়া সামনে একখানা রেকাবি ধরিল—রেকাবিখানার উপর আবরণ। সুধা কহিল,—নিন্—দেখুন, কি এনেচি।

আবরণ সরাইয়া দেখি, এক জোড়া কার্পেটের বোনা জুতা।

হাসিয়া সুধার পানে চাহিলাম। সুধা কহিল,—আমি বুনেচি-আপনার জন্য।

কহিলাম,—এ চরণের জন্য ভূষণ কে চায়? নিজের হাতে তৈরী করলে যদি তো পায়ের উপরই লক্ষ্য পড়লো...!

—বেশ, কি চান,—বলুন।

—একখানি রুমাল! বুকে রাখবার জন্য...

সুধার চোখে বিদ্যুতের রেখা...চকিতের জন্য! হাসিয়া সুধা কহিল,—হুঁ! বেশ। দেবো। একটু সিল্ক আনিয়ে দেবেন।

সাহিত্য, শিল্প...মনের বিহ্বলতা বাড়িয়া চলিয়াছিল।

সেদিন দুপুর বেলায় সহসা দু'ছত্রের এক চিঠি আনিয়া মণি আমার হাতে দিল; কহিল,—দিদি দিয়েচে...

চিঠি পড়িলাম। লেখা আছে—

—আজ রাত্রে এখানে একটু জলযোগ করবেন। দীনের পূজা, দীন আয়োজন।

—সুধা

বুক কাঁপিয়া উঠিল—দুলিলও একটু!...

সারা দিন ধরিয়া একখানি চিঠি লিখিলাম। মনের বিভ্রম-স্বপ্ন ভাষায় যতখানি ফুটানো চলে—এ বিহ্বলতাকে যতখানি বুঝানো যায়! সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের রঙীন ছবি আঁকিলাম—বিশাল পৃথিবী, শ্যামল কুঞ্জ, গিরি, বন, নদী···প্রেম, প্রীতি, আদর, সোহাগ...দুনিয়ায় তার বেশী কে কি চায়! মানুষ কিসেরই বা কাঙাল!...

রাত্রে গেলাম। দেবনাথ বাবু ঘুমাইতেছেন—শরীরটা একটু খারাপ।

সুধা কহিল,—তার মার কথা সন্ধ্যায় বলিতেছিলেন—সংসারের সহস্র খুঁটিনাটীর মাঝে স্বামীর চিন্তা এক তিল মন ছাড়িয়া রহিত না...

নিশ্বাস ফেলিয়া সুধা কহিল,—কি যে হবে!

তার সুগোল নিটোল দুই হাত···সেই হাতে কবিরাজী মালিশ দেবনাথের বুকে দু-ঘণ্টা মালিশ চলিয়াছে।

সুধা কহিল,—কবিরাজী তো এ্যাদ্দিন হলো। একজন ডাক্তার-টাক্তার ডাকাতে পারেন? কে আছে আমাদের? পিসেমশায় ব্যস্ত মানুষ—মণি একরত্তি ছেলে···

সুধার দুই চোখে জল!

সুধা কহিল,—আমি সারাদিন সেবা করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু একটু আশা...

সেবা-রতা সুধার পানে চাহিয়া আছি! দৃষ্টি ফেরে না। মনের মধ্যে একটা ঝড় উঠিল, ছি! রুগ্ন বুড়া বাপের পাশ হইতে ঐ সেবা-রতাকে ছিঁড়িয়া লইতে চাই...তাই আসিয়াছি...চোরের মত...ব্যাধের মত চিঠির ফাঁদ লইয়া...! ঐ বাপ—অসহায় বাপ—মেয়ের জন্য যে বাপ...

বাপের দশা কি হইবে? ছোট ভাইটি...? কে তাদের দেখিবে? কি দুঃখ সুধার! রাত্রি-দিন কত আলাপ করিতেছে,—আমার সঙ্গে কি সহজ আত্মীয়তায় মিশিয়াছে—রুমাল তৈরী করিয়া দিয়াছে—জুতা বুনিয়া দিয়াছে—এমন গভীর স্নেহ, প্রীতি, বিশ্বাস...

আর আমি? উহাকে লইয়া যেন ধরণীর রাণী করিয়া দিব! নিজের সুখ...নিজের লোলুপতা—এ-সংসারকে ছিঁড়িয়া চূর্ণ করিয়া দিবার অভিসন্ধি মনে,—এতখানি বিশ্বাসের চূড়ান্ত প্রতিদান দিবার জন্য রন্ধ্র খুঁজিয়া ফিরিতেছি!...

লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেলাম! নারীর স্থান কি শুধু পুরুষের বুকেই...? ঐ বাপের রোগশয্যায় বাপের পায়ের কাছে তাকে মানায় না? সেখানে তার ঠাঁই নাই?...

কহিলাম,—সত্যি সুধা, এতদিন আমরা চুপ করে বসেই আছি! আজ তুমি আমায় সচেতন করে দিলে! কালই আমি একজন বড় ডাক্তার আনাবো।

সুধা কহিল,—তুমি এতখানি স্নেহ করো বলেই এ-কথা বলার ভরসা পেয়েচি। না হলে কে আছে?

আমি কহিলাম,—আজ এ-কথা বলেচো বলে গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠেচে, সুধা! কে তোমার নেই? আমি···আমায় বড় ভাই বলেই জেনো, সুধা। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা তো করি নি—এবার সেই চেষ্টা করেই দেখবো...

সুধা কহিল,—খাবার দিচ্ছি...এই মালিশটা করে নি।

আমি কহিলাম,—তাড়া নেই। তুমি ওঁর বুকে মালিশ করো। সত্যি সুধা, এমন সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে...ঐ সেবা-রত দুটি হাত...

When pain and anguish wring the brow
A ministering angel thou!

পুরুষগুলো এই সেবা থেকে কোনোদিন যদি বঞ্চিত হয়, তাহলে রোগ হলে পৃথিবীর কোনো পুরুষ যে এক নিমেষ বাঁচবে না...

পকেটে আমার লেখা সেই চিঠিখানা—নিশীথিনীর কালো অন্ধকারের মত···

বাহিরে আসিলাম। চিঠিখানা কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। মেঘের আবরণ কাটিয়া আকাশে চাঁদ তখন আবার হাসি-মুখে দেখা দিয়াছে...

মনে হইল, ও-আলোয় আমারও মনে আজ নূতন আলো!

শেষ

লেখকের অন্য বই

উপন্যাস

কাজরী	৩য় সংস্করণ	১॥০	দরদী	২য় সংস্করণ	১৲
আঁধি	...	২॥০	সোনার কাঠি	২য় সংস্করণ	১৲
নিরুদ্দেশের যাত্রী	...	১॥০	শান্তি	...	১৲
পিয়ারী	...	২৲	মমতা	...	১৲
কুজ্ঝটিকা	...	২৲	মনের মিল	...	১৲
লজ্জাবতী	...	২৲	মরু-মায়া	...	১॥০
অতঃপর	...	২৲	লাল ফুল	...	২৲
মুক্ত পাখী	...	২৲	নিশির ডাক	...	২৲
গরীবের ছেলে	...	২৲	বিনোদ হালদার	...	২৲
বহ্নিশিখা	...	২৲	মুক্তি	...	১॥০
নারী	...	২৲	মাতৃঋণ	...	১॥০
রূপছায়া	...	২৲	নবাব	...	২॥০
জীবন-স্বপ্ন	...	২৲	বন্দী	২য় সংস্করণ	১৲
বাবলা	...	১॥০	পথের পথিক	...	।৵০
ছোট পাতা	...	১॥০	নেপথ্যে	...	॥০
মধুযামিনী	...	১॥০	ধূলামাটী	...	যন্ত্রস্থ
কালোর আলো	...	১॥০	বড় ঘর	...	"
স্ত্রী-বুদ্ধি	...	১৸০	অকলঙ্ক চাঁদ	...	"
প্রেয়সী	৪র্থসংস্করণ	১৲	নিশীথ-দীপ	...	"

ছোট গল্প

তরুণী	... ...	২৲
যৌবরাজ্য	... ...	১॥০
মৃণাল	... ...	১।০
পিয়াসী	.. ..	১।০
পুষ্পক	... ...	১।০
মণিদীপ	... ...	১৲
শেফালি	...	৸০
পরদেশী	... ...	১৲
বৈকালি	... ...	॥০
নির্ঝর	... ...	১৲
চাঁদমালা	... ...	১৲

নাট্যগ্রন্থ

স্বয়ংবরা	... ...	১৲
লাখ টাকা	... ...	১৲
হারানো রতন	...	।৵০
রুমেলা (বিজয়িনী)	...	॥০
দরিয়া	... ...	॥০
যৎকিঞ্চিৎ	...	॥০
দশচক্র	... ...	।৵০
গ্রহের ফের	...	।০
পঞ্চশর	... ...	।৵০
হাতের পাঁচ	...	।৴০
শেষ বেশ	...	।৴০

ছেলেমেয়েদের উপন্যাস—গল্প

লাল কুঠি	...	উপন্যাস ...	১।০
মা কালীর খাঁড়া	...	" ...	১৲
ছায়া দানব	...	"	১৲
পাঠান মুল্লুকে	...	"	যন্ত্রস্থ
সাঁঝের বাতি	...	গল্প	॥০
ফুলের পাখা	...	"	॥০
তারার মালা	...	" ...	॥০

সকল গ্রন্থই কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস ; গুরুদাস লাইব্রেরী ; এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স ; অন্যান্য পুস্তকালয়ে এবং গ্রন্থকারের নিকট ৮২।৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।